নেহেরু ও পররাষ্ট্রনীতি

ভূমিকা :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীঅনাদিনাথ পাল

॥ ও রি য়ে ণ্ট বু ক কো ম্পা নি ॥
॥ ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট : কলিকাতা-১২ ॥

॥ প্রথম প্রকাশ : ১৯৫৭ ॥
॥ দাম : পাঁচ টাকা মাত্র ॥

লেখকের লেখা দু'খানা বিখ্যাত বই :
মহাচীনের নবজন্ম
ভারতের মুক্তি সংগ্রাম

শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীহরিপদ পাত্র কর্তৃক সত্যনারায়ণ প্রেস, ২০, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

"জওহরলাল আজ সমস্ত ভারতের তরুণ হৃদয়ের রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারী ; অপরিসীম তাঁর ধৈর্য, বীরত্ব তাঁর বিরাট- কিন্তু সকলের চেয়ে বড়ো তাঁর সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠা। পলিটিক্স এর সাধনায় আত্মপ্রবঞ্চনা ও পরপ্রবঞ্চনার পঙ্কিল আবর্তের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেননি। সত্য যেখানে বিপজ্জনক সেখানে সত্যকে ভয় করেননি, মিথ্যা যেখানে সুবিধাজনক সেখানে তিনি মিথ্যাকে সহায় করেননি। মিথ্যার উপাচার আশু প্রয়োজনবোধে দেশপূজার যে-অর্ঘ্যে অসংকোচে স্বীকৃত হয়ে থাকে, সেখানে তিনি সত্যের নির্মলতম আদর্শকে রক্ষা করেছেন। তাঁ'র অসামান্য বুদ্ধি কূটকৌশলের পথে ফললাভের চেষ্টাকে চিরদিন ঘৃণাভরে অবজ্ঞা করেছে। দেশের মুক্তি সাধনায় তাঁ'র এই চরিত্রের দান সকলের চেয়ে বড়ো দান।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীকিরণচন্দ্র মজুমদার

প্রীতিনিলয়েষু

ভূমিকা

শ্রীঅনাদিনাথ পাল কর্তৃক বিরচিত "নেহেরু ও পররাষ্ট্রনীতি" একখানি নূতন ধরণের মূল্যবান গ্রন্থ। স্বাধীন ভারতের বৈদেশিক নীতি, ইহার মূলসূত্র ও তাহার ক্রমবিকাশ এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। ইহার পটভূমিকাস্বরূপ গ্রন্থকার উনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসও সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছেন। পঞ্চশীলের প্রকৃতি ও স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তিনি পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর রাজনৈতিক আদর্শ পরিস্ফুট করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় এই সম্বন্ধে গ্রন্থ বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক নাগরিককেই ইহার সম্বন্ধে অবহিত হইতে হইবে। স্নুতরাং এই গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

৪, বিপিন পাল রোড,
কলিকাতা
৪।১১।৫৬

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

নিবেদন

দ্রুত বিলীয়মান সমকালীন ঘটনাবলীর স্বরূপ বিশ্লেষণ ও গতিনির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। এসব রাশিকৃত ঘটনা চলচ্চিত্রের রূপালী পর্দায় প্রতিফলিত দৃশ্যাবলীর মতো ক্ষণস্থায়ী, অথচ চটকদার, বর্ণাঢ্য ও বিচিত্র। নিঃসন্দেহে এসব ভাবীকালের ঐতিহাসিক উপাদান। কিন্তু সে-সবের অসার বাদ দিয়ে সার গ্রহণ করা, আর মহাকালের পটভূমিকায় তা'র একটা সামগ্রিক সংহত রূপ পরিস্ফুট করা যে কীরূপ বিষম কাজ, তা' ভুক্তভোগী ছাড়া কা'রো বোধগম্য নয়। এতে কা'রো মনোরঞ্জন করা খুবই কষ্টকর, আবার বস্তু-নিরপেক্ষ নিস্পৃহতা ও ঐতিহাসিক সত্য-নিষ্ঠা বজায় রাখাও বোধহয় সম্ভব নয়। যেহেতু মনের গতি কালাতীত হলেও কাল-নিরপেক্ষ নয়, সেহেতু প্রচলিত ঘটনা ও ভাবসংঘাত অলক্ষ্যেও চিন্তাধারায় কিছুটা ছাপ রেখে যায়। তবে ঘটনার গোলকধাঁধাঁমুক্ত একটা কালজয়ী সত্তার চিহ্নও সর্বকালে ব্যাপ্ত। তা'র শাশ্বত রূপ গ্রন্থিবদ্ধ করার ভেতরই যতকিছু মুন্সিয়ানা ও কৃতিত্ব। কিন্তু যে-বিপদ ছায়ার মতো অলক্ষ্য-সঞ্চারী, সে-ই দলীয় মতবাদ ও কর্মকাণ্ডের প্রভাববর্জিত নির্লিপ্ততা গ্রন্থের বর্ণনা ও বিশ্লেষণে বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে কিনা, তা'র বিচারের ভার সজ্জন মননশীল পাঠকগোষ্ঠি, সহৃদয় সমালোচক ও ভাবীকালের ওপর ছেড়ে দিয়েই আমি নিশ্চিন্ত। তবে এখানে আমি শুধু একটা দিগ্‌দর্শনের ইঙ্গিত দিয়েই খালাস।

বলা নিষ্প্রয়োজন, যুদ্ধোত্তর জগতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এক মহৎ ও বৃহৎ ঘটনা বলে চিহ্নিত। কিন্তু রক্তাক্ত বিপ্লবের পথে মুক্তি অর্জন করলে তা'কে যে-মূল্য দিতে হোত, মুখ্যত অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলনে লব্ধ স্বাধীনতায় তা'র তুলনায় মূল্য কম দিতে হলেও

প্রায়শ্চিত্ত নেহাৎ কম হয়নি। প্রমাণ, ভারত-বিভাগ ও তজ্জাত কুফল। তা'ছাড়া, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের ক্ষত তা'র সর্বাঙ্গে। প্রথম শ্রেণীর যেকোন রাষ্ট্রের তুলনায় তুচ্ছ তা'র সামরিক বল, নগণ্য তা'র বৈষয়িক ও শিল্প সম্পদ। তবে চারদিকে লক্ষণ শুভ। সর্বাঙ্গীন প্রগতি ও উন্নয়নের প্রয়াস তা'র এমন কিছু কম নয়; নয় তা'র আত্মনির্ভর হবার ছেদহীন কর্মযজ্ঞে আহুতি। এর হোতা ভারত-রাষ্ট্রের ৩৬ কোটি জনমণ্ডলী ও পুরোধা শ্রীজওহরলাল নেহরু। তাঁদেরই সামগ্রিক উদ্যমের ফলশ্রুতি হলো: বিশ্ব-দরবারে ভারতের অভাবনীয় প্রতিষ্ঠা। যা' সদ্যস্বাধীন যেকোন রাষ্ট্রের পক্ষে রীতিমত গর্ব ও গৌরবের বিষয়। কাজেই তা'র প্রতি ক্ষুদ্র ও নীচাশয়ের ঈর্ষা, দর্পী ও ক্ষমতালোভীর চোরাগোপ্তা আঘাত; নানা ছলে বিড়ম্বিত, বিপন্ন ও অপদস্থ করার হীন চক্রান্ত। একে প্রতিহত করার কৌশল তা'র সনাতন নয়। চলতি ধারায় শাঠ্য-প্রয়োগে কার্যোদ্ধার করা তা'র ঐতিহ্য ও রুচিবিরুদ্ধ কাজ। বরং তা'র কৌশল একান্ত অকপট ও নীতি-নির্ভর। শান্তি, প্রেম ও মৈত্রী তা'র পাথেয়। কাজেই তা'র সফলতায় নেই চমৎকারিত্ব, নেই কোন চটকদারিত্ব। কিন্তু বিফলতায়ও তা'র মাথা হেঁট করার হেতু কম। যেহেতু ভারতের অনুসৃত নীতিতে কদাচ সুফল আশু লভ্য নয়। না হলেও তা'র লক্ষ্য ধ্রুব, কেন্দ্রবিন্দু স্থির। কাজেই অসাফল্যেও সে নিজস্ব ভূমিতে আপন মহিমায় অটল ও উন্নতশির। এতাবৎ একে সম্বল করেই প্রতিটি অগ্নিপরীক্ষায় পরিশুদ্ধ।

এই যে আত্যন্তিক নীতি-নির্ভরতা ও সদসৎবোধ—যা' দিয়েছে তা'কে দুর্জয় ও দুর্জনকে জয়ের দুঃসাহস ও কর্তব্য-নিষ্ঠায় অমোঘ প্রবৃত্তি—তা'র উৎসমুখ লুকানো কোথায়? কোথায় সে-ই শক্তির মূলাধার? আণবিক যুগের বিভীষিকায় তা'র অমৃতমন্ত্র, অভয়বাণী কী? তা'র সবলতাই বা কেন, দুর্বলতাই বা কোথায়? অথবা ভারতীয় নীতির সীমায়িত প্রয়োগক্ষেত্র ও সীমাবদ্ধ ফললাভের হেতু

কী? কেন বৈষয়িক ও সামাজিক কর্মসূচী রূপায়ণে একটা রফা ও সমতার স্পৃহা? কেনই বা গোয়া ও কাশ্মীরের ব্যাপারে সফলতার দুয়ারে পৌঁছেও অকস্মাৎ রাশ টেনে ধরা—? বা তিব্বত, কোরিয়া, মালয় ও ইন্দোচীন, আর হাঙ্গারী, মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার ব্যাপারে আপাত-অসঙ্গতি বা স্ব-বিরোধিতা?

এসবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক প্রশ্ন। তবে রাজনীতি ও ইতিহাসের যেসব ছাত্র ভারতবর্ষের পুরুষপরম্পরাগত সাংস্কৃতিক ধারাস্রোত, মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্য ও পটভূমি, বিবর্তনবাদী আপোষকামী ও সন্নীতি-ভূয়িষ্ঠ গান্ধীবাদ আর তা'র নৈষ্ঠিক অহিংসাচারী কর্ম-কৌশলের সঙ্গে পরিচিত, তাঁ'দের কাছে ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা আদৌ বিভ্রান্তিকর বা রহস্যময় নয়। কাজেই এ-নীতির উদ্ভাবক মহাত্মা গান্ধী, আর তাঁ'র নীতিপ্রসূত কর্মবাদকে সব চেয়ে আগে জানা দরকার। আরও দরকার জানা তাঁ'র মন্ত্রশিষ্য শ্রীজওহরলাল নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনজিজ্ঞাসা, চারিত্রিক ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ইতিহাস। যেহেতু বর্তমান ভারতের পররাষ্ট্রনীতি তাঁ'রই মানস-সন্তান। এসবের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক অন্যান্য বহু বিষয়ও সংশ্লিষ্ট। যেমন পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়ার বিরোধী শক্তিনিচয়ের ভাব ও স্বার্থসংঘাত, সামরিক জোট গঠনের রহস্য, ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির ক্রমাভিব্যক্তি ও তা'র মূলসূত্র পঞ্চশীলের বিবর্তন, মৈত্রী-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ ভারতীয় নীতির জয়যাত্রা ইত্যাদি। কাজেই বর্তমান গ্রন্থটি ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির সুসংবদ্ধ ও ধারাপর্যায়ে আলোচনার একটি সুপরিকল্পিত প্রয়াস।

এর আগে এবিষয়ে আর কোন বাংলা রাজনৈতিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে বলে আমি জানিনে। ইংরেজিতে যে দু'একখানা বই বাজারে চালু আছে, সেগুলি হয় অসম্পূর্ণ, নয় আংশিক।

সকলেই জানেন, নেহরু সমসাময়িক জগতে অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌ই শুধু নন, ইতিহাসবেত্তা একজন মনীষীও বটেন।

এসত্ত্বেও তাঁ'র ভাবগতি ও ক্রিয়াকলাপ সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। তবে তাঁ'র অসাধারণ যোগ্যতা ও কৃতিত্বও সংশয়াতীত। রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন পর্যন্ত তাঁ'র সম্পর্কে যা' বলেছেন, তা' এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "মানবজাতির মুক্তিদাতারূপে লেনিন ও মহাত্মা গান্ধী সমশ্রেণীভুক্ত। এই মহান্ দেশে আপনাদের সৌভাগ্য এই যে, মহাত্মা গান্ধীর সুযোগ্য শিষ্য শ্রীজওহরলাল নেহরুকে সশরীরে আপনাদের মধ্যে পেয়েছেন।" এটা নিছক কূটনৈতিক শিষ্টতা বা স্তোকবাক্য বলে মনে হয় না; এতে সত্যের খাদ না আছে এমন নয়। তা'ছাড়া, ভারত-রাষ্ট্রের যে-কাঠামো স্থিতিশীল হবার অবস্থায় উপনীত, যাত্রার প্রারম্ভে বহু ঝড়ঝাপ্টা অতিক্রম করেও যা' সগর্বে দণ্ডায়মান, তা' মূলত নেহরু-নেতৃত্বেরই সুফল। একথা ঐতিহাসিকমাত্রই স্বীকার করেন। আচার্য ডক্টর যতুনাথ সরকারের ভাষায় বলা যায়, 'After the withdrawal of the English the one unifying bond in all-India was patently the personality of Mahatma Gandhi, but that voice was silenced within one year of our entering the promised land of liberty. Since then the Atlantean shoulders of one man alone have borne the weight of this vast empire. During this decade India has maintained order at home and peace abroad, while the outer world has been beset with peril and near-war crisis after crisis. This is the glory of Jawaharlal Nehru'.

পরিশেষে বলা দরকার, পুস্তকটি নির্ভুল, ত্রুটি ও ভ্রমমুক্ত,—এমন দাবি আমার নেই। মুদ্রাকর বা অন্য প্রমাদ সাধ্যমতো সংশোধনের চেষ্টা করেও হয়তো সফল হতে পারিনি। কাজেই যাঁ'রা আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি সংশোধনে এগিয়ে আসবেন,

আলোচ্য বিষয়বস্তুর সমালোচনা করে ভ্রান্তি নিরসনে সহায়ক হবেন, তাঁ'রা প্রকৃত মিত্রের কাজ করবেন। তাঁ'দের উদ্দেশে আমার আগাম ধন্যবাদ জমা রইলো।

রচনার উপযোগী মালমসলা সংগ্রহে আমার প্রায় দেড় বছর সময় লাগে। যেহেতু নানা পুরাতন কাগজের ফাইল ও পত্রপত্রিকা ঘাটাঘাটি করতে যেমনি পরিশ্রম করতে হয়, তেমনি নানা কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যে যথাসাধ্য প্রামাণ্য উপাদান উদ্ধারেও কম বেগ পেতে হয়নি। এতে সুফল কিছু হয়েছে কিনা, তা' সুধীজনদের বিচার্য।

পুস্তক রচনায় শ্রীনগেন দত্ত, শ্রীগোপেন পাল, শ্রীখগেন দে সরকার, শ্রীঋষি দাস প্রমুখ বন্ধুর অযাচিত সাহায্য ও পরামর্শে যেমন উপকৃত হয়েছি, তেমনি মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা এলোকেশী পাল ও সহধর্মিণী শ্রীমতী দীপালি পালের নিরন্তর উৎসাহে রচনা ত্বরান্বিত হয়েছে। অন্যদিকে বন্ধুবর শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিকের একান্ত যত্ন ও তাগিদ ছাড়া এ-বই প্রকাশ করা সম্ভব কোনোকালে হতো বলে মনে হয় না। তবে তাঁ'কে ধন্যবাদ দিয়ে বন্ধুঋণ শোধ করতে চাইনে।

ইতিহাসাচার্য ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁ'র অসংখ্য কাজের মধ্যেও সময় করে নিয়ে আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষেপে নিজ অমূল্য অভিমত প্রকাশ করে আমাকে বাধিত করেছেন। তাঁ'র কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই।

শ্রীপঞ্চমী, ২২শে মাঘ, ১৩৬৩ সন
১৮।৮, জামির লেন, কলিকাতা-১৯

গ্রন্থকার

বিষয়সূচী



—এক—

কালের যাত্রা

মহাকালের যাত্রাপথে মনুষ্যসমাজের সভ্যতার বিকাশ ও অগ্রগতি এক বিস্ময়কর ইতিহাস। এ-ইতিহাসের নায়ক ব্যক্তিগত ভাবে কেউ নয়; সমগ্রের প্রচেষ্টায় যুগযুগান্ত ধরে তিল তিল করে এর বনিয়াদ গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ বহু দধীচির আত্মদানে মানবসভ্যতা সমৃদ্ধ। কিন্তু কোন পথই কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কোন নতুন পথরচনাই সহজসাধ্য হয়নি। মাঝে মাঝে নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রে ঝড উঠেছে; মহাকালের তাণ্ডবে সব ছারখার, তছনছ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মানুষ হাল ছাড়েনি; অনন্তের হাতছানি তাকে চিরকাল পাগল করেছে। ধ্বংসের মহাশ্মশানে আবার সভ্যতার স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলা হয়েছে, কারণ 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গমং পথস্তদ্ কবয়ো বদন্তি।'

মানুষের মন কালজয়ী। বিপুলা পৃথ্বী, আর নিরবধি কালের মধ্যেও সে অমৃতের আস্বাদ, অনন্তের স্পর্শ চায়। কিন্তু স্বভাবের দিক হতে সে ছিন্নমস্তা; নিজ হাতে নিজের মুণ্ড ছেদ করে নিজ রুধির পান করে থাকে। এক দিকে সে জনপথ গড়েছে, সভ্যতার পলিতে মনুষ্যত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে; অন্যদিকে ধ্বংসের নেশায় সবকিছু ভূমিসাৎ করেছে; নিজের পাগলামিতে কালভৈরবরূপ সে। চণ্ডাশোক রূপে দিগদিগন্ত ছারখার করেছে সে; সমৃদ্ধ জনপদ ও সভ্যতাকে নিজের আকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে উৎসর্গ করেছে। আবার বীতশোক ও পরমপ্রাজ্ঞ বুদ্ধশিষ্যরূপে দেশে দেশে শান্তি ও পরমার্থের বাণী শোকতাপদগ্ধ নরনারীর

মধ্যে বিতরণ করেছে। এখানেই মনুষ্যত্বের জয়জয়কার, মিত্রতার জয়যাত্রা।

কিন্তু এসবই তো 'অজ্ঞানের ওপর জ্ঞানের জয়, তমসা হতে জ্যোতির্লোকে যাত্রার কাহিনী। কারণ, যেদিন হতে মানুষের চিত্তবৃত্তির উন্মেষ হয়েছে, সেদিন হতেই দুর্জ্ঞেয়কে জানার, দুর্লভকে পাবার, অনাবিষ্কৃতকে আবিষ্কারের নেশায় সে যেন ভূতাবিষ্ট। এভাবেই শুরু মানবসভ্যতার আদি বাসভূমি মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি হতে ক্রমশ দলবদ্ধভাবে পশ্চিম ও দক্ষিণে আত্ম-প্রসারের অভিযান। দূর অতীতের সে এক যুগান্তকারী অধ্যায় বটে। অবশ্য তখনো মানুষের জ্ঞানের পরিধি সীমিত; জ্ঞানের অর্গল সবেমাত্র তার কাছে খুলেছে; বিশিষ্ট জ্ঞানরূপে বিজ্ঞানের অভ্যুদয় কিন্তু তখনো ঘটেনি। এমনি ধারা অবস্থায়ও দুটো একটা মহাদেশের মধ্যে তার গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট। একদিকে মধ্য এশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে মানবজাতির এক শাখা বাহু বাড়ালো; অন্য-দিক বাহু বিস্তার করলো আরবের দিকে। গড়ে উঠলো ইরাকীয় মিশরীয় সভ্যতা, ভারতের আর্যসভ্যতা। তারপর শুরু ক্রমবিস্তার-শীল মানব সমাজের সভ্যতার জয়যাত্রা। উত্তর আফ্রিকার নীল-দুহিতা মিশরে, ইউরোপের গ্রীসে লাতিন আমেরিকায় মেক্সিকোয় ('মায়া') সভ্যতার বিস্তার তার প্রমাণ। এতে অন্তর্নিহিত রয়েছে দুটো জিনিস: এক আত্মবিস্তার, আর জ্ঞান-স্পৃহা। অর্থাৎ আত্মচেতনা ও জ্ঞানভূয়িষ্ঠতাই বিভিন্ন মানব গোষ্ঠির দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার পরিপোষক।

এর পর যুগযুগান্ত পেরিয়েছি আমরা। পতন অভ্যুদয়ের বন্ধুর পথ অতিক্রম করে মানবযাত্রীর দল ভবিষ্যের পানে ধেয়ে চলেছে। কিন্তু এর ভেতরও মাঝে মাঝে যাত্রা-বিরতি ঘটছে। এটাই হলো মানবসভ্যতার নবপর্যায়, ছন্দপতন, নবযুগের সূচনা।

শিল্পবিপ্লব এমনি একটা যুগবিবর্তন। সমগ্র অতীত যেন এক নিঃশ্বাসে বিস্মরণ ও নব যুগে উত্তরণ। অষ্টাদশশতকে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আর বিদ্যুৎচালিত তাঁতের প্রবর্তনে যে-বৈজ্ঞানিক যুগের প্রারম্ভ, বিংশশতকের মধ্যাহ্নে আণবিক যুগে তার পরিণতি। কাজেই মাত্র তিনশ' বছরে মানুষের জ্ঞান ও বৈষয়িক রাজ্যে যে-আলোড়ন ও বিপ্লব ঘটেছে, তা পরিণামের দিক হতে অভাবনীয়, বিস্ময়কর। ভিন্ন ভাষায় এটা যুগ পরিবর্তন। যে জ্ঞান ছিল পরিমিত, তা হয়েছে ক্রমপ্রসারী, বিশ্ব হতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে বিস্তৃত। এখন আর অল্পে মানুষ খুশী নয়, নাল্পে সুখমস্তি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে পৃথিবীর ভৌগোলিক রূপের যেমন দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে, স্থানকালেরও তেমনি ভেদ হচ্ছে। ভূমণ্ডলের পাঁচটি মহাদেশ আর নয়,—অ্যান্টার্টিকা (Antartic) বা কুমেরু বৃত্তের চিরতুষারের রাজ্যে নতুন মহাদেশ আবিষ্ক্রিয়ার নেশায় বিজ্ঞানী ও দুঃসাহসী অভিযাত্রীর দল এখন কর্মরত। হয়ত ধারণাতীত অল্প সময়েই পৃথিবীর মানচিত্র বদলাবে, যেমনি বদলাচ্ছে অপরিজ্ঞাত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মহাব্যোমের রূপ ও ধারণার। কারণ মঙ্গলগ্রহে যাবার কল্পনা এখন আর আকাশকুসুম নয়; ঊর্ধ্বাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠাবার মালমশলা তো প্রায় তৈরী। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞানরাজ্যে আর একটা বিপ্লব আসন্ন, আর তার সঙ্গে মানবসমাজের কর্মকাণ্ডেরও।

কিন্তু কুসুমেই কীট, ভালোতেই মন্দ, কল্যাণেই অকল্যাণ, আর সৃষ্টিতেই ধ্বংসের বীজ নিহিত। এটা তো স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। কাজেই ১৯০৫ সালের ১৭ই জুলাই আচার্য আইনস্টাইন যখন আপেক্ষিকবাদ তত্ত্বের (Theory of Relativity) উদ্ভাবন করে দেশ (Space) ও কাল (Time) সম্পর্কে নতুন ধারণার প্রবর্তন করেন এবং বস্তু ও শক্তির সাদৃশ্য আর একের অন্যে রূপান্তর

করণের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন মানুষের জ্ঞান ও চিন্তাধারায় নিশ্চয়ই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। এর পর ধাপে ধাপে গত ৫০ বছর ধরে স্বীয় মতবাদকে প্রসারিত ও পরিস্ফুট করে তিনি যখন একীকৃত 'ক্ষেত্রতত্ত্ব (Unified Field Theory, '29) হতে মহাকর্ষের সাধারণতত্ত্ব (Generalised Theory of Gravity) নামে সংশোধিত বিশুদ্ধ ক্ষেত্রতত্ত্বের (Pure Field Theory, '49 & '52) সিদ্ধান্তে পৌঁছে মহাকর্ষ শক্তি, তড়িৎ চৌম্বক শক্তি ও পরমাণু কেন্দ্রীণের শক্তি তথা বস্তুজগতের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দানের পথ অধিকতর সুগম হবে বলে আশা করছিলেন, তখন মধ্যবর্তী কালে তাঁর সূক্ষ্ম ও জটিল গাণিতিক হিসাব হতেই পরমাণু-ধৃত প্রচণ্ড, কালান্তক শক্তির উদ্ভব ঘটিয়ে তাঁকে হয়ত চমৎকৃত করেছিল। বস্তু ও শক্তির সম্বন্ধসূত্রের ব্যাখ্যায় তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন: সূর্য ও নক্ষত্ররাজি অনন্তকাল ধরে আলো বিকিরণ করেও অব্যয় ও অক্ষয়। এর হেতু, এদের দেহের মৌলিক পদার্থ নিচয় অবিরাম শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে আর এ শক্তিই এদের তেজ ও আলোর অনন্ত উৎসে পরিণত হয়েছে। এঁহেন যুগান্তকারী সূত্রই আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার দানবীয় শক্তি বিকাশের মূলে নিহিত। তিনি ভাবেননি, মানব কল্যাণব্রতী বিজ্ঞানীর জীবনব্যাপী সাধনা রাষ্ট্রনেতা ও হিংস্র লোভী দলের পাশুপত অস্ত্রে পরিণত হবে। এসত্ত্বেও জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের ('৫৫, এপ্রিল) পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিশ্বহিত চিন্তায় নিযুক্ত ছিলেন, কণাবাদবিরোধী ক্ষেত্রতত্ত্বদ্বারা অপেক্ষিকবাদ ও অধিকাংশ পদার্থ বিজ্ঞানী সমর্থিত কণাবাদের (Quantum Mechanics) মধ্যে সেতুবন্ধ রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু নিজের সৃষ্টির অসম্পূর্ণতায়, —আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমায় বিশ্ব-নাশনের আশংকায় তাঁর আপসোসের সীমা ছিল না। সখেদে বলেছিলেন, 'আগে জানলে বৈজ্ঞানিক না হয়ে দোকানদার হতুম!' কী নিদারুণ হতাশা!

কিন্তু যে Quantum theory হতে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার উদ্ভব, আইনস্টাইনের মতে তাই তো যত 'অনিষ্টের মূল'। অনুতপ্তের মতো শেষ জীবনে একদা তিনি বলেছিলেন—"আণবিক অস্ত্র প্রস্তুতের সুপারিশ করে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট লিখিত পত্রে স্বাক্ষর করে আমি মহাভুল করেছি।" আবার জীবদ্দশায় তো বটেই, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মানবজাতির ভবিতব্য সম্পর্কে চিন্তা করে তিনি স্বস্তি পাননি। এই হেতু মৃত্যুর প্রাক্কালে ১৮ই এপ্রিল তিনি আণবিক অস্ত্রের অপকারিতা ও ভয়ঙ্করতা সম্পর্কে জগদ্বাসীকে সতর্ক করে এক ঘোষণা পত্রে স্বাক্ষর করেন। ওতে আরও সাতজন বিশ্বপূজ্য বিজ্ঞানী স্বাক্ষর করেছিলেন। এই ঘোষণাবাণী তাঁর জীবনের শেষ ইচ্ছা বা Last testament হিসাবে গ[illegible]। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক লর্ড বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মারফৎ ৯ই জুলাই ('৫৫) ঐ ঘোষণা প্রচারিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—"ভবিষ্যতের যে কোন যুদ্ধে নিশ্চয় আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে; এতে মানবজাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে। কাজেই পৃথিবীর বিভিন্ন গবর্ণমেণ্টের কাছে একথাটা উপলব্ধি করতে ও প্রকাশ্যে স্বীকার করতে অনুরোধ জানাচ্ছি, বিশ্বযুদ্ধ তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক হবে না। এহেন অবস্থায় শান্তি পূর্ণ উপায়ে নিজেদের মধ্যে বিরোধ মীমাংসাকল্পে তাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। মানুষ-রূপে মানুষের কাছে আমাদের এ আবেদন। নিজেদের মানবীয় সত্তা মনে রেখে অপর সব কিছু ভুলে যেতে হবে। যদি তা' সম্ভব হয় তা' হলে এক নতুন স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলে যাবে। যদি তা' না হয় তবে মহতী বিনষ্টি সুনিশ্চিত।

* * আমরা কি মানবজাতির বিনাশ ঘটাবো, অথবা মানবসমাজ কি যুদ্ধ পরিহার করবে?" এরই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে ৩রা আগষ্ট ('৫৫) লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তিনদিন ব্যাপী আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তাঁরই মতের প্রতিধ্বনি করা হয়েছে।

একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধ বিগ্রহে আণবিক অস্ত্র ব্যবহৃত হলে মানবজাতি বিলুপ্ত হতে পারে, আর এহেতু কোন রাষ্ট্রেরই স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই।

১৯৪৫ সালের ৬ই আগষ্ট জাপানে হিরোশিমা সহরের ওপর মার্কিন বিমানবাহী রণতরী হতে একটি বিমান উড়ে গিয়ে বিশ্বের প্রথম আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এর প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য, দণ্ডভীতি দেখিয়ে জাপানকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। আর মিত্রপক্ষের এ উদ্দেশ্য সফল না হয়েছিল এমন নয়। কারণ, হিরো-শিমার ৩ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ৬০ হাজারই কালানলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ; বেঁচে যারা রইলো, তাদের কেউ পঙ্গু, কেউ অন্ধ, কেউবা জড়। এর বিষক্রিয়া ইদানীংকালেও দেখা যাচ্ছে : বাড়ন্ত যুবক-যুবতী আর মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণও সদ্যোজাত সন্তানেরও পরিত্রাণ নেই।

এমনি করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে বটে ; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রয়োজনে নিযুক্ত বিজ্ঞানীরা মানবকল্যাণে নয়, মানববিনাশের যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন। তাঁদের গবেষণার ফলে আণবিক বোমার চেয়েও শত শত গুণ বেশি ভয়ংকর আয়ুধ তৈরী হয়েছে ; এখন আবার কোবাল্ট বোমার কথা শুনা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বিকিনি-দ্বীপ, নেভাদা মরু ও সাইবেরিয়ার জনহীন প্রান্তরে তাদের ধ্বংস কারিতা প্রমাণিত হয়েছে। এতো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধেরই মহড়া। যুদ্ধশেষ করার জন্যে যুদ্ধের প্রয়োজন রয়েছে, পৃথিবী হতে নিপীড়ন আর পররাজ্য গ্রাসের ভীতি দূর করতে হবে বলে চতুর রাষ্ট্র-নায়কগণ যে আওয়াজ তুলেছিলেন, তার অন্তঃসারশূণ্যতাই এতে প্রতিপাদিত হয়েছে। যেহেতু এতো অস্ত্র বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ও নিত্যনতুন মারণাস্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে এজাতের বলাকওয়ার কোন সামঞ্জস্য নেই। এর আসল উদ্দেশ্য, দণ্ডভীতি ও ত্রাসোৎপাদন করে প্রাধান্য বিস্তার। যেমন হাইড্রোজেন বোমার

ধ্বংসক্ষমতার কথা ধরা যাক। এজাতীয় একটা বোমা ফাটলে তার বিষক্রিয়া সাত হাজার বর্গ মাইল পরিমিত স্থানে বিস্তৃত হতে পারে। আর অনেকগুলো ছুড়লে তো বিশ্বজুড়ে মরোণোৎসব চলবে—বিশ্বমানবের সংস্কৃতি সভ্যতার সমাধি হবে। বেশি লোকই ধীরসঞ্চারী ব্যাধি, জড়তা ও পঙ্গুতায় হবে আক্রান্ত। আবার একটি হাইড্রোজেন বোমায় যে আগুন জ্বলবে, তা' নেভাতে লাগবে ২৫ হাজার লোক (সারা বৃটেনে সব শুদ্ধ কুড়ি হাজার দমকল কর্মী আছে)। বোমার কেন্দ্র হতে চারদিকের পাঁচ মাইল স্থান সম্পূর্ণ ধ্বংস হবে, সাত মাইল পর্যন্ত স্থানের প্রায় বাড়ীঘরই ভাঙ্গবে, দশ মাইল পর্যন্ত বাড়ীর ইস্পাতের কাঠামোর গুরুতর ক্ষতি হবে, তার ও আলোর থাম, গাছ ও ঘরবাড়ী পড়ে দশ মাইল পর্যন্ত রাস্তাঘাট আটক হবে, পনের মাইলের মধ্যে সমস্ত বাড়ী জখম হবে, ১৮ মাইল পর্যন্ত বাড়ীগুলোর পলস্তারা খসে পড়বে ও জানালা দরজা ভেঙ্গে পড়বে। তা'ছাড়া বিস্ফোরণের পর যে তেজস্ক্রিয় ছাই আকাশ থেকে অভিশাপরূপে ঝরে পড়বে, তার বিষক্রিয়া আট হাজার বর্গ মাইল স্থানে পরিব্যাপ্ত হবে। কাজেই পরিখা এবং এমন কি ভূগর্ভে আশ্রয় নিয়েও কেউ নিরাপদ হবে না। অর্থাৎ আণবিক অস্ত্র এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক মুষল; এতে যদুবংশরূপী সমগ্র মানব সমাজের ধ্বংস অনিবার্য।

মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্যতর মুষলপর্বে—যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপঃ দ্বারকায় যদুকুলনন্দনগণ শ্রীকৃষ্ণের শাম্ব নামীয় পুত্রকে বৌ সাজিয়েছে, সন্তানসম্ভবা দেখাবার ব্যবস্থা করেছে। রাস্তায় যাচ্ছিলেন কোপনস্বভাব অষ্টাবক্র মুনি। তারা রসিকতা করার প্রলোভন ছাড়তে পারলো না। প্রশ্ন করলোঃ এ মেয়ের গর্ভে কী সন্তান হবে? মুনিবর সব বুঝলেন। ক্রোধান্ধ হয়ে শাপ দিলেনঃ এ মুষল প্রসব করবে, আর এতেই হবে যদুকুল নাশ। মুনির অভিশাপ, বিফল

হয় না। কিন্তু এর গতি হবে কি? বিব্রত ও নিরুপায় হয়ে যদু বংশনন্দনরা কৃষ্ণ ভক্ত ও বংশের মন্ত্রণাদাতা উদ্ধবের কাছে গেল। তিনি বললেন, 'ঘষে ঘষে মুষল ক্ষইয়ে ফেলো।' কিন্তু যদু-দুলালরা ধৈর্যহীন; আধা ক্ষয় করে মুষলের অবশিষ্টাংশ জলে ফেলে দিলো। এসময় একটা রাঘব বোয়াল সেটাকে খাবার মনে করে করলো গ্রাস। এটা আবার জেলের জালে ধরা পড়ে বিক্রয়ের জন্যে রাজবাড়ীতে হলো নীত। তখনো মাছের পেটে মুষলাংশ হজম হয়নি; ওর পেট হতে বেরুলো ওটা। কিন্তু অনাবশ্যক মনে করে ফেলে দেয়া হলো। অথচ ব্যাধ সেটা দেখতে পেয়ে সাগ্রহে তুলে নিলো,—তা'র তীরের ফলা হবে যে। ত্রেতায় রাম কর্তৃক নিহত বালীর পুত্র অঙ্গদ দ্বাপরে এ-জন্মে ব্যাধ। মুষলের একাংশ দিয়ে গড়া হলো ফলা, আর একাংশ জলে নিক্ষিপ্ত হলো। সেই পরিত্যক্ত অংশেই শরবন বা নলখাগড়ার সৃষ্টি। যদু-দুলালরা—প্রভাস তীর্থতীরে—স্নানে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে তুললো। এর ফলে দুই পক্ষে বিভক্ত হয়ে গিয়ে তারা তীর ধনুক নিয়ে লড়াই শুরু করলো; কিন্তু তীর নিঃশেষ হবার পর হাতের কাছে নলখাগড়া নিয়েই উভয় পক্ষ মারামারি করতে করতে ধ্বংস হয়ে গেলো। ঝাড়ে বংশনাশে কুলপতিরা চিন্তিত, ম্রিয়মান। বলরাম যোগে দেহত্যাগ করলেন; আর শ্রীকৃষ্ণ প্রভাসতীরবর্তী নিম গাছে বসে আরক্তিম পদযুগল দুলিয়ে দুলিয়ে জীবলীলার নিত্যতা সম্পর্কে চিন্তা করছিলেন। নিষাধের চোখে পড়ল নৃত্যরত যুগলপদ; মনে ভাবলো লাল পাখী। আর তা-ই লক্ষ্য করে অব্যর্থ শর সন্ধান। শ্রীকৃষ্ণের জীবদেহ শেষ হলো। এদিকে কৃষ্ণসখা অর্জুন খবর পেয়ে যদুকুলের বিধবা মহিষী ও ললনাদের হস্তিনায় নিয়ে যাবার জন্য এলেন। কিন্তু রাস্তায় ডাকাত দলের আক্রমণে বিপর্যস্ত; এমনকি কৃষ্ণহীন অর্জুন বলহীন; গাণ্ডীব তুলতেও অক্ষম। তাঁর চোখের সামনেই হলো যাদবীরা অপহৃত। আর শেষ হলো যদুবংশ।

—দুই—

মহাভারতের পথ

পণ্ডিতদের মতে মানব সভ্যতার প্রথম যে ত্রিমুখী ধারা মধ্য এশিয়া হতে প্রবাহিত হয়েছিল, তার একটি ভারতে এসে স্থিতি লাভ করেছিল, এখানেই তার বিকাশ ঘটেছিল। অর্থাৎ সভ্যতার অন্যতম প্রাচীন লীলাক্ষেত্র দেবভূমি এই ভারতভূমি। মহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পার সিন্ধু-সভ্যতা তা'র নিদর্শন। ষড়াঙ্গ-দর্শন, বেদ-বেদান্ত, পুরাণ ও মহাভারত এখনো চূড়ান্ত দার্শনিকতা ও চিন্তানায়কতার জাজ্বল্য প্রমাণ। এতে কিছু কিছু স্বাক্ষর রয়েছে বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও চিন্তাধারার; আবার এর কিছু কিছু নিছক লৌকিক কাহিনী—সামাজিক আচারবিধি ও অনুশাসন—কণ্টকিত। এই শেষোক্ত পর্যায়ে শুরু ভারতের কূপমণ্ডূকতার। তখন অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তিকে গ্রাস করলো চিত্তবৃত্তির স্থবিরতা; কাজেই চিন্তায় এলো আবিলতা। ভারতবাসী বহির্জগতের সংঘাত হতে আত্মরক্ষার তাগিদে চারিদিকে প্রাচীর খাড়া করে নিজের দৈন্য ঢাকবার প্রয়াস করে। আর প্রাকৃতিক দিক হতে সে তো বর্মাবৃত,—সমুদ্র-মেখলা ও ভূধর-আশ্রিত। তার এই নিরাপদ আশ্রয়ই তার মানসিকতাকে ক্রমশ করে পঙ্গু, পূর্ব-পুরুষের দুঃসাহসিক প্রবৃত্তিতে সঙ্কুচিত। লোপ পেলো বিজয়াকাঙ্ক্ষার, নষ্ট হলো বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র, শেষ হলো চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান, আর বাণিজ্যিক লেনদেন। যে-ভারতের পশ্চিম প্রান্ত হতে যুগ-সূর্যের সোনালি আভা দিক-দিগন্ত উদ্ভাসিত করেছিলো, তা'হলো স্তিমিত। সে-দিন আর্য-সভ্যতার রাহুগ্রাস।

বস্তুতঃ বহির্জগৎ ও বস্তু-বিমুখীনতা হতেই ভারতবাসীর পতনের সূচনা। অবশ্যই এটা তার জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের স্বীকৃতি। বাইরের আঘাতে জর্জর হয়ে অথবা বৃহত্তর ও প্রচণ্ডতর শক্তি হতে আত্মরক্ষায় অক্ষম হয়ে শম্বুকের মতো নিজেকে খোলসের ভেতর গুটিয়ে আনাটা তার জীবনীশক্তির নিঃশেষ অপচয়। কিন্তু বেশ কিছু কাল শান্তিতে কাল কাটাবার সময় ভারতে যে-ঐহিক ও অধ্যাত্মসম্পদ গড়ে ওঠে, তা' বিদেশীদের একাধারে শিক্ষা ও লোভের লক্ষ্যে পরিণত হয়। একদিকে হয় সে পৃথিবীর গুরু, জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্র; অন্যদিকে হয় শক-হূণ মোগল-পাঠানের আক্রমণে বিপর্যস্ত। কিন্তু এত করেও ভারতের প্রাণসত্তা নিস্তেজ হয়নি, তখনো অন্যকে গ্রহণ ও আত্মসাতের জারক-শক্তি তার ছিল। তাই অবশেষে বহিরাক্রমণকারীরা একদেহে হলো লীন, মহাভারতের অঙ্গ-লীন। এভাবেই তো ভারতীয় জাতি, ভারতীয়তা ও মহা-ভারতের সৃষ্টি।

আত্মপ্রত্যয় ও শক্তিহীনতা, আত্মকলহ, ভেদাভেদ জ্ঞান, বিভেদপ্রবণতা ও সঙ্ঘহীনতাই ভারতবাসীর পতনের মুখ্য হেতু। এটা ইতিহাসের স্বীকৃত সত্য। এ-পতনকালের মেয়াদ কয়েক শতাব্দী একাদিক্রমে প্রসারিত। কিন্তু এ সময়ে রাষ্ট্রহিসাবে ভারতের অস্তিত্ব ছিল না, একথা যেমন সত্য, বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদে তার স্বর্ণপ্রসূ খ্যাতি বিশ্বব্যাপী হয়েছিল, একথাও তেমনি সত্য। তাই বিগত-বৈভব প্রাচ্যের মহিমা অস্তগত হলেও নবোদিত পাশ্চাত্ত্য শক্তির অভিযান ভারতকে লক্ষ্য করেই হয় আরম্ভ। অর্থাৎ ভারতের রত্নভাণ্ডার আহরণ ও শোষণ করে নিজেদের সম্পদ তথা ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় সকলে মত্ত হয়। এদের হাতিয়ার বি-জ্ঞান। ১৭৬০ সাল হতে ১৭৭০ সালের মধ্যে বিলেতে বিজ্ঞানের নতুন অধ্যায়ে যে-শিল্প

বিপ্লবের সূচনা, তারও আগে থেকেই সুরু এদের নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রয়াস। এবার পৃথিবীর নায়ক নবীন য়ুরোপ। তাদের একদল গেলো 'নতুন পৃথিবী' আমেরিকায়; একদল পৌঁছুল ভারতের খোঁজে মধ্যপথে 'কৃষ্ণ মহাদেশ' আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে (Cape of good hope); শেষে ঘুরতে ঘুরতে এলো অভিযাত্রী দল ভারতবর্ষে। এদের নায়ক পর্তুগীজ ভাস্কো-ডি-গামা; এদের আশু লক্ষ্য বাণিজ্য। অর্থাৎ পৃথিবীর সভ্যতার স্রোতধারা বিপরীতমুখী হলো, ভারতে পাশ্চাত্ত্য বণিক-সভ্যতার বীজ উপ্ত হলো।

কিন্তু রুশরা বলেন ভিন্ন কথা। তাঁদের মতে, পঞ্চদশ শতকে পর্তুগীজরা মালাবার উপকূলে অবতরণ করার প্রায় বছর তিরিশ আগে আফানাসি নিকিতিন নামীয় জনৈক রুশ পর্যটনকারী ও ব্যবসায়ী সমুদ্র ও স্থলপথে ভারতে আসেন। এখানে তিনি কয়েক বছর নানা বাজার ও মন্দির দেখে কাটান। ভারত ভ্রমণের বিবরণ তিনি নাকি লিখে গেছেন।

আসল প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। বলা হয়, ভারতের সভ্যতা শাশ্বত। তবে কত যুগযুগান্ত আগে এ-দেশভূমে সভ্যতার প্রথম উন্মেষ হয়েছিল, সে-গবেষণার শেষ এখনো হয়নি। পণ্ডিতদের মধ্যে এ-নিয়ে মতভেদের বেশ অবকাশ রয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, আর্য সভ্যতার প্রাচীনত্ব মোটে হাজার পাঁচ বছর, আবার কেউ বা বলেন ঢের বেশি। তবে বয়স যাই হোক, এ-সভ্যতা যে প্রাচীন, অথবা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা, তা' নিয়ে কারুর দ্বিমত নেই। শুধু এখন কাল নির্ণয় বাকি। এখন সিন্ধু সভ্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন, নানা প্রমাণপত্র মিলছে। হরপ্পা ও মহেন-জো-দড়োর নগর সভ্যতার ইতিহাস তো ভারতবর্ষের তমসাচ্ছন্ন অন্ধ যুগের ওপর নতুন আলোকপাত।

প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতদের মতে, এ-সভ্যতা চৈনিক বা ইরাকীয়, মিশরীয় অথবা মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার সহোদর, সমকালীন। তবে শেষ কথা বলা এখানো হয়নি এসম্পর্কে, যেহেতু আবিষ্ক্রিয়ার প্রক্রিয়া ও শোধন এখনো চলছে; চলছে কাল নির্ণয়ের ধুম। এতে করে ইতিহাসের নতুন পঞ্চরাস্থি গড়ে উঠছে, নতুন করে মেদ সঞ্চার হচ্ছে। শিলালেখ, প্রাচীনলিপি, মৃন্ময় ও নানা ধাতব মূর্তি, পোড়ামাটির নানা পুতুল ও খেলনা, মুদ্রা, খোলামকুচি, প্রস্তর বা অন্যবিধ গুটিকা, মৃৎপাত্র, ঢালাই দ্রব্য ও ইট আর পাথর এর্র মালমসলা, এর ভিত্তি।

আর্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান তার দর্শনশাস্ত্র—বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত। ঋষিদের মতে অনাদি ও অপৌরষেয়। এগুলো পরমার্থ জ্ঞান ও আত্মদর্শনের মনিমঞ্জুষা, রত্নখনি। আচার্য মোক্ষমূলার হতে সব কজন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক প্রবরই এসবকে হিন্দু মনীষার চরমোৎকর্ষ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তার পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার জয়গান করেছেন। হয়ত এঁরা জয়তিলক এঁকে না দিলে নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনের কদর ভারতবাসী ভুলে যেতো, আত্মাবমাননা ও চিরবিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যেতো।

সভ্যতার কাল-গণনার আর একটি মাপকাঠি সাহিত্য-দর্শন। এদিক দিয়ে বেদের প্রাচীনতা অনস্বীকার্য। আর্যসভ্যতার উষায় সিন্ধুতটে এর উদ্ভব; নানা শ্লোক ও সূক্তে তার স্বাক্ষর। এসময়টা নিছক আরণ্যক পর্ব। এর পরবর্তী কালে লোকালয় ও জনপদের সৃষ্টি, নতুন সভ্যতার গোড়া পত্তন। সামাজিক ও প্রশাসনিক তাগিদে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ধীরে ধীরে সহর গড়ে ওঠে। তারই পদচিহ্ন মহাভারত-রামায়ণে। বেদে যাগযজ্ঞের মাহাত্ম্য, আধ্যাত্মিকতার প্রাবল্য, তত্ত্ব ও জীবনজিজ্ঞাসার ছড়াছড়ি। পক্ষান্তরে মহাভারতে

রাজ-রাজড়ার কাহিনী, লৌকিক আচার-বিচার সুনীতি-দুর্নীতি, প্রশাসনিক কলাকৌশল, শত্রু নিপাত, রাজ্য বিস্তার ও প্রজাকুল শাসনের ব্যবস্থা বর্ণনা। আর এতে রয়েছে নতুন আর্য-সভ্যতার সঙ্গে দেশজ প্রাচীন দ্রাবিড়সভ্যতার সংঘাত। একালের ইতরজন কর্মব্যস্ত, কাজেই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, যাগযজ্ঞ ও হোমে কিছুটা হয়ত অবিশ্বাসী। তারা হয়েছে লোকাচার ও সামাজিকতার দাস; সমাজবন্ধন ও অনুশাসন-শাসিত। এভাবেই ভোগবাদ ও ইহকাল সর্বস্বতা মানুষের মন জুড়ে বসে। আর এমনি করে নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ভারতে। এ ব্যাপারে সব দেশের কাহিনীই কিন্তু একইরূপ।

কিন্তু আর্য-সভ্যতার মূলভিত্তি অধ্যাত্মিকতা। ধর্মকে কেন্দ্র করে তার সমগ্র বিষয়কর্ম আবর্তিত। তার সাধনা দেহের নয়, দেহাতীতের। ভোগবাদের মধ্যে নিরাসক্তি, বিষয়তৃষ্ণার মধ্যে বিষয়বৈরাগ্য, ইন্দ্রিয়াসক্তির মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা তার কাম্য, সারা জীবনের লক্ষ্য। তাই আর্য-হিন্দুর পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাবার বিধান। আর পুরাণোক্ত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ ত্রিমূর্তি, তিনটি কালের প্রতীক। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের এঁরা অধিপতি। অর্থাৎ একটা সমগ্র মানবীয় সত্তা আমৃত্যু নিয়তির রথচক্রে আবর্তিত, তার প্রতীক এঁরা। কিন্তু এ-সব দেবচরিত্রের যে মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ বাসনাকামনার প্রতিচ্ছবি। কাজেই হিন্দুর অষ্টাদশ পুরাণ একদিকে যেমন তার জীবনের অধ্যাত্ম্য তৃষ্ণা ও গল্প শুনবার প্রবৃত্তি চরিতার্থ করেছে, তেমি জাতীয় জীবনের ইতিহাসের উপাদান জুগিয়েছে। নানা বিষয় বিচার করে তাই মনে হয়, পুরাণ ইতিহাস লক্ষণ-ভারাক্রান্ত। আঠারোটি পুরাণ যেন ইতিহাসের আঠারোটা অধ্যায়, কালের যাত্রাপথের এক একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পদচিহ্ন।

আর হিন্দুর জীবনধারায় এদের প্রভাব অদৃশ্যসঞ্চারী, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী।

শাস্ত্রবাক্যে আছে—"ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ"; অর্থাৎ ইতিহাসরূপী পুরাণ দিয়ে বেদকে কালোপযোগী ব্যাখ্যা করতে হবে। কাজেই পুরাণ ইতিহাসেরই অঙ্গ। এই গেল এক দিক। অন্য দিকে, বেদ ও পুরাণের মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই; বরং উভয় কালের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যকর্মের মধ্যে রয়েছে একটা ধারাবাহিকতা, একটা পারম্পর্য ও ক্রমিক পরিণতি।

বেদ ও পুরাণের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা এস্থলে অবান্তর। তবে বিভিন্ন পুরাণ অভ্যুন্নত চারিত্রিক বল, অধ্যাত্মসম্পদ ও প্রকৃষ্ট দেশপ্রেমের আঁধার। স্থানে স্থানে তো এর কাহিনী অপরূপ, রসঘন। অবশ্য বিষয়বস্তু বা আখ্যানভাগ রূপক ও প্রতিরূপে মোড়া। এটা হিন্দু-মানসিকতা। দেবতারূপী অতি-মানবের অলৌকিক লীলাখেলার মুকুরে নিজের বিচিত্র রূপদর্শন ও প্রতিফলন তার কাম্য; তা-ই বাস্তবতার রং-এ আঁকা কল্পিত দেবদেবী একান্ত ঘরোয়া হলেও পূজ্য। কিন্তু দেববরে বলীয়ান মানুষ জড় দেহনাশে মোক্ষলাভ বাঞ্ছা করে; আর শান্তং শিবং অদ্বৈতম্ হয় তার জীবন সাধনা। এদিকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ লৌকিক বিষয়কেও লোকাতীত ব্যঞ্জনায় মহনীয় ও বরণীয় করে দেখা তার স্বভাব। এই দেখবার ভঙ্গিটাই তার বৈশিষ্ট্য, তার কাছে সত্য। এভাবে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রের মধ্যে অণোরণীয়ান, মহতো মহীয়ানের সন্ধান ও উপলব্ধি, অর্থাৎ ভিন্ন কথায় গোষ্পদেও আকাশ দর্শন তার স্ব-ধর্ম। এটাই হিন্দুর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য জীবনদর্শনের যুগান্তপ্রবাহী ধারাস্রোত।

শিবপুরাণে কীর্তিত হরগৌরী উপাখ্যান ধরা যাক। এ যেন

মর্ত্যলোকে অমরার কাহিনী। শ্মশানচারী বিষয়বিবাগী মহেশ্বর, আর ভুবনমোহিনী ষড়ৈশ্বর্যময়ী নারীত্বের মহিমায় উদ্ভাসিত গৌরী। স্বভাবধর্মে উভয়ে বিপরীতমুখী; কিন্তু গৌরীর তপস্যায় সিদ্ধি অধিগত। অথচ কন্যার অভিভাবককুল বিমুখ; পিতা প্রজাপতি দক্ষ ঘোর শিবদ্বেষী; আরম্ভ করলেন শিবহীন যজ্ঞ। এতে ত্রি-ভুবনের বিশিষ্ট সকলের আমন্ত্রণ, শুধু নয় মেয়ে-জামাই-এর। এ অপমান স্বেচ্ছাকৃত। কিন্তু গৌরীর জেদ, পিত্রালয়ে যাবেনই। শিবের যুক্তি ও আপত্তি তিনি শুনলেন না। অথচ শিবনিন্দার জন্য আহূত যজ্ঞ গৌরীর অসহ্য। পতিনিন্দায় তিনি দেহত্যাগিনী। মহেশ্বরের ত্রিনয়নে বহ্নিজ্বালা, শত সূর্যের খরপ্রভা। তাঁর জটাজাত বীরভদ্র, আর সহচর নন্দী ভৃঙ্গীর দাপটে যজ্ঞশালা ছত্রখান; ছিন্নশির দক্ষ ছাগমুণ্ড-শোভিত। সতীবিরহে কাতর মহাযোগীও অস্থির, উদভ্রান্ত! রে সতী, রে সতী কাঁদিলা পশুপতি,—পাগল শিব প্রমথেশ। শুরু হলো সতীদেহ নিয়ে প্রলয়ংকর তাণ্ডব, সারা ভারতপরিক্রমা। কিন্তু সৃষ্টি রসাতলে যায়-যায়। দেব-দানব-মানব-গন্ধর্ব-কিন্নর উদ্বিগ্ন, শরণ নিলেন বিষ্ণুর। এবার লড়াই প্রলয়ের সঙ্গে স্থিতির, নিষ্প্রাণের সঙ্গে প্রাণের। সৃষ্টিনাশ হতে দেবেন না বিষ্ণু। কিন্তু প্রাকৃত জনোচিত শোক হতে মুক্তি দেবার জন্যে প্রলয়াধিপতির চৈতন্য সঞ্চার প্রয়োজন। তাই সুদর্শনচক্রের অলক্ষ্য চালনায় সতীর বিভূতিহীন মরদেহ খণ্ডবিখণ্ড করা হলো। ভারতের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে বাহান্নটি স্থান শিবপদ-লাঞ্ছিত ও গৌরীর বরদেহপূত বাহান্নটি (মতান্তরে ৫১টি) তীর্থপীঠে পরিণত। অর্থাৎ শিব পরিক্রমাক্ষেত্র. পূর্বে কামরূপ কামাখ্যা, পশ্চিমে আফগানিস্থানের মরুপ্রদেশ (মতান্তরে বেলুচিস্থানের লাসবেলা রাজ্যের দুর্গম হিংলাজ), দক্ষিণে লঙ্কা ও উত্তরে তিব্বতের মানসসরোবর।

চতুঃসীমাকৃত এ-বিশাল ভূভাগ দেবতার লীলাভূমি, ভারতবাসীর পরম তীর্থস্থান।

অবশ্য ধর্মীয় ব্যাপারে এই ভাষ্য প্রযোজ্য। কিন্তু লৌকিক বিচারের মানদণ্ডে এর মূল্য এখন কিছু কম নয়; বরং সামাজিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক নিরিখেও এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তবে একটা বিষয়ে মতভেদ নেই,—হিন্দু সমাজের অধিকাংশের কাছে পুরাণ ধর্মপুস্তকরূপে স্বীকৃত ও পূজিত। এ সত্ত্বেও এক শ্রেণীর গুণী একে লোকরঞ্জক সাহিত্যের মর্যাদা দিয়ে থাকেন; কেউ এতে দেখেন সমকালীন সামাজিক প্রতিচ্ছবি; আবার ঐতিহাসিক তত্ত্বের সন্ধানও এতে কেউ বা করেন। অবশ্য গবেষণাসাপেক্ষ হলেও একটা কথা বলা হয়ত হঠকারিতা হবে না: শিবের প্রদক্ষিণ পথরেখা সমসাময়িক ভারতের ভৌগোলিক রূপ, অথবা ধর্ম, সংস্কৃতি ও সমস্বার্থ বন্ধনে আবদ্ধ এক অবিচ্ছিন্ন ভূভাগ। আর একদা আফগানিস্থান তো ভারত রাষ্ট্রেরই অঙ্গ রাজ্য ছিল। ভারত-বিভাগের আগে বেলুচিস্থানও তাই। ইতিহাসের ছাত্র জানেন, পুরুষপুর বা পেশোয়ার রাজা কণিষ্কের রাজধানীর অধুনাতন সংস্করণ। এমনকি, প্রাক বৃটিশযুগেও আফগানিস্থানের একাংশ পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের রাজ্যভুক্ত ছিল। এখনো আফগানিস্থানে বহু হিন্দুত্বের নিদর্শন বর্তমান, অল্প কিছু হিন্দুও সেখানে আছেন। কাজেই এটা ইতিহাসসিদ্ধ ব্যাপার। এ ব্যাপারে আর একটা গূঢ় সত্য পরিস্ফুট। যে বাহান্নটি পীঠস্থান ভারতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, তারা যেন ভৌগোলিক ভারতের গ্রন্থিমালা; একটির সঙ্গে অন্যটি গ্রথিত, অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। অতীতে পুণ্যলোভী ভারতীয় এক পীঠ হতে অন্যটিতে দেব বা দেবী দর্শন মানসে বছরের পর বছর ভারতময় পর্যটন করে ফিরেছে, তীর্থের পুণ্য সঞ্চয় করেছে। এখনো সে তীর্থযাত্রার বিরাম নেই।

ধর্মীয় ক্ষেত্রগুলো শুধু ভারতবাসীর আধ্যাত্মিক প্রেরণার উৎস নয়, বা আত্মিক ক্ষুধা মেটাবারই স্থান নয়। সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও বৈষয়িক পরিণামফলের দিক হতে তীর্থস্থানগুলোর দূরবিস্তৃতি ও ব্যাপকতা গভীর তাৎপর্যবোধক। একদিকে এগুলো ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র ভাষাভাষী নরনারী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সামাজিক মিলনক্ষেত্র, সম-মানসিকতার মুকুর; অন্যদিকে আন্তঃরাজ্য প্রীতি ও ভাব-বিনিময়, বুঝাপড়া ও সহযোগিতা, আর সাংস্কৃতিক সহমর্মিতা ও বাণিজ্যিক সংযোগের সহায়ক। কাজেই প্রাচীন ভারতের তীর্থক্ষেত্রে মোক্ষকামীদেরও শুধু ভীড় জমতো না, এর লৌকিক দিকটাও আদৌ উপেক্ষনীয় ছিল না। কিন্তু একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য। মূলত যাঁরা ধর্মাশ্রয়ী তীর্থযাত্রী, প্রকারান্তরে তাঁরাই শান্তিদূত। ভারত-তীর্থের চিরন্তন পথ পরিক্রমায় অবিরাম এঁদের যাত্রা, অন্তহীন আনাগোনা। ভারত আত্মার আবিষ্কার তাঁদের চরম লক্ষ্য। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির ললিতবাণী বারেবারে তাঁরা শুনিয়েছেন; কিন্তু কৃপাহীন সংসার তাঁদের আহ্বানে তেমন সাড়া কখনো দেয় নি,—না জীবদ্দশায়, না গতজীবনে। লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা অম্নিতেই তাঁদের জুটেছে, আবার কাউকে বা আত্মাহুতি দিয়ে মানবজাতির সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে। তবে হামেশাই তাঁদের বাণী voice in the wilderness; সংসার অরণ্যে নিঃসঙ্গাচারী তাঁরা। এসত্ত্বেও তাঁরা ব্রতনিষ্ঠ; অসংখ্যের ভিড়েও স্বতন্ত্র, বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে দেহধারী। অবশ্য এটা সবটাই জন্মগত ব্যাপার নয়। অনেকটা পরিবেশগতও বটে। যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত; অভ্যুত্থানমধর্মস্য সৃজাম্যহম্। এ জাতের মানুষেরাই কিন্তু অতিমানব, দেহী হয়েও দেবতুল্য, Superman, স্থানকালপাত্রভেদে এঁরা সময়ে আত্মিক, সময়ে রাজনৈতিক নেতা; তবে সর্বোধ্বে তাঁরা লোকগুরু। এঁদেরই পুরোগামী গৌতমবুদ্ধ, মহাবীর, যীশু,

মুশা, লাওৎ-জে, সম্রাট অশোক, চৈতন্য, কার্ল মার্ক্স, এঙ্গেল্‌স, লেনিন। ঐতিহাসিক মহাপুরুষ এরা, অবিনশ্বর এঁদের কীর্তি। তাঁদের মহাজীবনের আবেদন শাশ্বত; কালের স্থূল হস্তাবলেপ সত্ত্বেও তাঁদের ত্রিকালজয়ী বাণী অম্লান, ভাস্বর। লোক হতে লোকান্তরে তাঁদের জয়যাত্রা। স্মরণীয় এঁরা, চিরনমস্য এঁরা। এযুগে তাঁদেরই যাত্রা সহচর মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী, আর তার মন্ত্র-শিষ্য শ্রীজওহরলাল নেহেরু। তাঁরা ভারত-পুরুষ, ভারত-আত্মার বাণীবিগ্রহ।

—তিন—

গুরু ও শিষ্য

"The world is weary of hate. We see the fatigue is overcoming the nations. We see that this song of hate has not benefited humanity. Let it be the privilege of India to turn a new leaf and set a lesson to the world"—M. K. Gandhi (On non-violence).

—জগদ্বাসী ঘৃণায় জর্জর। আমরা লক্ষ্য করছি, পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন। আমরা উপলব্ধি করছি, দ্বেষ-বিদ্বেষে মানবসমাজ উপকৃত হয়নি। পৃথিবীতে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত করবে, আর দৃষ্টান্ত স্থাপনের সৌভাগ্য ভারতবর্ষেরই হোক।

এ মহদ্বানী যাঁর কণ্ঠনিঃসৃত, তিনি ভারতীয় জাতির জনক বলে অভিহিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভারতের এক মহাবাণী আছে, পৃথিবীতে এক ব্রত উদ্‌যাপনের ভার ভারতের ওপর ন্যস্ত। প্রায় তিন দশক কাল ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অপ্রতিহত। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত, তাঁর ভাবনায় ভাবিত ও উদ্বুদ্ধ একদল অদ্ভুতকর্মা ও কৃতবিদ্য নরনারী ভারতীয় জাতীয়তাকে এক স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন; প্রায় ১৮০ বছরের বন্ধনদশা হতে ভারতে মুক্তিসাধন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই, তাঁর জীবদ্দশার অধিকাংশ সময়ই স্বীয় উদ্ভাবিত অহিংস রীতিনীতির প্রয়োগ-পদ্ধতি ও তাঁর তত্ত্বগত দিকের বিচার-বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায়ই অতিবাহিত হয়েছে। তবে একাধারে

তত্ত্ব-ব্যাখ্যাতা ও প্রয়োগকর্তা তিনি স্বয়ং নিজেই। পৃথিবীর সমশ্রেণীর লোক হতে এই হেতু তিনি স্বতন্ত্র। কিন্তু সার্থক সংগ্রামের মহানায়ক হয়েও স্বাধীন রাষ্ট্রের হাল ধরবার অবকাশ তাঁর হয়নি। সে ভার তিনি এমন একজন বিশ্বস্ত সহকর্মী ও শিষ্যের হাতে অর্পণ করে গিয়েছেন, যিনি আদর্শবাদী অথচ পরিণত বুদ্ধি, নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী না হয়েও যিনি গান্ধীদর্শনের সুকৌশল প্রয়োগে দক্ষ, রাষ্ট্রপরিচালনায় ধুরন্ধর না হয়েও রাষ্ট্রিক কলাকৌশল যাঁর অধিগত, আর যিনি শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে প্রবীণতম না হয়েও বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম-নৈপুণ্যে খ্যাতিমান এবং মনীষা ও পাণ্ডিত্যে বিশ্ব-বন্দিত।

গান্ধিজীর একান্ত আশা ছিল: অহিংসার মর্মবাণী বিশ্ববাসী গ্রহণ ও স্বীকার করবে; বিশ্ব-দরবারে ভারত শ্রেষ্ঠ আসন লবে। কাজেই যে কোন ব্যাপারকে উপলক্ষ্য করেই তিনি অহিংসা মন্ত্রের সার্থকতা ও এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে বিন্দুমাত্র কসুর করেন নি। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই, সংগ্রামের নীতি ও হাতিয়াররূপে অহিংসার প্রয়োগ-কৌশল গৃহীত হলেও স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে জাতি-হিসাবে ভারতবাসী জাতি-বৈরিতা ও আত্মদ্রোহিতার পাঁকে জড়িয়ে পড়ে; এহেতু প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে দেশ ভাগ হয়; আর এর যূপ-কাষ্ঠে গান্ধিজীই হন শ্রেষ্ঠবলি। যে-গান্ধিজী নিজ আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য ১২৫ বছর বেঁচে থাকার আগ্রহ একাধিকবার প্রকাশ করেছিলেন, নিজ হাতে গড়া জাতির হিংসোন্মত্ততায় ব্যথিত হয়ে তিনিই পরে নিরন্তর নিজ জীবনাবসান কামনা করেছেন। অবশ্য নিয়তি তাঁর শেষ ইচ্ছা অপূর্ণ রাখেনি। নাথুরাম গড্‌সে নামে এক সাম্প্রদায়িক হিন্দু ঘাতকের রিভলবারের গুলীতে ১৯৪৭ সালের ৩০শে জানুয়ারী দিল্লীতে 'হা রাম' বলে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এ যেন আত্মজন কলহ-ক্লিষ্ট কুরুক্ষেত্রজয়ী গীতার উদ্‌গাতার আত্মনাশ!

গান্ধিজীর সমালোচকের অভাব কোনকালে হয়নি; গান্ধীবাদ ও গান্ধীনীতি দর্শনের সমালোচনাও হয়েছে বিস্তর। অহিংস-নীতির অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য ও ত্রুটি-বিচ্যুতি, স্ব-বিরোধিতা ও দুর্বোধ্য মানসিকতা, রাম-রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন-বিলাস, যন্ত্র-বিরোধিতা, গ্রামীন সভ্যতা ও কুটীর-শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রয়াস, ন্যাসবাদ, আত্যন্তিক নীতি-নির্ভরতা প্রভৃতি অসংখ্য ছোটবড় বিষয়ে কঠোর সমালোচনা তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে; আবার ব্যক্তিগত, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সাধারণ, সূক্ষ্ম ও জটিল প্রশ্নের সদুত্তর তাঁকে এমন কিছু কম দিতে হয়নি। কেউ তাতে খুশী হয়েছেন, কেউ হননি। কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ যে, গান্ধীবাদ মূলতঃ আপোষমূলক হলেও দুর্নীতি বলে তিনি যা' বুঝতেন, প্রাণান্তেও তার সাথে রফা করেন নি। এখানে গান্ধীজী অনমনীয় ও বজ্রাদপি কঠোর। কারণ, নিজ মতবাদের অভ্রান্ততায় তাঁর আস্থা ছিল অনড় ও গভীর; সর্বোপরি মানুষের সৎপ্রবৃত্তি ও মনুষ্যত্ববোধের ওপর তাঁর শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। বলতে গেলে এর ওপরই তাঁর সমগ্র নীতিবাদ প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁর কাছে রাজনীতি মানবতা-নির্ভর; আর তাঁর ব্যক্তিগত চাল-চালন ও কথাবার্তায় মানবিকতাবোধ প্রত্যক্ষ, বিশ্ব-মানবতার আকুতি ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত। অন্তত এ একটিমাত্র ক্ষেত্রেও বিশ্বনিন্দুকদের রসনা স্তব্ধ। মহাশূন্যে উচ্চশির বনস্পতি যেমন সদাজাগ্রত প্রহরী. সমসাময়িক ভারতেও শ্রীমোহন-দাস করমচাঁদ গান্ধী অনন্যসাধারণ; ব্যক্তিত্ব প্রভাবে আর দশজন বিশিষ্ট হতেও বিশিষ্টতর। ভারতবাসীব অক্ষমতাজাত হলাহল পান করেও তিনি নীলকণ্ঠ; কটিমাত্র সম্বল কৌপীন বস্ত্র অঙ্গে ধারণ করে তিনি জাতীয় দীনতার পরিচয়বাহী। দাসত্ব ও হীনমন্যতার পাঁক হতে জাতিকে করেছেন উদ্ধার; করেছেন মেরুদণ্ডহীন জাতিকে আত্ম-সচেতন ও আত্ম-নির্ভর; উন্মেষ

করেছেন এদের মনুষ্যত্ববোধ, করেছেন নবজন্মের সূচনা। তুলে দিয়েছিলেন জাতির হাতে অতি নমনীয় অথচ কুলিশ-কঠোর হাতিয়ার; এ দিয়ে দোর্দণ্ড-প্রতাপ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি শ্রেষ্ঠ আয়ুধধারী জাতিকে উপেক্ষা করার স্পর্ধা ভারতবাসীর হয়েছিল। আর তাঁরই উদ্ভাবিত হাতিয়ার প্রয়োগে দক্ষ একদল অদ্ভুতকর্মা পুরুষপ্রধান তাঁর ছিল কর্ম-সহচর, অন্তর্মণ্ডলীভুক্ত। এঁদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শ্রীজওহরলাল নেহেরু।

গান্ধিজী ও জওহরলাল; মহাভারতের দুই কীর্ত্তিমান মহাপুরুষ, দুই বিরাট স্তম্ভ। একজন দ্রষ্টা, অন্যে স্রষ্টা; একজন ধারক, অন্যে বাহক; একজন মূল, অন্যজন কাণ্ড; একজন মেধা, অন্যজন অঙ্গ। তাঁরা যেন একই ফলকের দু'দিক, এক ছাড়া অন্য অসম্পূর্ণ; বরং বলা যায়, জওহরলাল গান্ধিজীর পরিপূরক; অর্থাৎ একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী।

গান্ধীহীন জওহরলাল অভাবনীয়। ভারতে একজন গান্ধীর আবির্ভাব না ঘটলে জওহরলালের মতো পুরুষ-প্রধানের সৃষ্টি হতো না। যেহেতু গান্ধী-আন্দোলনেব হোমাগ্নি হ'তেই তাঁর উদ্ভব; নব জাতীয়তাবাদের বন্যায় আমাদের জাতীয় জীবনে যে-পলি পড়েছিল তাতেই তার সত্তার পুষ্টি ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ। অন্যথা আর দশজন বিখ্যাত আইনজীবীর মতো ধন প্রাচুর্যে ও খ্যাতির শিখরে জীবনাতিপাত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হতো না। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রারম্ভে যেভাব-বিপ্লব ও নতুন জীবনদর্শনের উদ্ভব হয়েছিল,—ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেই তা'তে অবগাহন করে তিনি পরিশুদ্ধ ও শুচিস্নাত হয়েছিলেন। অবশ্য উভয়ের শিক্ষাদীক্ষার ধারা কতকটা একধরণের হলেও, আর প্রথম জীবনে নেশা হিসাবে উভয়ে একই বৃত্তি (ব্যারিষ্টারী) গ্রহণ করলেও গান্ধিজী ও জওহরলালের মধ্যে প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের দিক হতে বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। প্রথমে মানসপ্রকৃতির দিকই ধরা যাক্। এ-ব্যাপারে উভয়ের

মানসিক গড়ন ও শিক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা। গান্ধিজীর পারিবারিক পরিবেশ ও শিক্ষায় পুরাপুরি ভারতীয় ধারা অনুসৃত; কাজেই তাঁর ভারতীয় মানসিকতা ও ঐতিহ্যবোধ গড়ে ওঠে। অবশ্য বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়বার সময় সাময়িক পদস্খলন তাঁর হয়েছিল। কিন্তু তিনি জীবনের প্রথম অগ্নি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে জওহরলাল পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার ও ভাবধারায় আশৈশব লালিত পালিত। তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা বিলেতের পাব্লিক স্কুল ও কলেজে সম্পূর্ণ। কাজেই ভারতীয় মাতাপিতার ঘরে জন্মালেও শিক্ষার ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধারায় মানুষ। গান্ধিজীর মূলসত্তা যেখানে ভগবদ্ভক্তি, নীতি, ধর্ম, অধ্যাত্মবাদ, সদাসদ বোধে অনুরঞ্জিত, সেস্থলে (জওহরলালের চরিত্র প্রধানত বৈষয়িকতা ও ঐহিকবাদে অভিষিক্ত। ইহকাল সর্বস্বতাই তাঁর মূল উপজীব্য বিষয়; সাংসারিক অভাবঅভিযোগ সম্পর্কে তিনি উৎকর্ণ; কাজেই পরলোকের চিন্তায় তিনি আদৌ ভাবিত নন।) এদিক হ'তে গান্ধিজী ও জওহরলাল উভয়ে এক একটি বিশিষ্ট স্বভাবের অধিকারী; তা নিয়েই প্রত্যেকে আপন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, নিজস্ব ভূমির ওপর দৃঢ়-ভাবে দণ্ডায়মান। অর্থাৎ উভয়ে জাতির দিক হতে ভারতীয় হলেও. ঐতিহ্যের দিক হ'তে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রতিনিধি-স্থানীয়।

কিন্তু আশ্চর্য এই, প্রকৃতি ভিন্ন হলেও উভয়ে উভয়ের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, বাস্তবনিষ্ঠ আদর্শবাদী (Practical idealist) গান্ধিজীও তেমনি স্বপ্নাশ্রয়ী অথচ যুক্তিবাদী ভাবুক ও দার্শনিক জওহরলালকে সবেগে কাছে টেনে নিয়েছেন; তাঁকে ভালমন্দ মিশিয়ে, নিজের মনের মতো করে ভেঙ্গে-চুরে গড়ে নিয়েছেন। অথচ জহওরলাল যুক্তিতর্ক দিয়ে, বিচার বিশ্লেষণ করেও তাঁকে বুঝতে পারেননি; মস্তিষ্ক দিয়ে গান্ধীজীর কর্মকাণ্ড উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। কিন্তু কবিত্বপ্রাণ তিনি; হৃদয়াবেগ হতে উদ্ভূত সহজাত বুদ্ধিবলে গান্ধিজীকেই নেতা

ও গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এটাকে এদিক হতে নিছক ভক্তিবাদও বলা যেতে পারে। বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তবে বহুদূর— এ-নীতি কথা হয়ত তিনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়ে থাকবেন। কারণ দীনহীন ভারতের প্রতীক গান্ধিজীই যে ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি, একথা তাঁকে যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝতে হয়নি। অথচ গান্ধিজী সারাজীবনকে একটা অবিচ্ছিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের ধারাপ্রবাহ বলে মনে করতেন; কিন্তু জওহরলাল জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে উপলব্ধি করবার প্রয়াস করেছেন। আর করেছেন, বিদেশীর দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসের মর্মোপলব্ধির চেষ্টা। কারণ প্রথম জীবন বিদেশে কাটিয়ে তিনি পরে এসেছেন স্বদেশের মাটিতে; প্রথমে বিশ্বকে অনুধাবন করে (Glimpses of world History) পরে করেছেন ভারত আবিষ্কার (Discovery of India)। পক্ষান্তরে গান্ধিজী কিছুকাল অদৃষ্টবৈগুণ্যে অর্থোপার্জনের জন্যে প্রবাসী হলেও ভারতবর্ষের চিন্তাধারা ও মানসিকতা হতে কদাপি বিচ্যুত হননি; বরং আফ্রিকাতেই তাঁর সত্যাগ্রহরূপ ব্রহ্মাস্ত্রের উদ্ভব ও পরীক্ষা হয়। কিন্তু জীবন-দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গিতে এমন মৌলিক পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে আন্তরিক সাযুজ্য লক্ষণীয়। একস্থানে, সম্ভবত গভীরতর অন্তঃ-প্রকৃতির মধ্যে উভয়ের মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর নয়। অর্থাৎ গীতার—'দুঃখেষু 'অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখেষু বিগতস্পৃহ. বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে' শিক্ষা—যা' গান্ধিজী সর্বাবস্থায় অনুশীলন করে স্থিতপ্রজ্ঞ ও কর্মফলে নিস্পৃহ হবার শিক্ষালাভ করেছিলেন, তা' মূলত বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতাবোধের বিরোধী নয়। এখানেই আস্তিক্য বুদ্ধি গান্ধিজী ও নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদী জওহরলাল সমভূমিতে অবস্থিত। তবে জওহরলালের বিজ্ঞানচর্চাজাত মূল্যবোধ ও জীবনায়নের বনিয়াদ গান্ধিজীর হাতেকলমে শিক্ষায় আরও পাকাপোক্ত হয়েছে মাত্র।

আজো জওহরলালের স্বভাবের তেমন ইতরবিশেষ হয়নি; তেমনি আদর্শবাদ, তেমনি মানবতাবোধ, তেমনি বিশ্বপ্রীতি, হৃদয়াবেগের আকস্মিক আলোড়ন ও বিক্ষোভ আর সর্বোপরি বিজ্ঞান-বুদ্ধি প্রণোদিত আত্মানুশীলন প্রবৃত্তি আজো পূর্বের মত তাঁর অক্ষুণ্ণ রয়েছে। কিন্তু এক্ষণে তিনি পলিতকেশ হলেও বুদ্ধির দীপ্তিতে উজ্জ্বল কর্মক্ষমতায় যুবকদেরও বিস্ময়স্থল, বাস্তববাদী রাষ্ট্রনায়ক। ভারত রাষ্ট্র-তরণীর তিনি আজ কর্ণধার; বহু ঝঞ্ঝা ও বিক্ষোভ-সমুদ্রে তিনি পাড়ি জমিয়েছেন। কিন্তু এই স্থিতপ্রজ্ঞা তিনি গান্ধিজীর কাছ হতেই উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করছেন। এরই বলে ভারত ও বিশ্ব রঙ্গমঞ্চে তিনি অন্যতম প্রধান অভিনেতা; আধুনিক জগতের প্রতিটি পট পরিবর্তনে তাঁর প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট; এর অম্লান জ্যোতিশিখায় দিক্ বলয় উদ্ভাসিত। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতির পরিভাষায় এর নাম 'নেহরুবাদ।'

* * * *

সব কিছু বিষয়ের মতো জওহরলালের আত্মবিকাশ ও পরিণতিরও একটি ইতিহাস রয়েছে। একদিনে বা মাত্র দু'এক বছরে এটা ঘটা সম্ভব হয়নি। কাজেই যে-গুরুর পাদমূলে বসে তিনি বছরের পর বছর পাঠ নিয়েছেন, সেই মহাপুরুষের জীবনী অনুধাবনও এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নয়। তবে প্রথমেই বলে রাখা ভাল, তাঁর জীবনটাই একটি শিক্ষাক্ষেত্র, সত্য যাচাই-এর বীক্ষাণাগার—Experiments with truth; অথবা তাঁর নিজ ভাষায়—"আমার জীবনই আমার বাণী।"

* * * *

সহজবুদ্ধিতে 'সত্য' বলে প্রতিভাত হয়, এমন কতকগুলো বিষয় আছে। কিন্তু বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রয়োগের পূর্বে নিজের জীবনে তা'র সত্যাসত্য পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে গান্ধিজী তা'কেও পুরাপুরি গ্রহণ করতে পারেন নি। অন্য দশজন হতে তিনি এ ব্যাপারে

একেবারে স্বতন্ত্র; এটাই তাঁর বিশিষ্টতা। সত্যের নিকষ পাথরে প্রতিটি তথ্য ও তত্ত্বের যাচাই নিরন্তর তিনি করেছেন। এর ফলে যে অমৃত আহৃত হয়েছে, তারই নামকরণ হয়েছে 'সত্যাগ্রহ' বা সত্যে আগ্রহ। গান্ধিজীর মতে, মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিই কর্ম-প্রেরণার মূলাধার। কাজেই সমস্ত সৃজনশীল কর্মের রূপায়ণ মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব বা স্বধর্মের ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ 'ধর্মই' জীবনের প্রাণদায়ী উৎস। অহিংসা দ্বারা এই 'ধর্ম' লভ্য; আর 'সত্যই' ধর্মের চরম লক্ষ্য। কাজেই 'সত্য' লাভের প্রশস্ত উপায় 'সত্যাগ্রহ', যিনি সত্যাগ্রহীকে আশ্রয় করেন তিনিই সত্যাগ্রহী।

*   *   *   *

সত্যাগ্রহ নীতির প্রথম উদ্ভব, বিকাশ ও সার্থক প্রয়োগক্ষেত্র দক্ষিণ আফ্রিকা; এর কাল প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কাল। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ববাদের (Herren volk) বিরুদ্ধে এশিয়া-বাসীদের অধিকার রক্ষাকল্পে তিনি 'সত্যাগ্রহ' নামক আয়ুধের আবিষ্কার করেন। এ-অস্ত্রের বৈশিষ্ট্য দ্বেষহীনতা; প্রতিপক্ষের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত নয়; আত্মনিগ্রহ দ্বারা তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করা; প্রেম প্রীতি ও মৈত্রী রসে সিক্ত করে তার অন্তর জয় করা। এ-অস্ত্র সাংঘাতিক,—দেহের দিক হতে নয়, মনের দিক হতে। কারণ প্রতিপক্ষের মনের দুয়ারে এর আনাগোনা, এর আবেদন। কাজেই নিপীড়িত, নিরস্ত্র ও ভেদভিন্ন জাতির কাছে এর মূল্য অপরিমেয়।

অনেকের কাছে গান্ধিজীর পন্থাও অবাস্তব মনে হয়; অনেকে একে উপহাস করেন, কেউ বা এর উপযোগিতা স্বীকার করেন না; আবার কেউ কেউ একে ভারতের তৎকালীন অবস্থায় একেবারে কল্পনা-বিলাস বলে ধরে নেন। কিন্তু বিজ্ঞদের এ বড়ো দলে ছিলেন না একজন—তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর আর্ষ-দৃষ্টিতে গান্ধিজীর কর্ম-কৌশলের অভিনবত্বই শুধু নয়, সর্ব-ভারতীয়

ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ও প্রয়োগের প্রয়োজনও ধরা পড়ে। তাই দক্ষিণ আফ্রিকা হতে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রথম বছরে যখন গান্ধিজী সপরিবারে দেশে ফিরে এলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ গান্ধিজীকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন শান্তি-নিকেতনে। এখানে উভয়ের মধ্যে গভীর আলোচনা হলো—দেশ-বিদেশের বহু ছোট-বড় ব্যাপার নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হলেন, ভারতের ভাবী নায়ককে সাদরে বরণ করে নিলেন, তাঁকে করলেন 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত। এর বছর দু' তিনের মধ্যেই গান্ধিজী নিজ আদর্শ ও কর্ম-পদ্ধতি প্রয়োগের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি করেন। ১৯১৭ সালে বিহারের চম্পারণ হলো তাঁর অস্ত্র-পরীক্ষার প্রথম ক্ষেত্র। সেখানে নীলকর সাহেবদের অসহনীয় অনাচার ও অত্যাচার। এরই প্রতিবিধানে তিনি হলেন তৎপর। করলেন কিষাণদের সঙ্ঘবদ্ধ, করলেন জনমত গঠন, পেলেন একদল প্রতিভাবান যুবকের সাহচর্য ও সহযোগিতা। এভাবেই গণ-আন্দোলনেব সূচনা ও সাফল্য। এতে করে তিনি হলেন নতুন পর্যায়ে ব্যাপকভাবে জন-জাগরণের সহায়ক। হতোদ্যম ও নেতৃহীন দেশবাসী তাঁর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন চালনা ও সত্যাগ্রহ প্রয়োগ-কৌশলের সফলতা দেখে নেতা বলে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা তখন করেনি। এখানে শুধু আন্দোলনের জয়ই সূচিত হয়নি, গান্ধী-নেতৃত্বের অবিচ্ছিন্ন ধারার সূত্রপাতও এখানে। আর এখানেই ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখের মতো প্রতিভাশালী পার্শ্ব-সহচর ও অনুগামীদলের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে ভারতীয় জন-জাগরণ ও রাজনীতি ক্ষেত্রের নায়কতায় এঁরা অন্যতন প্রধান; বর্তমান ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির এঁরাই কর্ণধার।

*　　*　　*　　*

চম্পারণের পর গুজরাটের খেরায় কৃষক সত্যাগ্রহ ও আমেদাবাদে কাপড় কলের ধর্মঘট তাঁর নেতৃত্বে চালিত হয়। এ দু'টো ক্ষেত্রেও সত্যাগ্রহের উপযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর ফলে ভারতীয়

রাজনীতিতে তাঁর নেতৃত্বের অবিসম্বাদিতায় সংশয়বাদীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসে এবং '২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্বের পথ প্রশস্ত হয়। অর্থাৎ দেশ এক নূতন নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে। তিনি সত্যাগ্রহকে যেভাবে রণনীতি হিসাবে প্রয়োগ করেন, তাতে নতুনত্ব হলো : (১) আপোষ-আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত রাখা ও (২) সালিশী মধ্যস্থতার মারফৎ সমস্যার মীমাংসা করা। আবার যদি বিফলতা আসে, সত্যাগ্রহী নিরাশ হন না; বরং ভগবদ্বিশ্বাসী সাধকের কাছে বিফলতাই নতুন কর্ম-প্রয়াসের ভিত্তি-স্বরূপ। এতে বরং প্রতিবার বিফলতার পর নবোদ্যমে প্রারব্ধ আন্দোলনে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়, আন্দোলনে বেশ দুর্নিবার হয়ে ব্যাপক হতে ব্যাপকতব আকার ধারণ করে থাকে। কাজেই নিরুপদ্রব অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন আরম্ভ হলো, তখন হীনবল জাতির আত্মশক্তির উদ্বোধন হয়েছে। কারণ, নিরস্ত্র জাতি প্রথম শ্রেণীর সামরিক বলদৃপ্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই-এ সত্যাগ্রহরূপে নতুন হাতিয়ার-এর তখন অধিকারী—যাঁর বয়কট ও অসহযোগিতা দুটো ফলা। পৃথিবীর ইতিহাসে এ এক অভিনব পরীক্ষা। এর চমৎকারিতা এই যে, এ অস্ত্র ভারতবাসীর পরিবেশ, প্রকৃতি ও স্বভাবের অনুকূল, তার প্রতিভানুগ। কাজেই গান্ধিজী অকূলের কাণ্ডারী, নতুন পথের দিশারী। আর তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস রূপান্তরিত হলো সাম্রাজ্য-বাদ-বিরোধী বিভিন্ন সংগ্রামী শক্তির পীঠভূমিতে।

*   *   *   *

সত্যাগ্রহীর তূণীরে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-ব্যবস্থা অর্থাৎ অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগিতা এক অমোঘ পাশুপত অস্ত্র। কিন্তু এ সত্ত্বেও '২০-২২ সালের আন্দোলনের সফল হয়নি। কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা ভালো : আন্দোলনের নায়কই আন্দোলন প্রত্যাহার করেছিলেন। তাঁর ক্ষোভ, দেশবাসী তাঁর নির্দেশিত অহিংস

পথে চলেনি। দৃষ্টান্ত—উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী চৌরীচৌরায় কিষাণরা এক থানা জ্বালিয়ে দিয়ে ২১ জন পুলিশকে হত্যা; বোম্বে ও আরো দু' এক জায়গায়ও জনতার সংহারমূর্তি ধারণ।

* * * *

গান্ধিজীর অন্তর পুরুষের এহেন নির্দেশে দেশবাসী তো বিমূঢ়। এ কেমন? আন্দোলনের ব্যাপকতা ও প্রচণ্ডতায় যখন বিদেশী শাসনযন্ত্র ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, যখন আন্দোলন সফল-প্রায় ('Within an inch of success') তখনই এর রাশ টেনে ধরা কেমনতরো? আর নেতাই বা কেমন? আন্দোলনকে যিনি স্বকার্য সিদ্ধির উপায় মনে না করে একে বরং সংযত করেন, জনতাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে জনতারাজ পছন্দ করেন না, তাঁর মনের নাগাল পাওয়া ভার; তিনি দুর্জ্ঞেয় হতে পারেন, তিনি প্রকৃত নেতৃপদবাচ্য নন। কিন্তু গান্ধিজী সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। মামুলি মানদণ্ডে তাঁর বিচার চলে না; যেহেতু তাঁর পদ্ধতি, মামুলি নয়,—একটা বিশিষ্ট মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গী হতে উদ্ভূত। কাজেই তাঁর চলার ভঙ্গী আলাদা, বলার ধরণ স্বতন্ত্র। তিনি বলতে গেলে নীতি-সর্বস্ব। তাঁর মতে, যে কোন উপায়ে সিদ্ধি-লাভই বড় কথা নয়; লক্ষ্যে পৌঁছার উপায়ও নির্মল ও নিষ্পাপ হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ লক্ষ্য লাভই চরম ও শেষ কথা নয়, উপায়ের বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও নিঃসন্দেহ হতে হবে। অন্য কথায়ঃ গান্ধীবাদ প্রচলিত রাজনীতিক ছলাকলা হতে আলাদা এক নৈতিক পদ্ধতি। শাঠ্য দ্বারা কার্যোদ্ধারের চাণক্যনীতি অথবা মেকিয়াভেলী বা বিসমার্ক-প্রবর্তিত কূটনীতির মামুলি ছক এ নয়। এ পদ্ধতি মূলত ও কার্যত নীতি-ভিত্তিক, অন্তঃপ্রকৃতি অথবা জীবনদর্শনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। অর্থাৎ একজন ধর্মপ্রবণ ও ভগবদ্ভক্ত মানুষের জীবনাদর্শ সমগ্র জাতির গবেষণাগারে পরীক্ষায় নিয়োজিত।

'২০-২২ এর আন্দোলন নিষ্ফল হলেও জাতি হলো অগ্নিশুদ্ধ। গান্ধিজী আপাতত বিষণ্ণ হলেন, কিন্তু পরিণামে হলেন লাভবান। পরীক্ষোত্তীর্ণ একদল নিষ্ঠাবান দেশপ্রেমী তাঁকে ঘিরে গড়ে ও বেড়ে উঠ্‌লেন। পরবর্তীকালে এঁদের অনেকেই তাঁর পার্শ্বচর ও যাত্রাসহচর বলে পরিগণিত। দু'দলে বিভক্ত এঁরা যথা (১) নৈষ্ঠিক গান্ধিবাদী ও (২) গান্ধীনীতির প্রয়োগদক্ষ কুশলী রাজনীতিজ্ঞ। জওহরলাল শেষোক্ত দলভুক্ত। কিন্তু বৃহৎ নেতৃত্বের সারিতে তিনি আপাংক্তেয়; বয়সে বা রাজনীতিতে অগ্রজত্ব ও প্রবীণত্বের দাবিও কম। কূট-কৌশলী ও ক্ষমতাবান পুরুষসিংহ মতিলাল নেহরুর পুত্র বলে নয়, উত্তর প্রদেশের আন্দোলন পরিচালনা, বিশেষ করে কিষাণ সংগঠনে নিপুণতার জন্য তাঁর খ্যাতি। কাজেই গান্ধিজীর সপ্রেমদৃষ্টি তিনি এড়াননি। ভব্য, শিক্ষিত, সুদর্শন, মার্জিতরুচি, তীক্ষ্ণধী ও তারুণ্যের প্রতীক এযুবক অসাধারণ; তিনি দিব্যনেত্রে এঁর মধ্যে নতুন সম্ভাবনার বীজ প্রত্যক্ষ করলেন; বুঝলেন: সযত্নে লালন করলে একদা মহীরুহে পরিণত হতে পারে।

* * * *

জোয়ারের জলের তোড়ে সব কিছু আবর্জনা ধুয়ে মুছে ভেসে যায়। কিন্তু ভাটার টানে নোংরা ও তলানি পড়ে থাকে। এটাই প্রাকৃতিক রীতি। এ-রীতির ব্যতিক্রম জাতীয় আন্দোলনের কোনো স্তরবিন্যাসেই ঘটেনি। ১৯০৫ সালের বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনে যেমন, ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম বন্যাবেগেও তেমনি সমুদয় অশুভ শক্তি গঙ্গার মর্তে আগমনকালে দেবরাজ ইন্দ্রের বাহন ঐরাবতের মতো ভেসে গিয়েছিলো। কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রগতিবিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দেয়। এদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের ভেদমূলক কার্যকলাপ ও গোষ্ঠিগত চেতনার আত্মপ্রকাশই উল্লেখযোগ্য। ব্যাপার এই, মধ্যবিত্ত হিন্দুর জীবনের সর্বক্ষেত্রে অগ্রগতিতে ঈর্ষাপরায়ণ মধ্যবিত্ত

চাকরিপ্রার্থী ও অনগ্রসর মুসলমানদের মধ্যে স্বাভাবিক যে ক্ষোভ প্রচ্ছন্ন ছিল, তাই পরোক্ষ সরকারী উস্কানির ফলে মসজিদের কাছে নমাজের সময় বাদ্যবাজনার প্রশ্নে উগ্র সাম্প্রদায়িক আকার ধারণ করে ও ক্রমশ নানা আর্থিক প্রশ্নে সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এবিষয়ের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। অর্থাৎ যেপ্রশ্ন মূলত বৈষয়িক, তাই তৃতীয় পক্ষের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িকতাদুষ্ট হয়ে পড়ে। এরই পাল্টা জবাব হিসাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার জন্ম অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতা, যেন কিলের বদলে পাটকেল। এরি ফলে দেশের নানাস্থানে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়, ভ্রাতৃ-হত্যার শোণিতে ভারতবাসীর হাত কলঙ্কিত হয়। কিন্তু এর প্রশ্ন দোষ এককভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নয়; এদোষে ভারতবাসীও সমভাবে দোষী। দেহে নালিঘা না থাকলে দেহের কোন অঙ্গ যেমন পচনশীল হতে পারে না, তেমনি জাতিদেহে ভঙ্গুরতা না থাকলে সাম্প্রদায়িকতার এমন প্রসার ঘটাও সম্ভব নয়। এদিকে অবস্থা আরও শোচনীয় করার জন্যই যেন শিখদের পৃথক অস্তিত্বের দাবি, আর অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে (Depressed classes) উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূচনা।

*   *   *   *

ভ্রাতৃবিরোধের এদৃশ্য নেতৃবর্গের নিকট অসহনীয়, ধারণাতীত। আর গান্ধিজীর কাছে তো বটেই। তিনি এসময় যারবেদা জেলে আটক। তিনি বিমর্ষ ম্রিয়মান। এসত্ত্বেও পাঁচ ছ' সাল ও চব্বিশ-ছাব্বিশ সালের দাঙ্গার মধ্যে পার্থক্য শুধু মাত্রার। প্রকৃতির নয়। পাঁচ সালে হাঙ্গামার ক্ষেত্র সীমিত; পক্ষান্তরে '২৪-২৬ সালে পরিধি বিস্তৃততর, ভারতময়। অবশ্য গান্ধিজী বিদেশীর Divide it impera (ভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার কৌশল) নীতি সম্পর্কে সজাগ যথেষ্টই ছিলেন। এহেতু খিলাফৎ সমর্থন করে মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদিগকে আন্দোলনের অংশীদারও করেছিলেন।

কিন্তু পরিশেষে অবস্থাবিপাকে ও ঘটনার পরিণতিতে তাঁর ক্ষোভ ও বেদনার অন্ত ছিল না। যারবেদা জেলে অস্ত্রোপচারের পর '২৪ সালে মুক্তিলাভ করে তিনি আত্মশুদ্ধি ও ভ্রাতৃবিরোধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ একুশ দিনব্যাপী অনশন করেন। আর এর ফলে দেশে বহু 'ঐক্য' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও প্রগতিশীল ও প্রাণবন্ত শক্তিসমূহ সাময়িকভাবে প্রতিহত হয়। তবে কংগ্রেস কর্মীরা, বিশেষভাবে নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদীরা শুদ্ধি ও খাদি প্রচারে আত্মনিয়োগ করে জনসাধারণের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রেখে চলেন; এঁরা রাজনীতিক পরিভাষায় No-changer-বা পরিবর্তন-বিরোধী দল। তখন এদলের নেতা চক্রবর্তী রাজ গোপাল আচারী প্রমুখ। আর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে চালিত Pro-changer বা পরিবর্তনকামী স্বরাজ্য দল নয়া শাসন সংস্কারের সুযোগ নিয়ে আইনসভার ভেতর থেকে শাসনযন্ত্র অচলের ব্যর্থ চেষ্টায় হিমসিম খাচ্ছিলেন। কারণ, ভোটাধিক্যে বাজেট প্রভৃতি অগ্রাহ্য করা হ'লেও গভর্ণর ও বড়লাটের 'সার্টিফিকেট' বা 'ভিটো' ক্ষমতার প্রয়োগে ইচ্ছামতো যে কোনটীর পুনর্জ্জীবন লাভ ঘটেছিলো। কিন্তু ভারতীয় রাজনীতির গতি এতে পরিবর্তন হয়নি; হয়েছিল শুধু সাময়িক একটী বুদ্বুদের সৃষ্টি,—যেমন বিশাল জলরাশি লোষ্ট্রখণ্ডপাতে সাময়িক চঞ্চল হয় বা তার তরঙ্গভঙ্গ ঘটে। তবে গান্ধিজী অতন্দ্র প্রহরী; এত সব ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার পথরোধে তাঁর নিরলস প্রচেষ্টা কখনও শিথিল হয়নি; কিন্তু সফলকামও তিনি হননি। এটা অদৃষ্টের পরিহাস বই কিছু নয়। কারণ '৩১-৩৩ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ম্যাকডোনাল্ডী বাঁটোয়ারা বা রোয়েদাদ অথবা '৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে সাম্প্রদায়িক ভেদবাদ রাষ্ট্রদেহে কায়েম হয়, আর দুঃসহ ক্ষত সৃষ্টি করে। তারই চূড়ান্ত পরিণতি ভারত-বিভাগ, আর শ্রেষ্ঠ বলি গান্ধিজী স্বয়ং।

বিংশশতকের তৃতীয় দশকে দেশে একদিকে চলছিলো সাম্প্রদায়িকতা ও ভেদবাদ, অন্যদিকে নিয়মতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই, শাসন-সংস্কারে অসন্তুষ্ট জাতীয় কংগ্রেসকে খুশী করতে সরকারও সচেষ্ট। তৎকালীন ভারত-সচিব জবরদস্ত লর্ড বার্কেনহেডের মারফৎ রফা প্রস্তাব এসেছিল; কিন্তু যেকারণেই হোক, আলোচনা বেশী দূর গড়ায়নি। এদিকে কংগ্রেসের আপাত ব্যর্থতা ও নিরাশায় বাঙলায় বিপ্লব আন্দোলন মাথা চাড়া দেবার উপক্রম করে। তবে সরকার উদ্যতদণ্ড; বঙ্গীয় ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন আইনের নাগপাশে শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু সহ বহু খ্যাত-অখ্যাত ব্যক্তিকে আটক রাখবার ব্যবস্থা হয়। এদিকে ১৯২৭ সালের শেষ দিকে বৃটিশ সরকার ভাবী শাসন-সংস্কার ও সংবিধানের কাঠামো সম্পর্কে তদন্তের জন্য ভারতে একটি কমিশন পাঠাবার সংবাদ ঘোষণা করে। এ-কমিশনের সভাপতি স্যার জন সাইমন (তাঁরই নামানুযায়ী কমিশনের নামকরণ হয়) আর সদস্য সবই সাদা আদ্‌মী। কাজেই কোন রাজনৈতিক দলই একে প্রীতির চক্ষে দেখেনি। আবার এসময়ই ডিসেম্বরে (১৯২৭) মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এতে সর্বদল সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর উদ্দেশ্য দু'রকম: ভারতের ভাবী সংবিধান রচনা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবন। এসম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। তাঁর নামানুসারেই এতে রচিত রিপোর্টের নাম 'নেহরু-রিপোর্ট'। অবশ্য কলিকাতা কংগ্রেসে সর্তসাপেক্ষ এই রিপোর্ট মেনে নেয়া হয়। ওতে গৃহীত প্রস্তাবে এক দিকে অনুরোধ করা হলো: বিভিন্ন ব্রিটিশ ডোমিনিয়নে প্রচলিত শাসনতন্ত্রের অনুরূপ সংবিধান এক বছরের মধ্যে চালু করতে হবে; অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হলো: এতদনুযায়ী কাজ না হলে মাদ্রাজে গৃহীত স্বাধীনতা প্রস্তাবই কংগ্রেসের আদর্শ ও লক্ষ্য হবে।

এহেন সময় দেশের ঘোর দৈন্যদশায় কংগ্রেসের প্রগতিপন্থী ও তরুণদলের মধ্যে নানা অসন্তোষ ও চাঞ্চল্য ক্রমশ বেশিমাত্রায় আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। তাই তাঁদের মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখেই মাদ্রাজে স্বাধীনতা কংগ্রেসের লক্ষ্য বলে ঘোষিত হয়। এটা অবশ্য অবস্থার চাপে বামপন্থীদের খুশী করার চেষ্টা। কিন্তু তাঁরা খুশী হননি। কারণ কংগ্রেসের গৌহাটী অধিবেশনের (১৯২৬) সভাপতি স্বর্গত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীজওহরলাল নেহরু ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুর উদ্যোগে মাদ্রাজ সহরেই স্বাধীনতা লীগের (Independence League) জন্ম। এসময় আবার শেষোক্ত দু'জন কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। এমনকি '২৮ সালের কল্‌কাতা কংগ্রেসে তো নবীন-প্রবীণের মতান্তর প্রায় পথান্তরেই এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পথরোধ করেছিলেন গান্ধিজী স্বয়ং। সেবারও জওহর-সুভাষ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। যদিও তিনি (গান্ধিজী) জওহরলালকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নেহরু রিপোর্ট সমর্থন করাতে পারলেন, পারলেন না স্বমতে আনতে সুভাষকে। প্রকাশ্য অধিবেশনে সুভাষ সরকারী 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস্' বা উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার প্রস্তাব পেশ করে বসলেন। গান্ধিজীর সে কী দুঃখ ও বেদনা! "Young Bengal does not understand the Gujrati Bania." এখানেই বিপ্লবী দল সমর্থিত সুভাষের সঙ্গে গান্ধী-পন্থী প্রবীণদের প্রথম সংঘর্ষ। কিন্তু জওহরলাল এবার সংযম অবলম্বন করলেন; তবে নীরবতা অবলম্বনের আগে প্রতিটি শব্দ তিনি তুলনামূলক বিচার করলেন। গান্ধিজীর সঙ্গে বিচার বিতর্কে প্রবৃত্ত হলেন; তবে তো তাঁর অশান্ত ও বিক্ষুব্ধ চিত্ত শান্ত হয়। যদি সুভাষকে তখন সংযত করা যেতো, হয়তো সমগ্র আন্দোলনের গতিপথ বদল হতো। কিন্তু ইতিহাসের ধারা বিচিত্র ও জটিল।

দলমত নির্বিশেষে ভারতবাসীর প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে সর্ব-ইংরেজ সাইমন কমিশন এদেশে এলে নানাস্থানে বিক্ষোভ প্রকাশ করে তা'কে

স্বাগত করা হয়, অভিনন্দন জানান হয়। এর ফলে পুলিশও বেপরোয়া হয়ে সাধারণের ওপর চড়াও হতে থাকে। লাহোরে তো লালা লাজপৎ রায়ের মতো সম্মানার্হ নেতা পুলিশের বেটন প্রহারে সংজ্ঞাহীন হন, আর ক'মাস পরেই তাঁর হয় জীবনাবসান। অনেকের মতে পুলিশ প্রহারই এজন্য দায়ী। কাজেই দেশের রাজনৈতিক মেজাজ তখন বিষম চড়া। দেশবাসীর বুঝতে বাকি রইলো না: অম্ল মধুরে কাজ হবার নয়, তিক্তকষায় প্রয়োজন। কাজেই এগ্নিধারা পরিবেশে গান্ধিজীর ইচ্ছায়, যুবক জওহরলাল লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি পদে বৃত হলেন। তিনি হলেন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী ; কিন্তু যে-মুকুট তাঁকে পরিয়ে দেওয়া হলো, তা' কাঁটার। তবে গান্ধিজী বুঝেছিলেন: 'জওহর একটি রত্ন।' তাই নিজে উদ্যোগী হয়ে তরুণের হাতে জাতির হাল ধরার ভার তুলে দিতে তাঁর কুণ্ঠা হয়নি, শঙ্কা হয়নি। তখন জওহরলালের বয়স মাত্র ৩৯ বছর ; তাঁর আগে ৺গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে শুধু একবার তাঁর চেয়েও কম বয়সে (৩৮) কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন।

এভাবেই গান্ধিজী কর্তৃক জওহরলালের যৌবরাজ্যে অভিষেক। আর '৪৬ সালে ক্ষমতা হস্তান্তরকালে বৃটিশ রাজ প্রতিনিধি লর্ড লুই মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে যে আলোচনা চলছিল, তখন জওহরলালকেই কংগ্রেসের মুখপাত্ররূপে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের পর তাঁকেই নিজ উত্তরাধিকারী ঘোষণায় গান্ধিজীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কিন্তু এতে অনেকে বিস্মিত, এমনকি অনেকে স্তম্ভিতও হয়েছিলেন। আর হবারই কথা। কেননা প্রবীণদের মধ্যে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ ও ধুরন্ধর ব্যক্তির অভাব ছিল না। অন্য পরে কা কথা ; চক্রবর্তী রাজগোপাল আচারীর মতো কুশাগ্রবুদ্ধি ও কুশলী রাজনীতিক, বল্লভভাই পটেলের মতো নিপুণ, কূটকৌশলী ও দৃঢ়চেতা যোদ্ধা, রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো স্থিতধী ও প্রাজ্ঞ নায়ক থাকতেও জওহরলালের মতো তরুণের ওপর এ দুরূহ কর্তব্য ও দায়িত্ব অর্পিত হলো কেন? এর সদুত্তর গান্ধিজীর

নির্বাচনেই নিহিত। আর পরবর্তী ঘটনাবলীতেই এর যথার্থ্য যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে।

'২৯ সালের লাহোর কংগ্রেস জাতিকে নতুন পথনির্দেশ দিলো ; ইরাবতী তীরে পূর্ণ স্বাধীনতাই হলো কংগ্রেসের নীতি ও লক্ষ্য বলে ঘোষণা ; আর ঘোষিত আদর্শ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে শান্তির নয়, সংগ্রামের পথেই জাতির আবার যাত্রা শুরু। এ থেকেই অব্যাগত গতিতে যে-মুক্তিসংগ্রাম ধাপের পরে ধাপ ক্রমশ বেগ ও বিস্তারে জাতির প্রতিটি স্তরে শিহরণ জাগিয়ে তোলে, তা-ই '৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পর্যবসিত। অর্থাৎ '২০, '৩০, '৪০ ও '৪২ সালের মধ্যে প্রতি দশবছর অন্তর আন্দোলন পর্যায়-ভাগে বা ভারতে ২২ বৎসরকাল মুক্তি সাধনায় গান্ধিজী যেভাবে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁতে তাঁর ভূয়োদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও অহিংস কূটকৌশলের সূক্ষ্ম প্রয়োগ-মহিমা, আর জওহরলালের সৈন্যাপত্য প্রত্যক্ষ। অবশ্য এতে অন্যান্যের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় বা অস্বীকার্য নয়। বরং বলা যায়, প্রত্যেক ধাপে গান্ধিজী জওহরলালকে নতুন করে গড়ে নিয়েছেন ; জওহরলালের মতামত নিজ নীতি ও আদর্শের অনুকূলে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। এভাবেই চলেছে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে ভাঙ্গাগড়া, বুঝাপড়া, সহযোগিতা, সামঞ্জস্য বিধান। কিন্তু এসত্ত্বেও গান্ধিবাদী সমাজদর্শন যে অর্থে বোধগম্য, সে অর্থে জওহরলাল সমাজবাদী নন। প্রাচীনতা ও বৈজ্ঞানিকতার মধ্যে যে-প্রভেদ, উভয়ের মধ্যে সে-সীমারেখা চিরদিনই সুস্পষ্ট। জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণকল্পে গান্ধিজী যে-গ্রামীন সমাজ ব্যবস্থার সমর্থক, যে-কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসী, যে-ভূমি-ব্যবস্থা ও শিল্পনীতি পুনর্বিন্যাসের পক্ষপাতী, জওহরলাল মূলত তার বিরোধী। তাঁর মতে বিজ্ঞান আর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসজাত শিল্পায়নই ভারতবাসীর মধ্য-যুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও কৃষিপ্রধান সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে ; আর তাতেই ভারতের সর্বাঙ্গীন মুক্তি সম্ভব। কারণ এ-যুগ বিজ্ঞান-

ভিত্তিক ; একে উপেক্ষার অর্থ আত্মনাশ—তাতে না হবে আত্মোন্নতি, না হবে আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতা হতে আত্মরক্ষা। কাজেই এহেন মৌলিক বিষয়ে গুরু-শিষ্যের মধ্যে একমত হওয়া সম্ভব হয়নি। এখানে জওহরলাল স্বতন্ত্র পুরুষ; তাঁর ব্যক্তিত্ব গান্ধি-সত্তা হতে পৃথক। তবে 'বিপ্লব' * যে অর্থদ্যোতক, সে প্রচলিত অর্থে তিনিও বিপ্লবপন্থী নন, বিবর্তনবাদী ; অথবা আরও স্পষ্ট ভাষায়, সামঞ্জস্য-বাদী। বিভিন্ন মত ও পথকে নিজস্ব চিন্তা ও কর্মধারায় অনুরঞ্জিত অথবা আত্মসাৎ করার ক্ষমতা তাঁর অতুলনীয়। এটাই হয়তো তাঁর বিশিষ্টতা বা প্রতিভা।

কিন্তু জাতি ও জগতের কল্যাণে গুরু গান্ধী এক নতুন পথ রচনা করে গিয়েছেন,—এ পথ বিশ্বমৈত্রীর, এপথ মানবিকতাবাদের। আধুনিক জগতের রাষ্ট্র ধুরন্ধরগণ এর বিরোধী। তাঁদের পথ জুগুপ্সা ও জাতিবৈরিতার ; আপাত মধুরতার আবরণে তাঁদের প্রতিষ্ঠার বনিয়াদ গড়ে ওঠে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির অপমান ও লাঞ্ছনার ওপর। গান্ধিজী এই মামুলিপনার বহু উর্ধ্বে ; তিনি যেন উর্ধ্বশির বনস্পতি—শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক ও নীড় রচনাকারী পক্ষীকুলের আশ্রয়-

---

* পাদটীকা :—"বিপ্লব বলিতে আঘাত বা আক্রমণ বুঝায় না, বুঝায় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন। বিপ্লব তিন প্রকার,—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক। ইংরেজের ভারত-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক বিপ্লবের অবসান ঘটিয়াছে। এখন অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের সময় উপস্থিত। আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া সামাজিক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত করিয়াছি। ভারত নিজস্ব পন্থায় এই পরিবর্তন সাধন করিবে, কাহারো অনুকরণ করিবে না। আমরা অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের অনুকরণ করিব না।" —(২১শে আগষ্ট '৫৫, লক্ষ্ণৌ-এ প্রদত্ত শ্রীনেহরুর বক্তৃতা)।

দাতা। শিষ্যও এ ব্যাপারে গুরুর পথাশ্রয়ী; অর্থাৎ উভয়ে একই তীর্থের পথিক। এই তীর্থক্ষেত্র—প্রেম প্রীতি মৈত্রী শান্তি মানবতা সর্বজাগতিক কল্যাণ।

পঞ্চম দশকের শেষার্ধে দেশে আশা নিরাশার দোলা। অধীনতা এ জীবনে ঘুচবে কিনা, অনেকের মনে এ-সংশয়। নেতারা স্বপ্ন দেখছেন; আদর্শ ও পরিকল্পনা বিন্যাসের বিরাম নেই। কিন্তু গান্ধিজী যেন দেবাত্মা হিমালয়, অটল। তিনি নিঃসংশয়, সত্যদ্রষ্টা। নিজ জীবনে সত্যকে আচরণ করে জগতবাসীকে শেখাবার ব্রত তাঁর; কলসী কাণা মারলেও প্রেম বিলাতেই তিনি ব্যগ্র। দৃষ্টান্ত স্বরূপ '৪০ সালের ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের কথাই ধরা যাক্। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছায়া ক্রমশ দীর্ঘতর হচ্ছে। নাৎসী শক্তি সর্বশক্তি নিয়ে ইংলণ্ডের ওপর ঝাপিয়ে পড়েছে; 'লুফৎভাকে' ঝাঁকে ঝাঁকে বৃটিশ দ্বীপের ওপর কালানল বর্ষণ করছে। নিষ্ঠুর অরাতি তার জীবনীশক্তি নিঃশেষ করে ফেল্‌ছে; সে বিপন্ন। এই তো ইংলণ্ডের বিপদে ভারতের সুযোগ। কারণ এরি কিছুকাল আগে বৃটেনের ক্লৈব্যে জার্মানী (তখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হয়নি) যখন মধ্য য়ুরোপে দেশের পর দেশ গ্রাস করে চল্‌ছে, আর উদ্বাস্তুর মর্মভেদী ক্রন্দনে আকাশ বাতাস বিষাক্ত, তখন গান্ধিজী বেদনার্ত হৃদয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে, ফ্যাসী শক্তিবর্গের আচরণ যদি এমনই জঘন্য হয়, তা' হলে "জার্মানীর সঙ্গে আদপে কোন মৈত্রীই স্থাপিত হতে পারে না। যেজাতি উভয়েরই ঘোষিত বৈরী, তাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপন কী করে সম্ভব? অথবা ইংলণ্ড কি সশস্ত্র একনায়কতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে?" এর সোজা অর্থ: ফ্যাসীবাদ তো নিঃসন্দেহে নিন্দার্হ-ই, গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী বৃটেনের আচরণও আদৌ প্রশংসনীয় নয়; বরং তুলনায় অধিকতর নিন্দনীয়।

কূটনীতিক যিনি, প্রতিপক্ষের অসুবিধার সুযোগ অবশ্যই তিনি নেবেন। অথচ গান্ধিজী কী করলেন? ভারতের প্রতি বৃটেনের

গর্হিত আচরণের প্রতিবাদে শুধু করলেন ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ প্রবর্তন। এ আন্দোলনের প্রথম সত্যাগ্রহী হলেন অখ্যাত ও বর্তমানে ভূদান আন্দোলন-খ্যাত নিষ্কলঙ্ক চরিত্র আচার্য বিনোবা ভাবে। এর উদ্দেশ্য : ইংরেজ সরকারের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো ; ভারতের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো ; ভারতীয় সমস্যার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ। আবার প্রাণান্তকর আহবে মত্ত ইংরেজও যেন বিব্রত না হয়, তাঁর প্রতিও তাঁর খরদৃষ্টি। কাজেই গান্ধিজীর কর্মধারা ও রীতিনীতির সঙ্গে অপরিচিত ব্যক্তিদের কাছে এ কৌশল কিছুটা রহস্যময়, খানিকটা দুর্বোধ্য ও অংশত বিস্ময়কর মনে হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু গান্ধিজী ব্যক্তিটিই চিরদিন অসাধারণ। একথাও ভুলে যাওয়া অনুচিত।

তাঁর সারা জীবনই এম্‌নি তরো শতশত ছোট বড় দৃষ্টান্তে ভরা। একে কেউ মনে করেন স্ব-বিরোধিতা, কেউ বা মনে করেন অহিংস সত্যাগ্রহের সীমাবদ্ধতা, আবার কেউ বা এতে তাঁর মহত্ত্বই অনুভব করে থাকেন। তবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে তাঁর কার্যকলাপের বিচার বিশ্লেষণ করা হলেও তাঁর কালোত্তীর্ণ মানবিকতাবোধ ও বিশ্বতোমুখীনতা সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। মুখ্যত স্বদেশের কল্যাণ কামনায় তাঁর সমগ্র সত্তা ও চৈতন্য আচ্ছন্ন ; কিন্তু বিশ্বহিতই তাঁর আসল লক্ষ্য। কারণ, অহিংস সত্যাগ্রহ মারফৎ দেশের মুক্তি যজ্ঞ উদ্‌যাপন করা তো জগদ্ধিতায়েরই নামান্তর। যিনি অহিংসাকেই পরম ধর্ম বলে মনে করতেন, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে গণ্য করতেন, আর তাঁর জন্যে দেহ ধারণ করেছেন ও প্রাণ দিয়েছেন, পৃথিবীর যে কোন স্থানের আর্ত মানুষের ক্রন্দনরোলে বিচলিত হওয়া তাঁর পক্ষেই তো সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাপার! এক্ষেত্রে তিনি অতুলনীয় ও দেশ কালের সীমাতীত। তাঁর কাছে দেশের মুক্তি-কামনা তা-ই বিশ্ব কল্যাণের সমতুল। তিনি বলেন,

> "I would like to see India free and strong so that she may offer herself as a willing and

pure sacrifice for the betterment of the world"—অর্থাৎ বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞে ভারত যাতে স্বেচ্ছায় নিজেকে আহুতি দিতে পারে, এজন্যেই স্বাধীন ও শক্তিশালী ভারত আমার কাম্য।

অন্যত্র তিনি বলেন, "My notion of Purna Swaraj is not isolated independence, but healthy and dignified independence. My nationalism though fierce it is, is not exclusive, nor designed to harm any nation or individual. Legal maxims are not so legal as they are moral. I belive in the eternal truth of 'sic utere tuo ut aliemen non loedas' (use thy own property, so as not to injure thy neighbours) অর্থাৎ—আমার ধারণানুযায়ী পূর্ণ স্বরাজ অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীনতা নয়, তবে তেজোদ্দীপ্ত ও মর্যাদাব্যঞ্জক স্বাধীনতা। আমার জাতীয়তাবোধ অতিশয় তীব্র হলেও আত্মনিষ্ঠ নয়, অথবা অন্য কোন ব্যক্তি বা জাতির পক্ষেও ক্ষতিকর নয়। আইনের ভাষায় যত না আইনের জোর আছে, তার চেয়ে বেশি আছে নীতির। প্রতিবেশীর ক্ষতি না করে নিজের সম্পত্তি ভোগ কর,—আমি এ চিরন্তন সত্যে বিশ্বাসী।

এ-প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি ছত্রে প্রীতির লাবণ্য প্রবাহ ; প্রেম ও সৌহার্দ্যের বিগলিত করুণা ধারা! মানুষের সঙ্গে মানুষের, সমাজের সঙ্গে দেশের,—আর দেশের সঙ্গে পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের প্রেমের সেতু বন্ধন এম্নি করেই তিনি রচনা করে গিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তা পবিত্র ও নিষ্কলুষ হয়ে প্রথমে নিজ পরিবার, পরিবার নিজ গ্রাম, গ্রাম নিজের জেলা, জেলা নিজ প্রদেশ, প্রদেশ নিজ জাতি,

আর জাতি সমগ্র বিশ্বহিতে উৎসৃষ্ট। অর্থাৎ মানুষ পরস্পরবিচ্ছিন্ন জীব নয়, বরং পরস্পর পরিপূরক। এই হলো গান্ধিজীর পরিপূর্ণতার পূর্ণাঙ্গ চিত্র। তাঁর জীবন দর্শন—আত্মবলিদান ও বিশ্বমুখীনতা; আপনারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা। বিশ্ববাসীকে তাই ডেকে বলেছেন, শোন অমৃতের সন্তানগণ, "Our nationalism can be

> no peril to other nations, in as much as we will allow none to exploit. Through Swaraj, we will serve the whole world" (Political self-govt. 16-4-31) অর্থাৎ আমাদের জাতীয়তা অন্য জাতির পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে না; যেহেতু আমরা শোষণ করবো না, আর অন্যকেও আমাদের শোষণ করতে দোব না। স্বরাজ মারফৎ আমরা বিশ্ববাসীর সেবা করবো।

(গুরুর এ-জীবনাদর্শ ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার ধারাবাহী ও সার্থক উত্তরাধিকারী শিষ্য জওহরলাল। আর গান্ধিজীর স্বপ্ন ও আদর্শ রূপায়নের দক্ষ শিল্পী যদি কেউ থেকে থাকেন তবে তিনিই একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি নিঃসন্দেহ। কারণ, অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয়ের যতই না মতভেদ থেকে থাকুক, গান্ধিজীর দেহাবসানের সঙ্গে সে-সবার সমাধি রচিত হয়েছে। এক্ষণে তাঁর পতাকা বইবার শক্তি তাঁর (জওহরলাল) চেয়ে আর কারই বা বেশি ?)

—চার—

সোবিয়েৎ ভূমিতে ঃ প্রথমবার

"*আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এজন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত। এখানে এরা যা কাণ্ড করেছে তার ভালোমন্দ বিচার করবার পূর্বে সর্বপ্রথমেই মনে হয়, কী অসম্ভব সাহস। সনাতন বলে পদার্থটা মানুষের অস্থিমজ্জায় মনেপ্রাণে হাজারখানা হয়ে আঁকড়ে আছে। তার কতদিকে কত মহল, কত দরজায় কত পাহারা, কত যুগ থেকে ট্যাক্‌গো আদায় করে তহবিল হয়ে উঠেছে পর্বতপ্রমাণ। এরা তাকে একেবারে জটে ধরে টান মেরেছে—ভয় ভাবনা সংশয় কিছুই মনে নেই। সনাতনের গদি দিয়েছে ঝাঁটিয়ে, নূতনের জন্যে একেবারে নূতন আসন বানিয়ে দিলে। পশ্চিম মহাদেশ বিজ্ঞানের যাদুবলে দুঃসাধ্য সাধন করে, দেখে মনে মনে তারিফ করি। কিন্তু এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। শুধু যদি একটা ভীষণ ভাঙচুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না; কেননা নাস্তানাবুদ করবার শক্তি এদের যথেষ্ট আছে। কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহুদূরব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নূতন জগৎ গড়ে তুল্‌তে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। দেরি সইছে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের প্রতিকূলতা, সবাই এদের বিরোধী—যতশীঘ্র পারে এদের খাড়া হয়ে দাঁড়াতে হবে—হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফাঁকি নয়। হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে।

অন্য দেশের তুলনায় এদের অর্থের জোর অতি সামান্য, প্রতিজ্ঞার জোর দুর্ধর্ষ।" (রাশিয়ার চিঠি, মস্কৌ, ২৪শে সেপ্টেম্বর, '৩০।)

১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর; রবীন্দ্রনাথ তখন মস্কৌ-এ। এরো আগে ১৯২৬ সালে একবার, আর '২৯ সালে দ্বিতীয়বার সোবিয়েৎ সরকারের তরফ হতে তাঁর কাছে রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ এসেছিলো। কিন্তু তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তা'ই প্রথম দু'বারের ডাকে তিনি সাড়া দিতে পারেন নি। '৩০ সালেও যে তাঁর শরীর পটু ছিল এমন নয়, তাঁর বয়সও সত্তরের কাছাকাছি। তবু য়ুরোপ ভ্রমণের সুযোগে রাশিয়ায় দিন কয়েক তিনি কাটিয়ে এলেন (১১ই হতে ২৫শে সেপ্টেম্বর)। মনে মনে তাঁর আশংকা ছিল, যদি বয়সে আর বেড় না পাওয়া যায়; এ জন্মের মতো এ যুগের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থেকে যাবে। তাই সাধারণ মানুষের যেবয়সে ইন্দ্রিয় শিথিল হয়, হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায়, সে-বয়সেই তিনি পৃথিবীর নানা হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, নানাঘাটে পাড়ি জমাচ্ছেন; বিশ্ববাসীকে ভারতের বাণী শোনাচ্ছেন। তাঁর বাউলের বেশ; হাতে একতারা; মনটা বিবাগী; অমূল্য রতন মিল্‌বার আশায় ছাই ঘেটে বেড়াচ্ছেন—যদি দেশকে নতুন কিছু উপহার দেয়া যায়। তা-ই চির নতুনের ডাকে প্রতিবার তিনি এমনভাবে সাড়া দিয়েছেন। '৩০ সালেও পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের আমন্ত্রণে তিনি হয়েছিলেন অন্যতম প্রধান অতিথি।

এ-সময়কার পরিমণ্ডল ঘোরালো ও জটিল; পৃথিবীময় সঙ্কট ঘনীভূত। ভারতে গান্ধিজী প্রবর্তিত আইন অমান্য আন্দোলনের চরম অবস্থা, গতিবেগ প্রচণ্ড, গভীরতা অতল। সুদূরতম পল্লী পর্যন্ত এর ব্যাপ্তি। নতুন জন্মের প্রসব ব্যথায় জাতি বেপথুমান; পক্ষান্তরে জনসাধারণ শাসনশক্তির পাশব আঘাতে বিপর্যস্ত,—কিন্তু আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ, মুক্তি-কামনার দুর্জয় সংকল্পে দৃঢ়পণ।

রাশিয়াতে প্রকারান্তরে আত্মশক্তি উদ্বোধনের ঐ একই সাধনা তখন চলছিল। শুধু বাহ্যিক আকারে যা কিছু ভেদ; কিন্তু প্রকৃতির দিক থেকে উভয়ই এক। যেহেতু 'দুর্বলের শক্তিকে উদ্বোধিত করবার জন্যেই তারা পণ করেছিল। * * ধনশক্তিতে দুর্জয় পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রাঙ্গণদ্বারে ঐ রাশিয়া আজ নির্ধনের শক্তি সাধনার আসন পেতেছিল, সমস্ত পশ্চিম মহাদেশের ভ্রূকুটি-কুটিল কটাক্ষকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।' কাজেই ভারত ও রাশিয়ার দুঃখ ও বেদনার মধ্যে—প্রকারগত যে তারতম্য, তা' আদপে মাত্রাভেদ মাত্র। এহেতু ভারতবাসী রাশিয়ার অসমসাহসিক একক প্রচেষ্টার সবচেয়ে বড়ো সমঝদার; তার পক্ষ হতে তার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছার বার্তাবহ হয়ে গিয়েছিলেন ভারতের বাণী-মূর্তি কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যোগ্যের ওপরই যোগ্য কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। পরাধীন ভারতের সৌভ্রাতৃত্বের বাণীবাহী দূত হবার উপযুক্ত ব্যক্তি তাঁর চেয়ে তখন বেশি কেউ ছিল না; এখনো তাঁর সমগোত্রীয় মানুষ বিরল।

কিন্তু অদৃষ্টবিপাকে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে প্রথমবার যা' সম্ভব হয়নি, স্বল্পখ্যাত (অখ্যাত?) এক উদীয়মান উত্তর প্রদেশবাসী ভারতীয় যুবকের পক্ষে ২৮ বছর আগে তা-ই সাধ্যায়ত্ত হয়েছিল। তাঁর নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু; স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী ও কেন্দ্রীয় আইন সভার স্বরাজ্য দলপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্ররূপেই তখন তাঁর পরিচিতি সমধিক। তবে কিষাণ আন্দোলন সংগঠন ব্যাপারে আর বামপন্থী প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাঁর খ্যাতি ও খাতির অন্তরঙ্গ মহলে এমন কিছু কম নয়। কাজেই প্রগতিমূলক কর্ম-প্রচেষ্টার প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আকর্ষণ স্বাভাবিক; এহেন অবস্থায় রাশিয়ার দুঃসাহসিক পরীক্ষাও তাঁর মনকে গভীর ভাবে নাড়া দিচ্ছিল; দুনিয়ার অন্যান্য প্রগতিবাদীর মতো তাঁরো সপ্রশংস দৃষ্টি এরি ওপর ছিল নিবদ্ধ। তখন রাশিয়ার অবস্থা দুঃসহ; ঘরে

বাইরে প্রতি পদে প্রতিকূলতা। এরি বিরুদ্ধে টিঁকে থাকার, নিজ বৈষয়িক উন্নতির পথ প্রশস্ত করার যে-সংগ্রাম যুগপৎ তাকে করতে হচ্ছিল, '২৬-২৭ সালেই শুধু নয় আজকের অবস্থায়ও যেকোন দেশের পক্ষে তা' অসম্ভব। কিন্তু সে-অসম্ভবই সম্ভব হচ্ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম জনরাষ্ট্রে ; আর সমাজবাদের জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্ররূপে সোবিয়েৎ ভূমিই তখন চিহ্নিত। কাজেই তার ভবিষ্যৎ ভাগ্য যে প্রত্যেক চিন্তাশীল ও দূরদর্শী ব্যক্তির পক্ষে মাথাব্যথার কারণ হবে, সে-তো বলাই বাহুল্য। এম্নি সময়ে এলো তরুণ নেহরুর কাছে রাশিয়া-দর্শনের আহ্বান। এ-ডাক উপেক্ষা করে, সাধ্য কার! এ-ছাড়া, রাশিয়া দেখার আগ্রহ আর একটি কারণেও তাঁর বেড়েছিলো। স্তালিনের নেতৃত্বে রাশিয়া তখন অসংখ্য জটিল সমস্যা মীমাংসায় ব্যস্ত ; হাজারেবিজারে তার পরিকল্পনা ও উদ্যোগ, আর তাদের রূপায়নের প্রয়াস। এসব ব্যাপারের সঙ্গে ভারতের অবস্থার সাদৃশ্য বিলক্ষণ লক্ষণীয়। কি ভূমি, কি কৃষি, কি শিল্পায়ন, কি শিক্ষা, কি বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাধি,—মূলত উভয় দেশ একই সমস্যায় পীড়িত। অবশ্য ভারতের সমস্যা ছিল আরো একটি বেশি ; তা' হলো ঔপনিবেশিক নাগপাশ ও পরাধীনতার জগদ্দল পাথর। কাজেই রাশিয়ার আকর্ষণ নেহরুর কাছে দুর্নিবার। সরেজমিনে তার ঐতিহাসিক পরীক্ষা নিরীক্ষা দেখার, প্রাণ প্রাচুর্য প্রত্যক্ষ করার সুযোগ যেমন হবে, তেম্নি হবে শিক্ষা লাভ। এ-শিক্ষা ভারতের বন্ধন মুক্তির জন্যই একান্ত প্রয়োজন ছিল। তখন ভারতব্যাপী নৈরাশ্য, সর্বব্যাপী তমসা। একদিকে দেশের বৈষয়িক অবস্থার ক্রমাবনতি ও রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাধান্য, অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দার পূর্বাভাস। আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের মাধ্যম বলে অভিনন্দিত রাষ্ট্র সঙ্ঘেরও (League of Nations) দুরবস্থার একশেষ। মার্কিন রাষ্ট্রপতি প্রেসিডেণ্ট উইলসনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরে মার্কিন জাতি কর্তৃক

বর্জিত এই সংস্থাটি য়ুরোপের বৃহৎ গুটি কয়েক রাষ্ট্রের বৈঠকী আলোচনার ক্ষেত্র ও কলকাঠি নাড়ার যন্ত্রে পর্যবসিত। কিন্তু সোবিয়েৎ রাশিয়া এক ঘরে, আন্তর্জাতিক ভুরিভোজনে অপাংক্তেয়। এর কারণ : রুশ নেতৃবৃন্দ মার্ক্স-এঞ্জেল্‌সএর রাষ্ট্রনীতিক দর্শন ও সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী। তা' ছাড়া রাশিয়া কর্তৃক আন্তর্জাতিক বাধ্য-বাধকতা ও ঋণ অস্বীকার। কাজেই বৃটেন ও আমেরিকা প্রভৃতি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের কায়েমী স্বার্থের ধারক ও বাহকদের এমন কোপ; পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সূতিকাগারেই বিনাশের উদ্দেশ্যে গৃহযুদ্ধের সময় চতুর্দিক হতে তাকে বেপরোয়া আক্রমণ। এ যুদ্ধই ইতিহাস-খ্যাত war of intervention অথবা রাশিয়ার ঘরোয়া ব্যাপারে বিদেশী সৈন্যের হস্তক্ষেপ। কিন্তু সফল হয়নি এ-মূঢ়তা। তবে হাতে মারা যাকে সম্ভব হলো না, তা'কে ভাতে মারার ফন্দি-ফিকিরের অভাব ঘটেনি; সাম্রাজ্যবাদী ও কায়েমী স্বার্থের চক্রান্তে রাশিয়া পৃথিবীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে ঋণ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও সম্পদ আহরণে মনোযোগী হতে বাধ্য হয়; যেহেতু পুনর্গঠনের কাজে আত্মপ্রত্যয় ও অর্থ সম্বল উভয়ই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু বিদেশী মহাজনদের গদিতে তা'র 'ক্রেডিট' নেই; বিপ্লবোত্তর রাশিয়া জার আমলের সকল ঋণ যে একদা অস্বীকার করেছিল। আর ঘরের পুঁজিও তার নগণ্য। কাজেই মত থাকলেও পথের অভাববোধ হয় তার তীব্র! আবার এতে করেই জাগে প্রেরণা, কর্মোৎসাহ, প্রাণ চাঞ্চল্য, বিশ্বাস—পায় সফলতার বীজ মন্ত্র।

১৯১৭ সালের মার্চে প্রথমবার জারতন্ত্র, আর নবেম্বরের বিপ্লবে দ্বিতীয়বার ভৌমিকতন্ত্রের উচ্ছেদের পর লেনিন-চালিত বলশেভিক দল রাশিয়ার ক্ষমতা করায়ত্ত করে। এ সময়টা প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়। ঘরেবাইরে রাশিয়ার সমান বিপদ। বৃটেন ও আমেরিকা-চালিত মিত্র পক্ষের ইচ্ছা,—পূর্ব রণাঙ্গনে রাশিয়া যুদ্ধ

চালিয়ে যাক ; রণকৌশলের দিক হ'তে মিত্রপক্ষের পক্ষে এব্যবস্থা লাভজনক। কিন্তু রাশিয়ায় নিদারুণ খাদ্য ও পণ্যাভাব ; মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতি হেতু জনসাধারণ রণক্লান্ত ও শান্তিকামী। তা' ছাড়া, প্রতি-বিপ্লবীরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, সমগ্র বিপ্লবের বনিয়াদ ধ্বংসোন্মুখ। কাজেই অবস্থাগতিকে আত্মরক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়েই ১৯১৮ সালের মার্চে ব্রেস্ট-লিটভস্কে অত্যন্ত অপমানকর সর্তে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি চুক্তি নিষ্পন্ন করতে হয় তাকে। ফলে রাশিয়ার পশ্চিমাঞ্চলের এক বিরাট ভূখণ্ড জার্মানীর উদরস্থ হয়। হতমান হওয়া সত্বেও কিন্তু রাশিয়া যুধ্যমান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সাধারণভাবে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু তা'র আবেদনে কেউ সাড়া দেয়নি তখন। অবশ্য এর ন'মাস পরে মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে, পশ্চিম রণাঙ্গনে হয় জার্মানীর চরম পরাজয়। এতো গেলো মোটামুটি বাইরের অবস্থা ; কিন্তু ঘরোয়া সমস্যা মেটাতে রাশিয়াকে যেরূপ গলদঘর্ম হতে হয়, তা'র তুলনা মেলা ভার। একদিকে যুদ্ধ-ফেরৎ এক শ্রেণীব সেনার দলবদ্ধ উৎপাত, স্থায়ী পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের অসহযোগিতা ও অন্যদিকে ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীরা অর্থদাদনে নারাজ। আবার জার-আমলের সেনাধ্যক্ষের আদেশ পালনে অসম্মতিতে এ ব্যাপার চরমে পৌঁছে। কাজেই কঠোর মনোভাব ও নির্মম ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া নতুন সরকারের গত্যন্তর ছিল না। এহেন অবস্থায় কাউকে কাউকে উচ্ছেদ ও পদচ্যুত করা, আবার 'শাইলক' শ্রেণীর শোষকদের ধন-সম্পদ হস্তগত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অবশ্য নবাদর্শে অনুপ্রাণিত কৃষকরা ভূম্যধিকারীদিগকে, আর শ্রমিকরাও কোন কোন কারখানার বিপ্লববিরোধী মালিকদিগকে বিতাড়িত না করেছে এমন নয়। আবার গৃহ-যুদ্ধের সময় যেসব কলকারখানার সত্বাধিকারী নতুন সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করার উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতির ক্ষতি করতে উদ্যত হয়েছিল অথবা নাশকতামূলক কাজের প্রশ্রয় দিয়েছিল, অধিকতর ক্ষতির হাত হতে রক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের কারখানাগুলিকে

সরকারী দখলে আনা হচ্ছিল। এভাবেই রাশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত সমাজবাদের দ্রুত প্রসার ও প্রতিষ্ঠা ঘটার পথ সুগম হয়।

সোবিয়েৎ শাসনের প্রথম ন'মাসে বলশেভিকদিগকে হরেক-রকমের সমালোচনা, বিরোধিতা এবং এমনকি গালি গালাজ হজম করতে হয়। কিন্তু রাতারাতি সমাজতন্ত্রবাদ অথবা সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা বা ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ লোপ করা সম্ভব নয়। কাজেই এ-অল্প সময়ে যেমন গরীবের অবস্থার ইতরবিশেষ হয়নি, তেমনি হয়নি বিত্তবানদের বিলাসিতার মাত্রা হ্রাস। বরং বলশেভিক শাসনের আপাত-অসাফল্যে বা আসন্ন পতন সম্ভাবনায় ধনীদের প্রচ্ছন্ন উল্লাস গোপন থাকেনি। তখন ঘরে-বাইরে গোপন চক্রান্ত চলছিল; শত্রুমিত্র চেনাই দুষ্কর। একদিকে য়ুক্রেনে জার্মানীর উদ্যোগে স্থাপিত তাঁবেদার সরকারের কারসাজি, অন্যদিকে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন সত্ত্বেও জার্মানী রাশিয়া আক্রমণে উদ্যত। এদিকে মিত্রপক্ষও ছলে বলে কৌশলে নতুন সরকারের পতন ঘটাতে সচেষ্ট। তবে মিত্রপক্ষ জার্মানদ্বেষী হলেও তুলনায় ঢের বেশি বলশেভিক-বিরোধী। কারণ, নতুন বলশেভিক গবর্ণমেণ্ট শুধু পুঁজিবাদ বিরোধীই নয়, গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শেরও বিরোধী। অর্থাৎ জঙ্গীবাদ অথবা নয়া সাম্রাজ্যবাদকে মিত্রপক্ষের যতটা ভয় নয়, তার চেয়ে ঢের বেশি শঙ্কা ভাববিপ্লবকে। কাজেই এ-শত্রুর অঙ্কুরে বিনাশই তাদের কাম্য। তারা এ সময় রাশিয়ায় কর্মতৎপর প্রতি বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য করতে থাকে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে সুযোগমত গোপন ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণও করে। মস্কো বিদেশী রাষ্ট্রের গোয়েন্দাদের মধুচক্রে পরিণত হয়। আর মিত্রপক্ষের অর্থপুষ্ট পরিশ্রমজীবী ও মূলোচ্ছিন্ন অভিজাত শ্রেণী অবিরাম প্রতি-বিপ্লবে ইন্ধন জুগিয়ে চলে।

১৯১৮ সালের জুলাই-এ অবস্থা সঙ্গীন; দক্ষিণে য়ুক্রেন হতে জার্মানরা আক্রমণোদ্যত, আর রাশিয়ায় বন্দী চেক সৈন্যদিগকে মস্কো

অভিযানের জন্যে মিত্রশক্তির অবিরাম উস্কানি। তখনো কিন্তু পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধের বিরাম ঘটেনি। অথচ বলশেভিক নিধনে উভয় পক্ষই সমান তৎপর, তবে প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে ও নিজস্ব পদ্ধতিতে। এহেন অবস্থায় আগষ্ট মাসে উত্তর রাশিয়ায় আর্চ-অ্যাঞ্জেলে মিত্রপক্ষের সেনা নামিয়ে দেয়া হয়; পক্ষান্তরে জার্মান, চেক ও প্রতিবিপ্লবীরা মস্কোর চারদিক বেষ্টন করে। কিন্তু ঘরে-বাইরের শত্রুকে রুখ্‌বার মতো সামরিক বল রাশিয়ায় নেই, আর সম্মিলিত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়বার মতো সমর শক্তিরও নিতান্ত অভাব। কারণ, এর মাত্র ৯ মাস আগে হয় সোভিয়েৎ শাসন কায়েম; পাঁচ মাস আগে হয় ব্রেস্টলিটভস্কের চুক্তি। কাজেই গুছিয়ে নেবার আগেই—চারদিক হতে রাশিয়া আক্রান্ত; তার নাভিশ্বাস উপস্থিত। কিন্তু এহেন সঙ্কটেও রুশ নেতৃবৃন্দ নির্ভীক ও কঠোর সঙ্কল্পবদ্ধ; আদর্শ রক্ষায় অবিচল, নিষ্ঠুর ও নির্মম। যে ক্রূরতা নিয়ে শত্রুপক্ষ রাশিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্বনাশে তৎপর, আত্মরক্ষার তাগিদে তার চেয়ে দ্বিগুণ চতুর্গুণ একশ গুণ প্রচণ্ডতা নিয়ে তাঁরা মরণ আহবে মত্ত। তাঁদের আওয়াজ: দেশদ্রোহীদের নিপাত করো, বিদেশী আক্রমণকারীদের প্রত্যাঘাত হানো। নিজ অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে এভাবেই জঙ্গী সাম্যবাদ (militant communism) ও লিওঁ ট্রটস্কির নেতৃত্বে লালফৌজের জন্ম। আবার এ ফৌজের বিস্তারের গতিও বিস্ময়কর। '১৭ সালে ক্ষমতা দখলের পর যে-সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৩৫ হাজার, ১৯২০ সালে তা বেড়ে হয় ৫৩ লক্ষ।

১৯১৮ সালের ১১ই নবেম্বর যুদ্ধ বিরতি (প্রথম মহাযুদ্ধ) চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়; কিন্তু সারা উনিশ ও কুড়ি সাল ধরে চলে রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ। এক সময়ে তো লালফৌজকে ১৭টি বিভিন্ন রণাঙ্গনেও লড়তে হয়। কারণ সাইবেরিয়া হতে বাল্টিক ও ক্রিমিয়া অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে এ-যুদ্ধের প্রসার ঘটেছিল; আর এতে যোগ দিয়েছিল বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, জাপান, ইতালী, সার্বিয়া, চেকো-

শ্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ, পোলাণ্ড এবং বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো প্রতি-বিপ্লবী রুশ সেনাপতিবৃন্দ ও শক্তিসমূহ। চারদিক হ'তে এমন বিপুল চাপ অসহ; তখন বলশেভিক সরকারের পতন আসন্নপ্রায়; কিন্তু অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে বীর্যবান রুশ জনসাধারণ; সংগ্রামে পোড় খেতে খেতে অগ্নিশুদ্ধ, বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে। কাজেই 'মরিয়া না মরে শত্রু এ কী বিষম দায়!' আঘাতে প্রত্যাঘাতে যেমি তাদের দুর্জয় প্রতিজ্ঞা কুলীশকঠোর হয়, তেমি প্রতিবার বিজয় লাভের সঙ্গেও আদর্শনিষ্ঠ সোবিয়েতেরও আত্মশক্তির উন্মেষ ঘটতে থাকে।

১৯১৯ সালে মিত্রপক্ষ জলস্থলে রাশিয়া অবরোধ করে; ফলে সেবছর বিদেশে পণ্য বেচা রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এতে আর্থিক দিক হতে তা'র নতুন বিপদ উপস্থিত হয়। কিন্তু এত সব প্রাণান্তকর বিরোধিতা সত্ত্বেও অবশেষে রুশ জনগণের আত্মত্যাগ, আদর্শনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্যের জয় হয়। রাশিয়ার রাষ্ট্রিক নবাদর্শ পৃথিবীর শোষিত ও নির্যাতিত জনসাধারণের সহানুভূতি ও প্রশংসা লাভ করে। আর জার আমলের অলস, অশিক্ষিত, পরস্পরবিচ্ছিন্ন, অপটু, আদর্শ ও মনোবলহীন এক বিরাট জনগোষ্ঠি আত্মরক্ষার বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সুসম্বদ্ধ, শক্তিধর ও আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ একটি জাতিতে পরিণত হয়। এভাবেই বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কালের রক্তস্নানে রাশিয়ার নবজন্ম ঘটলো, রূপান্তর হলো। সঙ্কটত্রাতা লেনিন হয়ে উঠলেন প্রবুদ্ধ জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, আর সোবিয়েৎ রাষ্ট্র পৃথিবীর শোষিত জনগণের ভরসাস্থল।

গৃহযুদ্ধ ও বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপের অবসান ঘটলো বটে; কিন্তু ঘরোয়া সমস্যা বাড়লো বই কমলো না। যুদ্ধ, অবরোধ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষে রাশিয়া তখন শ্মশানে পরিণত। মাঠ ফসলশূন্য, কারখানা উৎপাদনহীন। চাষীরা ফসল ফলাতে উৎসুক নয়; তাদের আশংকা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফসল হলেই তো তা' রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে মজুত

হবে। সরকারী নীতির প্রতিবাদে দু' এক জায়গায় বিদ্রোহও ঘটলো। কাজেই অবস্থা সুবিধের নয়। কিন্তু লেনিনের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা অসাধারণ। একদিকে তিনি* করলেন পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান; অন্যদিকে করলেন যুদ্ধকালীন জঙ্গী সাম্যবাদের নীতি বর্জন করে সাময়িকভাবে নতুন বৈষয়িক নীতি (New Economic Policy or NEP) প্রবর্তন। এ ব্যবস্থায় কৃষকরা ফসল ফলানয় ও বিকিকিনিতে আগের চেয়ে বেশি সুবিধা পেলো, পেলো বেসরকারী ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি। সাধারণ লোক যখন কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার উপক্রম করছে, তখন আবার আর একটী বিপদ উপস্থিত; রাশিয়ার দক্ষিণপূর্ব বিরাট এলাকায় অভূতপূর্ব ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে লক্ষ লক্ষ লোক পশুর মতো প্রাণ হারাতে লাগল। এবার সোবিয়েৎ সরকার প্রায় ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম। কিন্তু দলের অপরিমেয় সংগঠনশক্তি ও সমতাবিধানের অপূর্ব ক্ষমতা বলে পূর্ব পূর্ববারের মতো এবারেও হলো সঙ্কটত্রাণ। তবে এবারের বিপদে রাশিয়ার ঘোর বিদ্বেষী, বৃটেন ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশ তাকে সর্তাধীনে সাহায্য করতে স্বীকৃত হলো। সর্তটি মজার: জার আমলের ঋণ শোধ করো, সাহায্য পাবে। কিন্তু আশ্চর্য এই, এবার এলো আমেরিকা হতে বিনাসর্তে প্রচুর সাহায্য। এভাবে যখন রাশিয়া ক্রমশ বিপদ কাটিয়ে উঠ্‌ছিল, আর যখন দেখা গেলো যে সোবিয়েৎ সরকারকে গদিচ্যুত করা অসম্ভব ও তার সঙ্গে সংযোগ না রাখাটা নিজেদেরই লোকসানের ব্যাপার, তখন সাবেক রুশবিরোধিতার মনোভাব এদের অনেকেরই চলে যেতে থাকে। কাজেই '২১ সালের প্রথমদিকে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদনের পর অনেক দেশই বাস্তববাদী বৃটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। পক্ষান্তরে রাশিয়াও নিজের অবস্থা অনুধাবন করে ও নিজেকে চারদিকে শত্রু-পরিবৃত দেখে বৈদেশিক নীতি সুস্থির করে ফেলে। একদিকে যেমন সোবিয়েৎ রাষ্ট্র পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সঙ্গে

সহযোগিতা এবং বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সূত্রপাত করে, অন্যদিকে একটু স্থিতিশীল হবার পরেই চীন, তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের মতো মধ্য ও উত্তর এশিয়ার প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতি উদার ও সহিষ্ণু মনোভাব দেখাতে থাকে। এর ফলে সাম্রাজ্য-বাদী দেশসমূহ, বিশেষ করে বৃটেন বেশ বেকায়দায় পড়ে যায়। প্রাচ্যের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে রাশিয়া কোন কোন ব্যাপারে তার পক্ষে কণ্টকবিশেষ, আবার ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। এটা অবশ্য রাশিয়ার সর্বজাতি ও শোষিত জনসাধারণকে স্বাধীনতাদান নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; তবে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোকে হীনবল করে নিজ বনিয়াদ দৃঢ়তর করাই ছিল তার গভীরতর উদ্দেশ্য।

পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অসীম প্রভাব বিস্তার করে, কম্যুনিষ্ট জগতের এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করা প্রয়োজন। ঘটনাটি এই: ১৯১৯ সালে মস্কোয় কম্যুনিষ্ট পার্টি কর্তৃক তৃতীয় আন্তর্জাতিক (Third International) স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য: পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং মধ্যপন্থী সুযোগসন্ধানী সমাজবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন, প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠাতা সাম্যবাদের গুরু কার্ল মার্ক্স স্বয়ং; দ্বিতীয়টির অবসান ঘটে প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে। রুশ কম্যুনিষ্টদের মতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতৃবৃন্দই শোষিত জনগণের বিশ্বাস হন্তারক। তবে একথা সবাই জানে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের নিয়ে আন্তর্জাতিক কম্যুনিষ্ট সংস্থা গঠিত। আর রাশিয়ায় সাম্যবাদ জয়যুক্ত হওয়ায় রুশ নেতাদের প্রভাব এখানে স্বভাবতই বেশি। এর মাধ্যমে পৃথিবীর নানাদেশে সাম্যবাদের প্রচার করা হতো; সংক্ষেপে এর নাম কোমিণ্টার্ণ (Com-intern)। তবে সোবিয়েৎ সরকার ও 'কোমিণ্টার্ণের' মধ্যে প্রভেদ বিস্তর। কিন্তু সাম্যবাদ প্রচারের যন্ত্র বলে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিভিত্তিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ কোমিণ্টার্ণের ঘোর বিরোধী।

১৯২৪ সালে রাশিয়া অনেকটা স্থিতিশীল ; সোবিয়েৎ সরকারও দৃঢ়মূল। কিন্তু গুরুতর পরিশ্রমে লেনিনের স্বাস্থ্যভঙ্গ। এ থেকে তিনি আর নিরাময় হয়ে ওঠেননি। তবে ঐ বছর ২১শে জানুয়ারী নব্য রাশিয়ার স্রষ্টা ও বিপ্লবী নায়কের জীবনাবসান ঘটলেও রাশিয়া কিছুকাল নিজস্ব গতিবেগেই সম্মুখপানে এগিয়ে চলতে থাকে। শুধু তাই নয়। রুশ পররাষ্ট্র নীতিতেও নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। এ-নীতি কোন কোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বৃটেনের নির্বাচনে জাল 'জিনোভিয়েফের পত্রাবলী'-প্রসূত বিপর্যয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯২৪ সালে বৃটেনের নির্বাচনের প্রাক্কালে রুশ বিপ্লবী জর্জি জিনোভিয়েফের একখানা জালপত্র সংবাদপত্রে বের হয়। এতে রাজনৈতিক মহলে তুমুল আলোড়ন চলে। পত্রে নাকি ইংরেজ সমাজতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্টদিগকে বিদ্রোহ ঘটাবার উস্কানি দেয়া হয়। এর ফলে তৎকালীন সংখ্যালঘু শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পতন ঘটে! কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক, এ কৌশল রাশিয়ার পক্ষে আত্মরক্ষার তাগিদ ছাড়া কিছু নয়। যেহেতু কোন রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতিই ঘরোয়া রাজনীতি ও বৈষয়িক নীতি হতে বিযুক্ত নয় ; বরং ভিন্ন কথায় তারই প্রতিচ্ছবি। অবশ্য তখনকার অবস্থায় রাশিয়ার বৈদেশিকনীতি দানা বেঁধে ওঠেনি ; এর মুখ্য হেতু, তার অভ্যন্তরীণ দৌর্বল্য। কাজেই ঘরোয়া নীতির উৎস-ভূমি বৈষয়িক কাঠামোর ভিত্তি দৃঢ় করা, ও তার পুনর্গঠনে অখণ্ড মনোযোগ নিবদ্ধ করা—রাশিয়ার পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল।

বৈষয়িক নীতি পুনর্গঠনের প্রথম পর্বে রাশিয়ায় মার্ক্সীয় নীতির প্রয়োগে কড়াকড়ি তেমন হয়নি ; বরং ১৯২১ সালে লেনিন প্রবর্তিত নয়া বৈষয়িক নীতি তো বুর্জোয়া বা পরশ্রমজীবীদের সঙ্গে আপোষরফা বই কিছু নয়। তবে এর অর্থ, নীতি-বিসর্জন নয়, প্রচলিত অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন। কারণ, এ সময়টা ছিল বিপন্ন রাশিয়ার পক্ষে

হাঁফ ছাড়ার কাল। কাজেই শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে বিদেশ, বিশেষ করে শিল্পপ্রধান ইংলণ্ড ও আমেরিকা হতে তাকে ভূরি পরিমাণ রেল ইঞ্জিন, গাড়ী, মোটর, কলের লাঙ্গল ও কারখানার যন্ত্রপাতি কিনতে হয়; আর এসব কাজে মূলধন হিসাবে ব্যবহারের জন্যে তাকে বিদেশ হতে ঋণ সংগ্রহের ব্যবস্থাও করতে হয়েছে; কিন্তু এত সহজে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, তা বলাই বাহুল্য। যেহেতু রাষ্ট্রিক আদর্শের সংঘাতহেতু প্রথমাবধিই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলো ছিল এর তীব্র বিরোধী। তবে পরে অবশ্য এদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। আর প্রথম দিককার হার্দ্য বিকর্ষণের চেয়ে পরের দিককার আর্থিক টানই এদের কাছে প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়। স্পষ্টই বুঝা যায়, প্রধানত কাঁচামাল উৎপাদনকারী রাশিয়ায় শিল্প-সামগ্রী ও পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা তাদের পক্ষে লাভজনক বেশি। কাজেই মুনাফার অঙ্ক স্ফীত হবার সম্ভাবনায় শিল্প-প্রধান পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলো যে রাশিয়াকে ক্রমশ স্বীকৃতি দেবে ও তার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ অঞ্চল জুড়ে যে রাষ্ট্রের স্থিতি তাকে উপেক্ষা করাও বাস্তববুদ্ধিসম্মত নয়। কিন্তু এদের ভেতরও আমেরিকা ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়াব প্রতি বিমুখ ছিলো।

আসল ভয় রাশিয়ার বিপুল আয়তনে নয়, তার বৈপ্লবিক ভাবাদর্শে সন্দেহ ও অবিশ্বাস তা'র আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী কার্যকলাপে—যা'র বাহন কোমিণ্টার্ণ। অর্থাৎ তার আদর্শ ও নীতি উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ বিরোধী। কাজেই উভয় মতাবলম্বী রাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ মৌলিক ও গুরুতর। বৃটেন প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র যেমন প্রথম হতেই তাকে সমূলে নাশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তেমনি রাশিয়াও পৃথিবীর বিভিন্ন সম্পদশালী দেশের কল-কারখানার শোষিত মজুর ও বিত্তহীন শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেও ধর্মঘটের উস্কানি দিতে থাকে; আর ঔপনিবেশিক পরাধীন

দেশের নির্যাতিত ও বুভুক্ষু জনগণের মধ্যে অভ্যুত্থানের রসদ জুগিয়ে তাদের মধ্যে আতংক ও সংশয় জিইয়ে রাখে। কাজেই উভয় পক্ষে ছোটখাট সংঘর্ষের বিরাম ছিল না,—যার পরিণতি কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ ও যুদ্ধাতঙ্ক। ১৯২৭ সালের আর্কসএ হানাই তার অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

রাশিয়া ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংঘাতের আর একটা প্রধান হেতু বিপ্লবোত্তর রাশিয়া কর্তৃক বৈদেশিক ঋণ বিলকুল অস্বীকার। '২২ সালে মিত্রপক্ষীয় গবর্ণমেণ্টসমূহ রাশিয়াকে এ ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তদুত্তরে রাশিয়া যে পাল্টা জবাব দেয়, তা' নানাভাবে উল্লেখযোগ্য। অতীতে কতগুলো পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিদেশী ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও ঋণ অস্বীকার করেছে, তা'র একটা ফিরিস্তি দিয়ে রাশিয়ার তরফ হতে বলা হয়, "বিপ্লবজাত গবর্ণমেণ্ট ও নয়া সমাজ ব্যবস্থা পূর্বতন সরকারের বাধ্যবাধকতা স্বীকার করতে নারাজ।" এসত্ত্বেও রাশিয়া সর্তাধীনে ঋণ সম্পর্কিত আলোচনায় রাজি হয়। তা'র সর্ত ছিলো: বিনাসর্তে সোবিয়েৎ রাষ্ট্রকে মেনে নিতে হবে। তবে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সকে ঋণ শোধের আশ্বাস যে না দেয়া হয়েছিল এমন নয়।

উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই: বৃটেন সরকারী ও যুদ্ধ ঋণ, রেলওয়ে ঋণপত্র ক্রয় ও বাণিজ্যিক লগ্নীবাবদ মোট ৮৪ কোটি পাউণ্ড রাশিয়ার কাছে দাবী করেছিল; পক্ষান্তরে গৃহযুদ্ধে মিত্রপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে রাশিয়ার মোট ৪০৬ কোটি ৭২ লক্ষ ২৬ হাজার ৪০ পাউণ্ড ক্ষতি হয় বলে রাশিয়ার তরফ হতে পাল্টা দাবি করা হয়। এর ভেতর বৃটেনের দেয় অর্থের পরিমাণ আনুমানিক দু'শ কোটি পাউণ্ড। রাশিয়া আরও জানায় যে বিদেশী হস্তক্ষেপের ফলে সাড়ে তের লক্ষ রুশ নরনারী নিহত হয়। কাজেই দাবির উত্তরে যে পাল্টা দাবি করা হয়, তা' একেবারে অন্যায় ও অসঙ্গত নয়। এরূপ অবস্থায় এ-প্রশ্নের ফয়সালা তত সহজে হয়নি। পরে অবশ্য সময়াতিপাতে ঋণ

তামাদি বলে গণ্য হয়; আর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের গুরুত্বও কমে যায়।

কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ অথবা যুদ্ধায়োজনের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টি করা রাশিয়ার কাম্য নয়; যেহেতু শান্তিপর্ব ছাড়া যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় পুনর্গঠন ও জার-আমলের কুশাসনের অভিশাপ দূর করা তা'র পক্ষে সাধ্যাতীত। দু' দুটো মহাদেশের বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে যা'র আধিপত্য, সেখানে সমাজতান্ত্রিক মনোভাবে সমগ্র দেশবাসীকে দীক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ করা, আর সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে রাষ্ট্রের কাঠামো গড়ে তোলার জন্য অন্তহীন অবকাশ প্রয়োজন। কাজেই আন্তর্জাতিক মনোমালিন্য জিইয়ে রাখা তা'র স্বার্থের প্রতিকূল। কিন্তু যেটুকু সংঘাত ও সংঘর্ষ তা'র টিকে থাকার পক্ষে অপবিহার্য বলে মনে হয়েছে, নিজেব সামরিক বল ও সম্পদহীনতা সত্ত্বেও তা'কে প্রশ্রয় দিতে তা'ব কুণ্ঠা হয়নি। এটা তা'র স্বেচ্ছাকৃত ব্যবস্থা। কিন্তু আসলে শান্তিপ্রিয়তাই তা'র বরাবরের নীতি। একদিকে তা'কে পুনর্গঠণ, শিক্ষা-বিস্তাব ও শিল্পায়নের আয়োজন দ্রুত সম্পূর্ণ করতে হচ্ছিল, অন্যদিকে বহিঃ-শত্রু ও ঘরোয়া বিরুদ্ধতাকে ঠেকাবাব জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। অবশ্য শেষোক্ত ব্যাপারে সাফল্যের জন্য রাশিয়াকে একসময় "বিশ্ববিপ্লব" ঘটাবার স্বপ্নও দেখতে ও চেষ্টা করতে হয়েছে। কিন্তু স্বল্প অভিজ্ঞতায়ও তার পক্ষে এটা বুঝা শক্ত হয়নি যে 'বিশ্ব-বিপ্লব' ঘটাবার পূর্বে নিজের 'পিতৃভূমির' সংহতি সাধন ও বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় তা'র সর্বাঙ্গীন কল্যাণ ও রূপান্তব ঘটানো প্রয়োজন। যখনি এ-চেতনা জাগ্রত হলো, তখনি রাশিয়ায় 'সমাজতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদ' বা 'একদেশে সমাজতন্ত্রবাদ' প্রতিষ্ঠানীতির উন্মেষ ঘটে, অর্থাৎ নিজ দেশকে সর্বাগ্রে সমাজতান্ত্রিকতার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি-রূপে গড়ে তোলাই ছিল তাদের লক্ষ্য। এম্নি করেই ঘটে রাশিয়ায় বৈদেশিক নীতির ক্রমিক রূপান্তর। দৃষ্টান্তস্বরূপ তার সংলগ্ন পূর্বাঞ্চলীয় পুঁজিবাদী দেশ তুরস্ক এবং সামন্ততান্ত্রিক দেশ পারস্য ও

আফগানিস্থানের প্রতি তার সৌখ্য ও সহযোগিতামূলক মনোভাব উল্লেখযোগ্য। তাদের সঙ্গে তার নানা সন্ধি চুক্তিও নিষ্পন্ন হয়। লক্ষ্যের বিষয়, তখনও বিভিন্ন রাজনৈতিক কাঠামোর অস্তিত্ব প্রয়োজনের তাগিদে তাকে মেনে নিতে হয়েছিল ; প্রকারান্তরে এটা সহাবস্থান নীতিরই প্রচ্ছন্ন স্বীকৃতি। তৎকালীন রাশিয়ার উদ্দেশ্য ও অবস্থা রবীন্দ্রনাথের অননুকরণীয় ভাষায় বলা যায়,— "এদের সাধনা হচ্ছে শিক্ষা স্বাস্থ্য অন্ন সম্বলের উপায় উপকরণকে প্রকৃষ্ট প্রণালীতে ব্যাপক করে গড়ে তোলা, এদেরই পক্ষে নিরুপদ্রব শান্তির দরকার সব চেয়ে বেশি।.........কাজ সামান্য নয়—য়ুরোপ এশিয়া জুড়ে প্রকাণ্ড এদের রাষ্ট্রক্ষেত্র। প্রজামণ্ডলীতে যত বিভিন্ন জাতের মানুষ আছে, ভারতবর্ষেও তত নেই। তাদের ভূপ্রকৃতি, মানব প্রকৃতির মধ্যে পরস্পর পার্থক্য অনেক বেশি। বস্তুত এদের সমস্যা বহু-বিচিত্র-জাতি সমাকীর্ণ বহু-বিচিত্র-অবস্থাসংকুল বিশ্ব পৃথিবীর সমস্যারই সংক্ষিপ্ত রূপ।"

সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মূল বনিয়াদ তার বৈষয়িক নীতির রূপান্তর ও সামাজিক বিন্যাস-রীতিতে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগের ওপর নির্ভরশীল। এদিক থেকে লেনিনের উদ্ভাবিত নয়া বৈষয়িক নীতি (New Economic Policy বা সংক্ষেপে NEP) সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের পক্ষে নিঃসন্দেহে সমাজতন্ত্রের দিকে প্রথম পদক্ষেপ। ১৯২১ সালে রাশিয়ার সমাজ জীবনে এ-নীতির প্রথম প্রয়োগ করা হয়। মধ্যবিত্ত কৃষকদিগকে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে আকর্ষণ করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। যেহেতু কুলাক (ইহার অর্থ মুষ্টি) বা বিত্তশালী কিষাণরা সমাজতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে ভূমি-ব্যবস্থা পুনর্গঠনের বিরোধী। তারা একহিসাবে ছোটখাট পুঁজিবাদীও বটে। তারা কায়েমী স্বার্থের পোষক ও ধারক। কাজেই এ-ব্যাপারে তারা স্বভাবতই নিরুৎসাহ। কিন্তু নতুন বলশেভিক সরকার নাছোড়বান্দা। একদিকে তা'র ভূমি পুনর্বণ্টন, অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক আকারে

বৈদ্যুতিকরণ পরিকল্পনা রূপায়নের উদ্যম। এ দুটো উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে বড়ো বড়ো বিদ্যুৎ তৈরীর কারখানা গড়ে তোলার সুচনা। লেনিন বলতেন—বিদ্যুৎ ও সোবিয়েতের যোগফল সমাজতন্ত্রবাদের সমতুল। সোজা ভাষায়, বিদ্যুতই শিল্পায়নের আদি উপকরণ। ফলত নতুন রাষ্ট্র শিল্পভিত্তিক। এহিসেবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এর আশু লক্ষ্য, সুলভ বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্বারা খামারের কাজে কৃষকদের সাহায্য দান, আর দেশের ব্যাপক শিল্পায়নের ভূমিকা রচনা; এর পরোক্ষ লক্ষ্য, কৃষকদের মধ্যে শিল্পযুগের মনোবৃত্তির সংক্রমণ ও স্ফুরণ; কলকারখানার শ্রমিক অথবা 'প্রলিটারিয়েট' (Proletariat) বা গরীবদেব সমস্তরে তাদের স্থাপন; আর তাদের মানসিকতার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন। অর্থাৎ মধ্যযুগের ভাবধারা এবং সনাতন সামাজিক আদর্শ বোধ ও কুসংস্কার হতে বিপুল জনজীবনকে মুক্ত করা রাশিয়ার ব্রত।

কিন্তু লক্ষ্য ও আদর্শ এক কথা, আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি ভিন্ন কথা। এদুয়ের মধ্যে ব্যবধান প্রচুর। স্থানকালপাত্র ভেদ এখানেও মানতে হয়; রাশিয়াকেও হয়েছিল, যদিও তার পথ সরল ও সংক্ষিপ্ত। যেমন বিপ্লবের পরবর্তী চার বছর রাশিয়ায় চালু করা হয় 'জঙ্গী সাম্যবাদ' (militant communism)-এর ফলে একদিকে নগর ও নগরবাসী মজুর, অন্যদিকে গ্রাম ও গ্রামীন কৃষিকুলের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত উপস্থিত হয়। মজুর চায় তার উৎপন্ন যন্ত্রপাতির চড়া দাম ও অল্প-দরে কৃষিজাত কাঁচা মাল জোগান। কিন্তু কৃষক চাইছিল ঠিক এর বিপরীত সুবিধা। কাজেই মূলত সমগোত্রীয় এ উভয় শ্রেণীর মধ্যে অশুভ রেষারেষি বর্জনের ব্যবস্থা হয়; আর নয়া বৈষয়িক নীতিতে কৃষকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় করার অধিকার হয় স্বীকৃত। এটা প্রকারান্তরে বিবর্তনমূলক ব্যবস্থা; আমূল পরিবর্তন নয়, সংস্কার সাধন।

এ-সঙ্গে আর একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। ভূমি ব্যবস্থার পুনর্বণ্টন ও বৈদ্যুতিকরণের সঙ্গে লেনিন চাষাবাদেও সনাতন পদ্ধতি ত্যাগের

প্রয়োজন অনুভব করেন। এহেতু কলের লাঙ্গল বা ট্রাক্টর দিয়ে জমিচাষের প্রথা প্রবর্তন অথবা অন্য কাজের ব্যবস্থা তিনি করেন। এব্যাপারে আমেরিকার ফোর্ড কোম্পানি রাশিয়ায় বহু ট্রাক্টর সরবরাহ করে, আর রাশিয়ায় বিরাট মোটরগাড়ী নির্মাণের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়। এম্নি করে রাশিয়ায় ভূমিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এবং কৃষি ও শিল্পবিপ্লবের সূচনা।

জার-আমলের রাশিয়া আদপে একটা ঘনসন্নদ্ধ অথবা সুসম্বদ্ধ জাতীয় রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত ছিলনা। তা'কে বলা হতো জার সাম্রাজ্য। এশিয়া ও য়ুরোপের বিশাল এলাকা এর কুক্ষিগত; আয়তনে পৃথিবীর এক ষষ্ঠাংশ স্থান জুড়ে এর অবস্থিতি। সাকুল্যে ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রায় ১৮২টি বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠি ও জাতের লোক এখানকার অধিবাসী; তাদের আচারবিচার, চালচলন, রীতিনীতি, স্বভাব, মানসিকতা ও ঐতিহ্য সবই আলাদা। কিন্তু হ'লে কি হবে; খোদ রাশিয়াই এদের সবাকার প্রভু; আর প্রজা হিসাবেই এরা শাসিত। নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের সুযোগ হতে তারা বঞ্চিত; আত্মপ্রকাশের অধিকার তাদের অস্বীকৃত,—মধ্য এশিয়ার অনুন্নত জাতিগুলো তো একেবারেই উপেক্ষিত। সংখ্যালঘুরাও নির্মমভাবে উৎপীড়িত। এদের ভেতর ইহুদিদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে শোচনীয়; তাদের জাতিগতভাবে খুন করার রেওয়াজ তো কুখ্যাত ব্যাপার। কাজেই রাশিয়ায় সহানুভূতি, সমস্বার্থ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য অথবা রাষ্ট্রিক উচ্চাদর্শের সাধারণ বন্ধনের কোন বালাই ছিলনা। বরং একটা অমোঘ বিধানে সকলে নিয়ন্ত্রিত হতো; জারের জবরদস্তি, শোষণ ও কুশাসনের দণ্ডভীতি 'ডেমোক্লিসের খড়্গের' ন্যায় সকলের মাথার ওপরই ছিল ঝুলানো। কাজেই জনসাধারণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও ভেদ নীতির প্রয়োগে শাসিত। এর ফলে যেসব সমস্বার্থ বা গুণের সমন্বয়ে এক 'জাতিত্বে'র মনোভাবের স্ফুরণ হয়, অথবা যেসব বিষয়ের সমষ্টিগত ফলাফল দ্বারা 'জাতিত্বে'র সংজ্ঞা

নির্ধারিত হয়ে থাকে, তিনশ’ বছর জার-শাসিত রাশিয়ায় সে-অর্থে কোন ‘জাতি’ গড়ে ওঠেনি। ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিজাত সাম্রাজ্যিক শাসনের এটাই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি,—এমনকি সে-শাসন স্বদেশী গবর্ণমেণ্টের হলেও, অথবা পরস্পরসংলগ্ন বহু ও বিস্তৃত অঞ্চলের সমবায়ে সে-দেশ গঠিত হলেও। এহেন অবস্থায় করণীয় যথাযথ ব্যবস্থাও লেনিন অবলম্বন করেন। খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত রাশিয়াকে অচিরে একসূত্রে গাঁথবার প্রচেষ্টাও তাঁর হয় শুরু। এখানে তাঁর সম্পর্কে বলা যায়, রুশ-বিপ্লবেরও বহু আগে থেকেই রাশিয়ার বহু জাতি ও সংখ্যালঘু সমস্যার ওপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছিল। বলশেভিক দল গঠনের প্রারম্ভ হতে তিনি তাই প্রত্যেক জাতিকে পূর্ণ, আত্মনিয়ন্ত্রণেব অধিকার দেবার অনুকূলে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন,—এমনকি এব্যবস্থায় তাদের বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন হয়ে যাবার ঝুঁকি থাকলেও। পরে অবশ্য এ নীতিই বলশেভিক দলেব অন্যতম কর্মপদ্ধতিতে পরিণত হয়। কাজেই রাশিয়ায় গবর্ণমেণ্টরূপে সুপ্রতিষ্ঠ হবার অব্যবহিত পরই বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতিতে পুনরায় আস্থা প্রকাশ করে সরকারী ঘোষণাবাণী প্রচারিত হয়।

গৃহযুদ্ধের সময় জার-সাম্রাজ্য খান খান হয়ে যায়। মিত্রপক্ষেব উস্কানিতে ফিনল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, এস্তোনিয়া, লিথুয়ানিয়া ও লাট্‌ভিয়া নিজেদেব স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে। তবে এ সময়েব প্রথমদিকে মস্কো ও লেলিনগ্রাদের চতুষ্পার্শ্ববর্তী সামান্য কিছু অঞ্চলে মাত্র সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্রের প্রভুত্ব বজায় ছিল। কিন্তু গৃহযুদ্ধে বলশেভিক দলেব জয়ে অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন সূচনা হয়; আর হয় সাইবেরিয়া ও মধ্য এশিয়ায় সোবিয়েৎ সরকার স্থাপন। কাজেই সমআদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্রসমূহ ১৯২৩ সালে একযোগে সোবিয়েৎ ইউনিয়ন অথবা সমাজতন্ত্রী সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্রসমূহের সমবায় (Union of Socialist Soviet Republic or U. S. S. R.) গঠন করে। এই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে য়ুরোপ ও এশিয়ায়

বহু পরস্পর-সম্পর্কিত ও পরস্পর-নির্ভর প্রজাতন্ত্রের পত্তন ঘটে; আবার এসব প্রজাতন্ত্রে বহু 'জাতীয়' ও 'স্বাধিকার সম্পন্ন' এলাকার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো: সর্বত্র আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকারের এত ছড়াছড়ি কেন? এর উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—প্রত্যেক জাতিকে নিজস্ব সংস্কৃতি এবং ভাষা অনুশীলন ও রক্ষায় উৎসাহ, আর যথাসম্ভব বেশি মাত্রায় স্বাধীনতাদান। তা' ছাড়া, এক জাতি বা গোষ্ঠি কর্তৃক অন্য জাতি বা গোষ্ঠির ওপর প্রভুত্ব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা যথাসম্ভব পরিহার করাও এ-ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য। এতে বিভেদ-প্রবণতা বাড়ার সম্ভাবনা দূরে থাক, বরং এ-আশংকা চিরতরে লোপ পাবার পথ সুগম হয়। প্রত্যেক সম্প্রদায়, গোষ্ঠি বা জাতি নিঃসন্দেহ হয় যে তা'র ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের চর্চা, রক্ষা ও বিকাশ শুধু সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের লক্ষ্য নয়, প্রত্যেকের আত্মবিকাশের ধারা অনুসরণকল্পে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের নীতি রূপায়িত করার নিশ্চয়তাদানও তাদের পরিকল্পনার অঙ্গ। এর সামগ্রিক পরিণামফলও সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হয়েছে; পরবর্তী পরিণতি ও ঘটনাবলীই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়: "আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদ্‌লে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল তারা সমাজের অন্ধ কুটুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। * * এদের এতকালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে, দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট সচেতন। এদের সাম্‌নে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণ-মাত্রায়।" এহেন অবস্থায় সোভিয়েৎ রাষ্ট্রের দূর দূরান্ত প্রসারিত স্বায়ত্তশাসিত বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে দ্রুত ঘনিষ্ঠতা, ঐক্য ও একাত্ম-

বোধ গড়ে উঠে; আর বলিষ্ঠ, আত্মনির্ভর ও স্বয়ম্পূর্ণ জাতি ও রাষ্ট্ররূপে সোবিয়েতের উত্থান ত্বরান্বিত হয়। এস্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন, নীতি ও তত্ত্বের দিক হতে সোবিয়েতের প্রতিটি ইউনিয়ন পৃথক হয়ে যেতে পারে; কিন্তু বহিঃশক্র বা পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রতিকূলতার আশংকায় তারা ফেডারেশন অথবা সমবায় গঠনের অপূর্ব সুযোগ সুবিধা পরিহারে নারাজ। একে বলা যায়, আত্ম স্বার্থের তাগিদ বা Enlightened self-interest.

লেনিন ছিলেন রাশিয়ার একচ্ছত্র নেতা, তাঁর প্রভুত্ব ছিল অসপত্ন। তাঁর জীবদ্দশায় দলে কোন উপনেতৃত্বের স্থান ছিল না; ব্যক্তিগত প্রাধান্য লাভের সময় ও সুযোগও ছিল কম। কিন্তু অবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল হবার সঙ্গে, আর লেনিনের লোকান্তরের অব্যবহিত পরই শুরু হয় দলের কর্মসচিব স্টালিন ও ট্রটস্কির মধ্যে নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা। স্টালিন নীরব ও নিরলস যোদ্ধা, উৎকৃষ্ট সংগঠক; লৌহকঠিন তাঁর ইচ্ছাশক্তি, অপরিমেয় উদ্যম; পক্ষান্তরে ট্রটস্কির বাগ্মিতা ও সংগঠনশক্তি অসাধারণ, তাঁর শাণিত ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মেধা, গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর খ্যাতিও সুবিদিত। কিন্তু ট্রটস্কির অসুবিধা এই: তিনি দলে স্টালিনের তুলনায় নবাগত, আর দলীয় ক্ষমতা স্টালিনের করায়ত্ত; তা' ছাড়া স্টালিন জনসাধারণেরই একজন, জর্জিয়ার কৃষককূলে জন্ম। ট্রটস্কি অবশ্য মার্ক্সীয় তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যানে সিদ্ধহস্ত; বিপ্লবেরও পূর্বে তিনি "স্থায়ী বিপ্লবের" তত্ত্ব উদ্ভাবন ও প্রচার করেন। এ-মতে কোন দেশের পক্ষেই একাকী পুরাপুরি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিশ্ব-বিপ্লব ঘটাবার পরই প্রকৃত সমাজবাদের প্রতিষ্ঠা হতে পারে, তখনই কৃষককূল সমাজবাদে দীক্ষিত হতে পারে। আর মার্ক্সীয় তত্ত্ব অনুসারে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের ফাটল আন্তর্জাতিক সমাজবাদই নিজ সুবিধামতো কাজে লাগাতে পারে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিকতা প্রগতির ভিত্তি; কাজেই সোবিয়েৎ রাশিয়ার মতো বিরাট দেশেও বিচ্ছিন্ন-

ভাবে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা কার্যত অসম্ভব। রাজনৈতিক দিক হতে বিচার করলেও, পুঁজিবাদী দেশ দ্বারা বেষ্টিত রাশিয়ার পক্ষে একা টিঁকে থাকা সম্ভব হতে পারে না। হয় পুঁজিবাদী দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে পিষে মারবে, নয় পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সামাজিক বিপ্লব ঘটে সর্বত্র সমাজবাদ স্থাপিত হবে। অবশ্য মধ্যবর্তী অবস্থায়ও উভয় সমাজ ব্যবস্থা পাশাপাশি বহাল থাকৃতে পারে, কিন্তু চিরকাল নয়। এ মতবাদই বিপ্লবের আগে ও পরে অধিকাংশ বলশেভিক নেতা পোষণ করতেন। কিন্তু নয়া বৈষয়িক নীতি (N. E. P.) অনুযায়ী কাজ শুরু হলে রাশিয়ায় নতুন ধরণের কর্ম-ব্যস্ততা দেখা দেয়। এতে ট্রটস্কি সকলকে হুঁশিয়ার করে দিলেন; বল্লেন, বিশ্ব-বিপ্লব ঘটাবার উপযোগী জঙ্গী নীতি অনুসৃত না হলে রুশ-বিপ্লব বিপন্ন হবে। এ নিয়ে দলের মধ্যে বহুকাল তর্কবিতর্ক ও আলোচনা চলে। তবে স্টালিন কর্তৃক রুশ কৃষকদিগকে সমাজবাদে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্যে প্রগতিশীল কৃষি নীতি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপনই উভয়ের মধ্যে আশু সংঘর্ষের হেতু। ট্রটস্কি বলেন যে 'স্থায়ী বিপ্লব' না ঘটিয়ে রুশ কৃষকদিগকে বিচ্ছিন্নভাবে পুরাপুরি সমাজবাদী করা যাবে না। কিন্তু দলীয় শক্তির জোরে স্টালিনেরই হয় পরিণামে জয়। আর ট্রটস্কি ও তাঁর অনুগামীদের বিপ্ল বিরোধী সাব্যস্ত করে দল হতে বিতাড়িত ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। পরে অবশ্য ট্রটস্কিকে দেশত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়; তিনি বৃটেন ও য়ুরোপের অন্যান্য দেশে আশ্রয়প্রার্থী হন; কিন্তু ভয়ে কেউ তাঁ'কে আশ্রয় দেয় না। পরে তিনি সাময়িকভাবে তুরস্কের রাজধানী ইস্তাম্বুলের নিকটবর্তী প্রিনকিপো দ্বীপে বসবাসের অনুমতি পান। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দূর হলো; আর দলে একনায়কত্বও স্থাপিত হলো; তবু স্টালিনকে ঘোর সঙ্কটের মধ্যে কাজ আরম্ভ করতে হয়। যেহেতু দেশে চরম দুর্গতি; বুদ্ধিজীবীরা বেকার; শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে; কুলাক বা বিত্তশালী কৃষকরা সরকারী নীতিতে বিরক্ত

শঙ্কিত ও ক্রুদ্ধ হয়ে সমস্ত গবাদি পশু নিধন করায় দেশে খাদ্য, মাংস ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির অভাব প্রকট। স্টালিন কুলাকদের কাছ থেকে বিপুল কর আদায় করে গ্রামাঞ্চলের যৌথ খামার গড়বার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু কুলাকদের সন্দেহ,—তাদের সম্পত্তি ও গবাদিপশুও গরীব প্রতিবেশীদের সঙ্গে একত্র করা হবে, তারা অধিকারচ্যুত হবে। এহেন অবস্থায়ও তিনি অবিচল, দুর্জয় তাঁর সঙ্কল্প—দেশে ভৌমিকতন্ত্রের অবসান, আর শিল্পায়নের ভিত্তি দৃঢ় করতে হবে। তাঁর উদ্দেশ্য (১) যৌথ বা আদর্শ খামার গড়ে তুলে কৃষকগণকে শ্রমিকদের সমতুল করা (২) বিরাট কলকারখানা ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা স্থাপন, এবং খনি হতে আকর উত্তোলন। তাছাড়া, শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রসার ঘটানো, সমবায়মূলক ক্রয়বিক্রয় ব্যবস্থা, শ্রমিকদের বাসোপযোগী লক্ষ লক্ষ বাসগৃহ নির্মাণ ও সাধারণভাবে সকলের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করাও তাঁর অভিপ্রায়। এসব বিষয়ই রাশিয়ার প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত; রুশরা একে 'পিয়াটিলেট্কা' বলে অভিহিত করে থাকে। এ-পরিকল্পনা যেমনি বিরাট, তেমনি অতিশয় ব্যয়সাধ্য ব্যাপার; বিত্তশালী ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনায় সমুন্নত দেশের পক্ষেও এক যুগের মধ্যে এরূপ পরিকল্পনা রূপায়ণ সাধ্যায়ত্ত নয়; আর রাশিয়ার মতো অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশের তো কথাই নাই। কিন্তু একটি বিষয়ে পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে রাশিয়ার সুবিধা ছিল বেশি। এক বিরাট প্রচেষ্টায় ইউনিয়নের বিভিন্ন শিল্প ও কর্মতৎপরতার নিয়ন্ত্রণ, সংহতিবিধান, সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করা আর সামগ্রিক ভিত্তিতে সুসমঞ্জস পরিকল্পনা বিন্যাস করা রাষ্ট্র হিসাবে রাশিয়ার পক্ষে অধিকতর সহজ। তাছাড়া, ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় যেখানে শুধু মুনাফার লোভই শিল্প বাণিজ্য পরিচালনার মূলমন্ত্র হয়ে থাকে; সেখানে ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমানের লাভই আসল কথা হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই এরূপ ব্যবস্থাপনায় গুরু ও মূল শিল্প স্থাপন অগ্রাধিকার পায় না, পায়

লঘু শ্রম-শিল্প (যেমন কাপড়ের কল ইত্যাদি, যাদের উৎপাদন-কাল হতেই অর্থাগম হতে থাকে)। কিন্তু সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের উদ্যোগে যে পাঁচসালা পরিকল্পনা রচিত হয়, তাতে গুরুশিল্পই প্রাধান্য লাভ করে ; কারণ এসব শিল্পই সমগ্র শিল্পায়নের ভিত্তিস্থানীয়। কিন্তু এর ফলে রুশ জনসাধারণকে অপরিমেয় ত্যাগ স্বীকার ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। মূল শিল্প প্রতিষ্ঠার উপযোগী যেসব যন্ত্রপাতি ও কলকব্জা বিদেশ হতে আমদানী করতে হয়, তজ্জন্য তাদের নগদ ও সোনায় মূল্য শোধ করতে হয় ; কিন্তু এসব মুদ্রা ও স্বর্ণ সংগ্রহের পথ হলো, নিজেদের বঞ্চনা করা ; প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় ও ভোগ্য বস্তু যেমন ডিম, মাখন, মাংস, মুরগী, মাছ, চিনি, তেল ও গম প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করা। তবে ভরসার কথা, রুশ জনসাধারণ যখন বুঝল যে দেশের অনগ্রসরতা, পুঁজিবাদের অবশিষ্টাংশ ও জীবনযাত্রার নিম্নমান দূর করার জন্যেই এ ব্যবস্থা, তখন তারা স্বেচ্ছায় আত্মবঞ্চনা করে, দুর্গতি ও ক্লেশবরণে প্রস্তুত হয়। এ যেন আবার দ্বিতীয়বার বিপ্লবের সূচনা, আদর্শের জন্য আত্মত্যাগের আহ্বান! কাজেই যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে সমগ্র জাতির কর্ম-কাণ্ড পাঁচসালা কর্মপ্রচেষ্টা রূপায়ণে কেন্দ্রীভূত হয়। আর তাদের অভীষ্টলাভও হয় নির্দিষ্ট সময়েব এক বছর আগেই অর্থাৎ ১৯২৯ সালে প ি কল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হয়ে ১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বরই শেষ হয়ে যায়, এবং ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী হতে হয় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার কাজ শুরু।

পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে একটি অনগ্রসর কৃষিপ্রধান দেশ অকস্মাৎ শিল্পসমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরিত হয় ; এমন ভোজবাজী, যুগপৎ কৃষি ও শিল্পবিপ্লব ঘটায় রাশিয়া চেহারার হয় আমূল পরিবর্তনের সূচনা। একদিকে গড়ে উঠতে থাকে বিরাট বিরাট যৌথ খামার ; সে সবে ব্যবহার শুরু হয় যন্ত্রের ; অন্যদিকে ঘটে ত্বরিৎ গতিতে মূল

শিল্পসমূহের পত্তন। এ করেই হয় সমগ্র জাতির জীবনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার জাগরণ, সুবিন্যস্ত আকারে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রয়োগ। সবই কিন্তু জাতীয় ও সামাজিক মানসিকতা পুনর্গঠনে পরিকল্পিত। বলতে দ্বিধা নেই, এর আগে বিজ্ঞান ও শিল্পসমৃদ্ধ কোন দেশেই সামাজিক হিতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের এমনধারা কল্যাণকর প্রয়োগ হয়নি। কাজেই পাঁচসালা পরিকল্পনার সঙ্গে বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত। কিন্তু এ কাজ আদৌ সহজসাধ্য হয়নি। এমন কি, সময় সময় অবস্থাবৈগুণ্যে ও প্রতিকূল চাপে নতুন সমাজবিন্যাস ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সোবিয়েৎ সরকারও। কিন্তু স্ট্যালিনের নেতৃত্বে কম্যুনিষ্ট পার্টি যে অবিচল নিষ্ঠা, ধৈর্য, সংযম ও বিচক্ষণতার পরীক্ষা দিয়েছে, তা সচরাচর দুর্লভ। এমনও হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত কুলাক, ধনিকদের ক্রীড়নক মধ্যবিত্ত সমাজের বুদ্ধিমান চতুর লোকজন যথা ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি, যৌথখামার ও শ্রমশিল্পের ভিত্তি শিথিল করার জন্যে নাশকতা করেছে। কিন্তু এর প্রতিশোধও নেওয়া হয় নির্মম। এহেন সময়ে শুরু বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দার; ফলে রুশ পণ্যদ্রব্যের রপ্তানী ও বর্হিবাণিজ্যের আয়ের পরিমাণ অসম্ভব কমে যায়। পক্ষান্তরে, সাধারণের ত্যাগের মাত্রা বাড়ে, দুঃখ-দুর্গতির পাত্র হয় পূর্ণ। বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো, '৩১ সালে রাশিয়ার নানা এলাকায় অনাবৃষ্টি ও পূর্ব-এশিয়ায় যুদ্ধাতঙ্কে খাদ্যাভাব সৃষ্টি হয়। এতে করে রাশিয়ার হিসাবে গরমিল ঘটে, হয় অভাবনীয় লোকসান। কিন্তু এ সত্ত্বেও তার উদ্যমে ভাটা পড়েনি, বরং সংকল্পের জোর তার বাড়ে; আরো বেশি দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা নিয়ে আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করতে প্রবৃত্ত হয়।

রাশিয়ার প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা রূপায়ণের সমসাময়িককালে পৃথিবীর পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোতে বাণিজ্যিক মন্দা দেখা দেয়; ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কোচে ও কলকারখানা বন্ধের ফলে বেকার সমস্যা প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু মন্দায় রাশিয়ায় কর্মপ্রচেষ্টা অথবা বৈষয়িক ব্যবস্থা

বিপর্যস্ত হওয়া দূরে থাক, বরং নানাক্ষেত্রে দ্রুত সমৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর আসল হেতু, নতুন ভিত্তিতে রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিন্যাস। পুঁজিবাদী সমাজ-ব্যবস্থায় যেখানে ব্যক্তিগত উদ্যম, প্রতিযোগিতা ও মুষ্টিমেয় ধনবানের প্রাধান্য, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শোষণ ও প্রতিযোগিতা-হীনতা, মুনাফা-প্রবৃত্তির নাশ ও রাষ্ট্রিক উদ্যোগ আয়োজনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ সুনিশ্চিত। এহেন অবস্থায় ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় জনসংখ্যা ১৩ কোটি হতে বেড়ে ১৯২৬ সালে ১৪ কোটি ৯০ লক্ষ, ১৯২৯ সালে ১৫ কোটি ৪০ লক্ষ ও ১৯৩৩ সালে ১৬ কোটি ৫০ লক্ষ-এ এসে পেঁছেছে। আর শিশুমৃত্যুর হার শতকরা ২৭ থেকে কমে ১২-তে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রকারান্তরে বৈষয়িক সমৃদ্ধির অন্যতম লক্ষণ। আবার '১৭ সালে সমগ্র রাশিয়ায় সহরের (city) সংখ্যা ছিল ২৪টি; কিন্তু '২৬ ও '৩৩ সালে যথাক্রমে হয় ৩১টি ও ৫০টিরও বেশি। আর ১৫ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় শতাধিক নয়া শিল্প নগরের পত্তন হয়। এদিকে '২৯ ও '৩১ সালের মধ্যে ২ লক্ষ যৌথ খামার ও ৫ হাজার রাষ্ট্রীয় খামার গড়ে তোলা হয়; আর হয় ১ লক্ষ ২০ হাজার কলের লাঙ্গল এসব খামারে প্রবর্তন। তারপর ১৯২৮ সালে ২ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক ক্রেতা সমবায় সমিতির সদস্য ছিল; তাদের সংখ্যা '৩২ সালে বেড়ে হয় সাড়ে সাত কোটি। এম্নি করে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সমাজতন্ত্রের বুনিয়াদ দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপিত হয়। তবে লক্ষণীয় ব্যাপার এই: সাধারণের আর্থিক ক্লেশ প্রশমনকল্পে যৌথ ও ব্যক্তিগত খামারগুলোকে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যশস্য সহরের বাজারে সরাসরি বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়; এটা ১৯২১ সালের নয়া বৈষয়িক নীতি নির্ধারণকালীন ব্যবস্থার সমতুল। আর একটি বিষয় এই যে, যৌথ অথবা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি চুরিকে প্রতি-বিপ্লব বলে গণ্য করে মৃত্যুদণ্ডের বিহিত করা হয়।

রাশিয়ায় শিক্ষাবিস্তার অথবা নিরক্ষরতা দূর করার অভিযান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর বৈশিষ্ট্য এই যে, যেসব অঞ্চল সবচেয়ে

অনগ্রসর, যেমন মধ্য-এশিয়ার উজবেকিস্থান ও তুর্কমেনীস্থান,— সে সব এলাকায়ও নিরক্ষরতা দ্রুত দূর হয়। ১৯১৩ সালে এই দুটো এলাকায় মাত্র ১২৬টি বিদ্যায়তনে ৬২০০ ছাত্র পড়াশুনা করতো ; কিন্তু ১৯৩২ সালে ৬৯৭৫টি শিক্ষালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হয় ৭ লক্ষ ; আবার এদের একতৃতীয়াংশ ছাত্রী। অল্প কিছুকাল আগেও এরা বোরখা পরতো ; জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ এদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। কী করে এ অলৌকিক ঘটনা সম্ভব হলো ? এর মূলে রয়েছে বিভিন্ন স্থানীয় লিপির পরিবর্তে লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন। এর ফলে প্রাথমিক শিক্ষাদান ব্যবস্থা পূর্বাপেক্ষা সহজতর হয়। এর প্রারম্ভিক উদ্যোগপর্ব হিসাবে ১৯২৪ সালে ককেশীয় প্রজাতন্ত্রে আরবী বর্ণমালা বর্জন করে লাতিন হরফ গ্রহণ করা হয়। এখানে পরীক্ষায় সফল হলে চীনা, মঙ্গোল, তুর্ক, তাতার, বুরিয়াৎ, বাস্‌খির, তাজিক ও অন্যান্য বহু জাতি লাতিন হরফ ব্যবহার শুরু করে ; তবে স্থানীয় ভাষাই বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত ও অবৈতনিক শিক্ষাদানের সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনায় রাশিয়ায় ব্যাপক হারে পুস্তকপাঠ হতে থাকে ; আর শিক্ষনীয় বিষয় লঘু সাহিত্য অথবা উপন্যাস-গল্প নয়, বিজ্ঞানবিষয়ক বা জ্ঞানগর্ভ নিবন্ধ অথবা গ্রন্থ অধিকাংশের পাঠ্য। এতো সাধারণ ব্যবস্থা। জার আমলের প্রাচীন প্রাসাদ ও অভিজাত শ্রেণীর বিরাট হর্ম্যগুলোকেও শিক্ষাক্ষেত্র, সংগ্রহশালা, বিশ্রামাগাব, স্বাস্থ্যনিবাসে পরিণত করা হয় ; পক্ষান্তরে শিশু, তরুণ ও নারীসমাজ রাষ্ট্রের আনুকূল্য সর্বাধিক লাভ করে।

আবার যুগপৎ চলে বিজ্ঞানচর্চার অভূতপূর্ব আয়োজন। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রীয় কর্মনীতির সঙ্গে সমতা রেখে বেছে বেছে সবচেয়ে অনুন্নত ও অনগ্রসর অঞ্চলগুলোতে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক বিতরণ করার যে-উদ্যোগ রাশিয়ায় আরম্ভ হয়, তা পৃথিবীর ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, সাইবেরিয়ার তৃণভূমি-অঞ্চল ও মধ্য-এশিয়ার উপত্যকাখণ্ডের উল্লেখ করা হয়।

বহিঃপৃথিবীর সমস্ত যোগাযোগ হতে এসব এলাকা বিচ্ছিন্ন; জ্ঞানের আলোক হতে বঞ্চিত। রাশিয়ার মনোযোগ কিন্তু সবচেয়ে এদের প্রতিই বেশি নিবদ্ধ; কারণ বঞ্চিত ও হতভাগ্যদের শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত করে সকলের সমপর্যায়ভুক্ত করা সোবিয়েৎ রাষ্ট্রের পক্ষেই কল্যাণজনক; এ সত্য সোবিয়েৎভূমিতে স্বীকৃত। মধ্যএশিয়ার তাজিকীস্থানের কথাই বলা যাক। এখানকার লোকসংখ্যা মাত্র ১০ লক্ষ। এ স্থানটি আফগানীস্থান ও চীনা তুর্কিস্থানের সীমান্তবর্তী; ভারত-সীমান্তের অদূরে পামির পর্বতমালার উপত্যকায় অবস্থিত। ১৯২৫ সালে এখানে মাত্র ৬টি আধুনিক শিক্ষালয় ছিল; ১৯২৬ সালে তার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১১৩টি, আর ছাত্রসংখ্যা হয় ২ হাজার ৩ শ; পক্ষান্তরে '২৯ ও '৩১ সালে যথাক্রমে বিদ্যালয়-সংখ্যা ৫শ' ও ২ হাজার-এ (১ লক্ষ ২০ হাজার ছাত্রসহ) পৌঁছে। আবার শিক্ষার ব্যয়-বরাদ্দের অঙ্কও অবিশ্বাস্য; '২৯—৩০ সালে এখানে শিক্ষাব্যয় ধরা হয় ৮০ লক্ষ রুবল (১ রুবল = প্রায় ২ শিলিং) এবং '৩০—৩১ সালে হয় ২ কোটি ৮০ লক্ষ রুবল। আবার সাধারণ বিদ্যালয় ছাড়া বহু শিশু শিক্ষাসদন, ট্রেণিং বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও পাঠাগার খোলার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া, চাষাবাদ ও রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, স্বাস্থ্য ও সেচ-ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং শিল্পায়নের ব্যবস্থাও হয় ত্বরান্বিত।

অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে সমাজ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রয়াস রাশিয়ার; অর্থাৎ একটি মাত্র রাষ্ট্রকেও সমাজতন্ত্রবাদের মূল ঘাটিতে পরিণত করাই এক্ষেত্রে আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে বিশ্ব-বিপ্লবের স্বপ্ন হয় বিঘ্নিত, বিপ্লবের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের হয় বিরোধিতা। তবে রাশিয়ার সরকারী অনুসৃত নীতি মূলত জাতীয়, আন্তর্জাতিক নয়। এহেতু তার সমগ্র প্রচেষ্টা জাতীয় পুনর্গঠন ও সমাজবিন্যাসে কেন্দ্রীভূত। যাতে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোনরূপ জটিলতার উদ্ভব ঘটতে পারে, অথবা বাইরের অ-কাজে অহেতুক ও অনিচ্ছায় জড়িয়ে পড়ে ঘরোয়া

কাজ স্থগিত রাখতে হয় এমন কোন ব্যাপার তার কোনক্রমেই কাম্য নয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই রাশিয়ায় সমগ্র নীতির বিবর্তন ঘট্‌তে থাকে। কাজেই সাম্রাজ্য ও পুঁজিবাদী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে নানা প্রয়োজনে তাকে আপোষরফা করে চল্‌তে হয়, প্ররোচনার যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও নীরবে অপমান পর্যন্ত হজম করতে হয়। কিন্তু এসবই নিজেকে আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার একৈক লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্যে পরিকল্পিত। সে যেন আত্মতুষ্ট একটি জাতি, এমন ভাবেই তার আচরণ ও কাজকর্মে প্রকাশ ; আর সকলের সঙ্গে মিলেমিশে চলে পৃথিবীতে শান্তি বজায় রাখার চেষ্টাই তার প্রয়াসে বেশি করে ফুটে ওঠে। তার 'কেল্লগচুক্তি' স্বাক্ষরের হেতু এখানে নিহিত। এ চুক্তির উদ্দেশ্য : যুদ্ধবিগ্রহকে 'বেআইনী' ঘোষণা করা। আবার রাশিয়া ও তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ১৯২৯ সালে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

রাশিয়ার তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঁ লিট্‌ভিনভের নামানুসারে লিট্‌ভিনভ চুক্তি নামে এ খ্যাত। তা' ছাড়া, শান্তিরক্ষার আগ্রহে রাশিয়া বহু 'অনাক্রমণ চুক্তি'ও সম্পাদন করে ; একমাত্র জাপানই শুধু তার সঙ্গে সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হতে অসম্মত হয়। এদিকে ১৯৩২ সালের নবেম্বরে ফ্রান্সের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করায় পাশ্চাত্য রাজনীতিক্ষেত্রে তার স্বীকৃতি লাভ হয়, আর পশ্চিম য়ুরোপের কূটনীতিক্ষেত্রে তার প্রবেশ ঘটে। এটা নিঃসন্দেহে বিশ্ব-রাজনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পক্ষান্তরে ১৯৩১ সালে জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণে বিশ্ব-রাজনীতিক্ষেত্রে হয় আর একটা পট-পরিবর্তনের সূচনা। এ সময় খুব চাপে পড়ে চিয়াং-চীন রাশিয়াকে নতুন করে স্বীকার করে নেয় ; কিন্তু এর কিছুকাল আগেও রুশ-বিরোধিতাই ছিল চীনের নীতি। এদিকে জাপান আত্মপ্রসারে বাধা পেয়ে রাশিয়ার পক্ষে অহেতুক উস্কানি জোগাতে থাকে, এমন কি অপমানজনক কাজও করে। তখনো কিন্তু রাশিয়ার সঙ্গে তার

কূটনৈতিক সম্পর্ক অব্যাহত। কিন্তু শান্তির খাতিরেই মহাযুদ্ধে সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে যায়। এটা কম কথা নয়। অবশ্য তাকেও কোন কোন মহলে দৌর্বল্য বলে ভাষ্য করা হয়েছে। তবে রাশিয়ার লক্ষ্য একটি-ই—পুনর্গঠন পরিকল্পনাকে যেকোনরূপে ফলপ্রসূ করতেই হবে। কাজেই রাশিয়ার উদ্দেশ্য ভিন্ন থাকলে অথবা কোন উদ্দেশ্য না থাকলে তার পক্ষে প্রাচ্যের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া অসম্ভব ছিল না। কিন্তু এক্ষেত্রে রুশ নেতৃবৃন্দ ধৈর্য ও সংযমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। এটা তার দুর্বলতা, অন্তঃসারশূন্যতা নয়; বরং যেকোন মূল্যে শান্তি বজায় রাখা নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কাজেই রাশিয়ার নীতি পরোক্ষে যেমন পররাজ্যলিপ্সু রাষ্ট্রসমূহের উচ্চাকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী, তেমনি শান্তিরক্ষার সহায়ক ও ক্ষেত্রবিশেষে নিজ প্রয়োজনেই তার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

এশিয়া হতে বান্দুং

"ভারতের প্রয়াস বিফল হইলে এশিয়া মরিয়া যাইবে।** ভারতবর্ষ—এশিয়া, আফ্রিকা অথবা বিশ্বের সকল স্থানের শোষিত জাতিগুলির আশাভরসা স্থল হইয়া থাকুক।"

—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতেও কল্পনা করা যায়নি, ভারতবর্ষ কোনদিন পরশাসন হতে মুক্ত হবে। সাধারণত বিশ্বব্যাপারে অজ্ঞ জনগণ তো বটেই, ওয়াকেফহাল বুদ্ধিজীবী আর দেশের নেতৃবৃন্দের ধারণাও ছিল না, প্রায় ছু' শ' বছরের দাস্বেব পর—মুক্তির আলোয় ভারতের অঙ্গনতল উদ্ভাসিত হবে; আবার সে-আলোব শিখা ভাস্বর ও দীর্ঘায়িত হয়ে পূর্বদিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করবে। কারণ নিজের ঘর সামলাবার ও গুছাবার অধিকার যার অস্বীকৃত, অন্যের ব্যাপারেও সে অবহেলিত, উপেক্ষিত। এটা তো গাণিতিক স্বতঃসিদ্ধ সত্য। কাজেই দেশ যতকাল পরবশ ছিল, ততদিন ভারতের দীনতায় দেশবাসীর লজ্জা ও বেদনার সীমা ছিল না। কিন্তু এও তো স্বকৃৎকৃত পাপেরই ফল। অথচ চোখের সাম্‌নেই দেখেছে, প্রাচ্যের অপেক্ষাকৃত বিত্তহীন ও স্বল্প-পরিসর দেশগুলোও স্বাধীন, তারাও প্রধান; ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। অবশ্য 'প্রাচ্যের নবোদিত সূর্য' জাপানের কথা স্বতন্ত্র; বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পে সে উন্নত; প্রতীচ্যের জাতিগুলোর সঙ্গে সমানে পাল্লা তার। কিন্তু রাজ্যলিপ্সা ও লোভ তার কম ছিল না। প্রথমে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য, পরে এশিয়া এশিয়াবাসীর জন্য ও সর্বশেষে সহ-সমৃদ্ধি অঞ্চল গঠনের বুলিতে এশিয়া ও বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিয়েছিল সে। কিন্তু প্রকৃতির

পরিশোধ আছে। যুদ্ধে হতমান ও বিপর্যস্ত সে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পাশ্চাত্য অক্ষশক্তির পূর্বদেশীয় জুড়ি হিসাবে যুদ্ধের ঋণ শোধ তাকেও করতে হচ্ছে। কাজেই এশিয়ার ভরসা সে নয়; প্রকারান্তরে এশিয়ার ভক্ষক; সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের প্রাচ্য এলাকার দোসর। এশিয়ার প্রত্যাশা পূরণ তাকে দিয়ে হয়নি। একে বাদ দিয়ে প্রাক্ যুদ্ধকালে এশিয়ার আর আর দেশ তো আধুনিক মানদণ্ডে অর্ধসভ্য; শিল্পবিজ্ঞানসমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশগুলোর আধা-উপনিবেশে পরিণত, তাদের বৈষয়িক নিগড়ে আবদ্ধ। অর্থাৎ নিজ বাসভূমে পরবাসী তারা; পুরা অধিরাজ তারা নয়। আবার এরা ভৌমিক-তন্ত্র ও রাজতন্ত্রের গোলাম; মধ্যযুগীয় জীবন ও চিন্তাধারার বশ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন; কৃষিভিত্তিক ও ভূমি-আশ্রিত। কাজেই যে-বিদ্যা অধিগত হলে আত্মবশ হওয়া ও নৈতিক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব, সে-জ্ঞানবুদ্ধির অভাবে তারা ঘরোয়া বিষয়ে বিহ্বল, অপ্রকৃতিস্থ, ক্ষীণবল; আর বাইরের ব্যাপারে ঈর্ষাকাতর ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন। মূলত আত্মদৈন্যই এশিয়ার আসল দৌর্বল্য, আর পাশ্চাত্যের সবলতার অন্যতম হেতু। কাজেই হীনবল এশিয়া অন্যের অনুকম্পা ও কৃপার পাত্র; কিন্তু মহাকবির চিত্ত ব্যথিত, সংক্ষুব্ধ। মহাস্থবির এশিয়ার চিত্ত কি উদ্বোধিত হবে না? ঘুম কি তার ভাঙবে না? নবজাগরণের অভয়মন্ত্র কি তার কণ্ঠে মন্ত্রিত হবে না? কবে সে নবপ্রভাতের পরশ মাণিকে সোনা করি দেবে ভুবনখানিকে! তাই তাঁর ধ্যাননেত্রে স্বপ্নের ছায়া, কণ্ঠে মহাজীবনের আহ্বানবাণী:

জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!
ঢেকেছে তোমারে নিবিড় তিমির
যুগ যুগব্যাপী অমা-রজনীর;
মিলেছে তোমার সুপ্তির তীর
লুপ্তির কাছাকাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

জীবনের যত বিচিত্র গান
ঝিল্লিমন্ত্রে হল অবসান
কবে আলোকের শুভ আহ্বান
নাড়ীতে উঠিবে নাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

সঁপিবে তোমারে নবীন বাণী কে?
নব প্রভাতের পরশ মাণিকে
সোনা করি দিবে ভুবনখানিকে
তারি লাগি বসি আছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

জরার জড়িমা আবরণ টুটে
নবীন রবির জ্যোতির মুকুটে
নব রূপ তব উঠুক-না-ফুটে—
করপুটে এই যাচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

'খোল খোল দ্বার ঘুচুক আঁধার'
নবযুগ আসি ডাকে বারে বার—
দুঃখ আঘাতে দীপ্তি তোমার
সহসা উঠুক বাঁচি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

ভৈরব রাগে উঠিয়াছে তান,
ঈশানের বুঝি বাজিল বিষাণ;
নবীনের হাতে লহো তব দান
জ্বালাময় মালাগাছি।
জাগো হে প্রাচীন প্রাচী!

১৯৪৫ সালের আগস্টে নাগাসাকি ও হিরোসিমা সহরে মার্কিন আণবিক বোমা বর্ষণের ফলে জাপান করে আত্মসমর্পণ ; এরই সঙ্গে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হয় যবনিকাপাত। কিন্তু বিজেতা ও বিজিত কোন পক্ষেরই অবস্থা লোভনীয় ও কাম্য নয়। উভয়ের অবস্থার তারতম্য শুধু মাত্রা ও পরিমাণে। কারণ, যুদ্ধে জিতেও এক আমেরিকা ছাড়া মিত্রপক্ষের সকলের অবস্থাই কম বেশি শোচনীয়, সকলেই পরনির্ভর। এর হেতু, আমেরিকা যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষস্থল হতে বহুদূরে অবস্থিত ; যুদ্ধে তার ক্ষতি শুধু কিছু মার্কিন সৈন্যের আহুতি ও সমরোপকরণের বিনষ্টি। কিন্তু সবচেয়ে লাভবানও সে-ই বেশি। কারণ, মিত্রপক্ষের সকলেই অর্থ ও রসদে তার কাছে কম বেশি ঋণী। সে য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাষ্ট্রের পাওনাদার ; অজস্র তার সম্পদরাশি ; পৃথিবী জুড়ে তার প্রতাপ। পক্ষান্তরে যুদ্ধারম্ভে যে-বৃটেন ধনজনশৌর্যে পৃথিবীর প্রথম রাষ্ট্রশক্তিরূপে স্বীকৃত, যুদ্ধান্তে অজস্র বলির ফলস্বরূপ সে-ই আমেরিকার সাহায্য ও মুখ-প্রত্যাশী, আমেরিকার বৈদেশিক নীতির য়ুরোপীয় ভাষ্য ও রূপকার, দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত। তা' ছাড়া, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের ক্ষেত্র হওয়ায় জার্মান 'লুফ্‌ৎহবাফের' আক্রমণে তার অধিকাংশ শিল্প ও গৃহাদি বিনষ্টপ্রায় ; পুনর্গঠন ও ঘরোয়া নানাবিধ সমস্যায় সে পীড়িত। সর্বোপরি, একদিকে সপ্ত সমুদ্রে তার নৌ-আধিপত্য-নাশ (মার্কিন নৌ-প্রাধান্য-হেতু), এবং অন্য-দিকে শিল্পসম্ভার রপ্তানীজাত সম্পদের পরিমাণ হ্রাস ও বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের অপরিমেয় ঝুঁকি বহনে অক্ষমতা। কিন্তু সবচেয়ে তার বড় বিপদ ভারতবর্ষকে নিয়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্যের 'মুকুটমণি' নিরীহ ও রাজভক্ত ভারতও অগ্নিগর্ভ ;—বৃটেনের মহিমার ভক্ত ও অন্ধস্তাবক আর নয়! তার বশম্বদ রূপ আর নেই ; আত্মপ্রকাশ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর চঞ্চল। যে কোন মুহূর্তে ধূমায়িত অগ্নিশিখা বহ্নিমান হবার আশংকা ; কুশাসন ও শোষণে জর্জর

ভারতবাসী অভ্যুত্থানে উপক্রম। নানা ছোটখাট ঘটনার বহিঃপ্রকাশ তারই ইঙ্গিত। আবার এশিয়ার অন্যান্য ঔপনিবেশিক ও দাস-দেশের অবস্থাও ভারতের সমতুল; জাতীয় অস্থিরতা সে সব দেশেও সমভাবে প্রকট। এতে য়ুরোপের অন্যান্য সকল সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের চেয়ে বৃটেনই সবচেয়ে বেশি বিপন্ন। কাজেই যুদ্ধপূর্ব সম্পন্ন বৃটেন যে অবস্থাকে এতদিন গায়ের জোরে উপেক্ষা করে আস্‌ছিল, যুদ্ধান্তের ক্ষয়ক্ষতিতে শ্রান্ত ক্লান্ত বৃটেন তাকে অগ্রাহ্য করা বিজ্ঞ ও সময়োচিত মনে করেনি। ইতিহাসের অমোঘ বিধানের কাছে অবশেষে নতি স্বীকারে সে বাধ্য হয়। কিন্তু এর ভেতরও তার প্রখর বাস্তববুদ্ধি ও বহু শতাব্দীর অর্জিত বিজ্ঞতাই ক্রিয়াশীল ও প্রত্যক্ষ। একদিকে বিপ্লব, তদুদ্ভূত বিশৃঙ্খলা, ক্ষয়ক্ষতি ও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার (১৭৭৬ সালে আমেরিকার পরিস্থিতির অনুরূপ) সম্ভাবনা, অন্যদিকে ধনজনবলে অপরিমেয় সম্ভাবনাপূর্ণ ভাবী ভারতের মিত্রতালাভের প্রত্যাশা। এ দু'য়ের মধ্যে—কূটবুদ্ধি ও কঠোর বাস্তবপন্থী বৃটেন শেষ পথই বেছে নেয়। ভারতের কাছে তৎকালীন বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড ওয়েভেলের মারফৎ সে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করে; নেতৃবৃন্দও সাগ্রহে এ-প্রস্তাবে সাড়া দেন, বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন। এ যেন আন্তরিকতার বদলে আন্তরিকতা, মিত্রতার বদলে মিত্রতা! এ সূত্রেই ভারতে আলাপ আলোচনা ও আপোষরফার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর; আর কংগ্রেস ও লীগ নায়কদের নিয়ে অন্তর্বর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন। এটা ১৯৪৬ সালের শেষ অর্ধাংশ ও '৪৭ সালের প্রথম ভাগের ঘটনা। এ অস্থায়ী গবর্ণমেণ্টে শ্রীজওহরলাল নেহরু কংগ্রেস পক্ষের নেতা ও 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভ ভাই পটেল সহকারী। আর শ্রীনেহরু মন্ত্রিসভার সহ-সভাপতি, পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ সংযোগ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। সে সময় হতেই তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আত্ম-নিবেদিত: ভারতকে এশিয়া তথা বিশ্বের মানচিত্রে শুধু একটি

নিরাবলম্ব দেশরূপে নয়, পরন্তু একটি স্থিতিশীল আত্মনির্ভর জ্ঞান-বিজ্ঞানশিল্পে উন্নত ও প্রগতিশীল রাষ্ট্ররূপে অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। বিশেষ এ-পটভূমিতেই নয়া দিল্লীতে প্রথম আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

নয়া দিল্লীর বিশ্ব-ব্যাপার বিষয়ক ভারতীয় পরিষৎ কর্তৃক (Indian Council for World Affairs) এ-সম্মেলন আহূত হয়; কাজেই দৃশ্যত বেসরকারী, অদলীয় ও রাজনীতিক সম্পর্কশূন্য। এতে সোবিয়েৎ রাশিয়াভুক্ত মধ্য-এশিয়ার প্রজাতন্ত্রসমূহ, চীন, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার নানা দেশ, মিশর সহ মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ, আফগানিস্থান, তিব্বত ও ভারত-সীমান্তবর্তী এশিয়ার সমস্ত দেশই আমন্ত্রিত হয় এবং মোট ৩৪টিরও বেশি দেশের ২৩০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। আবার আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও নিগ্রো সংস্থাসমূহের বহু দর্শক-প্রতিনিধি এতে উপস্থিত ছিলেন। এর উদ্দেশ্য প্রধানত (১) এশিয়ার সমস্ত দেশের সাধারণ রাজনীতি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যার আলোচনা, (২) যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে এশিয়ার অবস্থা পর্যালোচনা এবং (৩) এশিয়ার সমস্ত দেশের সাধারণ সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় ও তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু দিল্লীর ঐতিহাসিক পুরাণা কিল্লায় সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনের উদ্বোধন করেন ও কবি-রাজনীতিক 'ভারতীয় কোকিল' শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে (১) এশিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিরূপণ ও সমাধান এবং সমগ্র এশিয়া ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে তৎসমুদয় বিচার; (২) এশিয়াবাসী নরনারীর মধ্যে সৌহার্দ ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা, আর এশিয়া ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং (৩) নিঃ এশিয়া সংস্থা গঠিত হয়। তা' ছাড়া, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্রের ৮৫ জন সদস্য নিয়ে একটি সাধারণ পরিষৎ গঠিত হয়; শ্রীনেহরু নির্বাচিত হন

এর সভাপতি। আবার ১৯৪৯ সালে চীনে এশিয়া মহাসম্মেলনের পরবর্তী অধিবেশন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মেলন আরম্ভের পরই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করার জন্য কয়েকটি বিশেষ বা গ্রুপ (Group) কমিটি গঠিত হয়, এরই একটা স্বাধীনতা-আন্দোলন কমিটি। কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে বলা হয় যে এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো এযাবৎ পরাধীন দেশসমূহের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সাহায্য দান করবে; আর সাহায্য ও সহযোগিতা দানের রীতি ও কর্মপন্থা প্রস্তাবিত নিখিল এশিয়া সংস্থা স্থির করবে। ইন্দোনেশীয় প্রতিনিধির মতে এ সিদ্ধান্তই সম্মেলনের চরম সাফল্য। কারণ পূর্বে এশিয়ার এক রাষ্ট্র অপর দেশের মুক্তি-আন্দোলনে মৌখিক সহানুভূতি দেখান ছাড়া অপর কোন বাস্তব সাহায্য দান করত না। কিন্তু এখন হতে কার্যকরী সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা হবে। শ্রীনেহরুর সমাপ্তি ভাষণেও সম্মেলনের সাফল্যই ঘোষিত হয়। তিনি বলেন: "বৈঠক শেষ হয়েছে, কিন্তু কাজ আমাদের আরম্ভ হয়েছে।...এ-সম্মেলন শুধু মুহূর্তের তাগিদে হয় নি।...এটা এক বিরাট প্রদর্শনীও নয়; এর পশ্চাতে যে-আদর্শ ও চিন্তাধারা ক্রিয়াশীল, তা' যে এশিয়ার সর্বত্র প্রচারিত তা-ই নয়, অন্যান্য মহাদেশেও এর ব্যাপ্তি ঘট্‌বে। মানবজাতির কাছে এশিয়ার শাশ্বত বাণী মহামূল্যবান। পাশ্চাত্যের আধুনিক সভ্যতার কাছেও এর মূল্য অল্প নয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় যে অভাব রয়েছে, তার জন্যেই তো ওর দীনতা। কারণ পৃথিবীর সমস্ত কল্যাণকর অবস্থাই তাদের আয়ত্তে; অথচ তারা পরস্পর বিবাদ ও আহবে মত্ত।... হয়ত এশিয়ার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তা ও প্রজ্ঞা সে-অভাব ও দৈন্যদশা দূর করতে পারে।" এখানে শ্রীনেহরু এশিয়ার মর্মবাণী জগদ্বাসীর কাছে নতুন করে ঘোষণা করলেন। আবার এ-সঙ্গে আত্মবিস্মৃত এশিয়ার আত্মমর্যাদা ও আত্মশক্তির উদ্বোধনের কথাও সাড়ম্বরে জানিয়ে দিলেন। তিনি বল্লেন: "অতীতে আমরা আত্মবিস্মৃত

ছিলাম। এখন আমরা আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধানে ব্যাপৃত।··· অন্যেও এক্ষণে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছে যে এশিয়া শুধু মানচিত্রের শোভাবর্ধনই করে না, সে বিভিন্ন বিরুদ্ধবাদী সাম্রাজ্যবাদের প্রতিযোগিতা অথবা শোষণস্থলও নয়। কিন্তু এশিয়া মর্যাদাসম্পন্ন এমন এক মানবসমাজের বাসভূমি, যাদের সুদীর্ঘ ইতিহাস ও বিরাট ভবিষ্যৎ আছে।" এ-বাণী শ্রীনেহরুরই নয়, এ-বাণী নবজাগ্রত এশিয়ারও বাণী।

সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীনেহরুর ঘোষণাও নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায় তিনটে কারণে, যথা (১) এশিয়ায় জাপানের নেতৃত্বের অবসান, (২) চীনের বৃহদায়তন সত্ত্বেও আত্মকলহহেতু নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জনে অক্ষমতা ও (৩) এশিয়ার দেশসমূহের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাব। কাজেই এশিয়া সম্মেলনে তিনি কার্যত এশিয়ার মুখপত্ররূপেই কাজ করেন। তিনি বলেন: "এই আণবিক বোমার যুগে শান্তিরক্ষার জন্যে এশিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে। পৃথিবীকে নিরুপদ্রব করতে হলে প্রথমে এশিয়াকে ঐক্যবদ্ধ ও শান্ত করা আবশ্যক। সাবেক সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটছে; যে-প্রাচীর আমাদিগকে বেষ্টন করে রেখেছে, সাম্রাজ্যবাদী প্রভুত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তা' ভেঙ্গে পড়ছে।···আমাদিগকে অখণ্ড জগতের আদর্শ রূপায়িত করতে হবে। এ-আদর্শের ধারক রাষ্ট্রপুঞ্জের আমরা সমর্থক। আমরা সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ চাই নে; জাতীয়তাবাদের পোষকতা করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য; তবে একে আক্রমণশীল ও আন্তর্জাতিক উন্নতির পরিপন্থী হতে দেয়া যায় না।" আবার য়ুরোপ ও আমেরিকাকেও সঙ্গে সঙ্গে তিনি আশ্বাস দিচ্ছেন; কারণ এতকাল তারাই তো পৃথিবীর প্রভুশক্তি ও ভোক্তা; এশিয়া ও আফ্রিকার ত্রাণকর্তারূপে তাদের আবির্ভাব! ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতার প্রতিভূরূপে য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্র 'কৃষ্ণ মহাদেশ' (Dark continent) আফ্রিকা ও প্রাচীন মহাদেশ এশিয়ার বিভিন্ন

অঞ্চলের শাসনকর্তা ও শোষণকারী। কাজেই এশিয়া সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে তাদের পক্ষে সংশয় হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বল্‌লেও তো সন্দেহভঞ্জন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। তবে ভরসার কথা, সম্মেলনে যোগদানকারী বহু দেশই তখনো ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক শোষণের ক্ষেত্র, কেহবা সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের মৃগয়া। কাজেই আণবিক যুগে উপনীত য়ুরোপ-আমেরিকার পক্ষে বিজ্ঞানে অনগ্রসর এশিয়াকে শঙ্কা করবার তেমন যুক্তিসম্মত কারণ থাক্‌তে পারে না। তবু নেহরুজী বল্লেন—"কারু বিরুদ্ধে দুরভিসন্ধি আমাদের নেই; সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করাই আমাদের মহান্ পরিকল্পনা। আমরা স্বপ্রতিষ্ঠ হতে চাই; যারা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত, তাদের সঙ্গেই সহযোগিতা আমরা করবো। আমরা ইতিহাসের এক যুগের শেষ সীমান্তে ও নূতন যুগের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান।...দীর্ঘ নীরবতার পর আজ এশিয়া বিশ্ব-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।" কিন্তু এতে ভারতের ভূমিকা ও কর্তব্য রয়েছে। তা কী? তিনি বল্লেন: "এশিয়ার প্রত্যেক দেশকেই সমান ভিত্তির ওপর মিলিত হয়ে সাধারণ প্রচেষ্টা ও কার্য-সূচীকে জয়যুক্ত করতে হবে। এশিয়ার এ-নূতন বিবর্তনে ভারতের যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ কর্তব্য। ভারতের আসন্ন স্বাধীনতার কথা ছেড়ে দিলেও ভারতবর্ষ স্বভাবতই এশিয়ার বিভিন্ন শক্তির কেন্দ্রভূমি; এর ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিলনক্ষেত্রে পরিণত হবার পক্ষে ভারতই প্রশস্ত। প্রাচীন-কাল হতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক বিদ্যমান। ভারতের ইতিহাস তার সাক্ষী। পশ্চিম ও পূর্ব হতে বহু সংস্কৃতির ধারা ভারতে মিশেছে; ভারত সে-সবকে আত্মসাৎ করে স্বীয় সংস্কৃতিকে পুষ্ট ও বিচিত্র করেছে। আবার এসঙ্গে ভারতের সংস্কৃতির ধারাও এশিয়ার দূরদূরান্ত দেশে প্রবাহিত হয়ে বহু লোকের ওপর নিজ প্রভাব বিস্তার করেছে।"

কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন আত্মনির্ভরতার, শক্তি সঞ্চয়ের। এশিয়াকে যদি বিশ্বব্যাপারে নৈতিক প্রভাবে বিস্তার করতে হয়, পৃথিবীবাসীকে যদি তার বাণী শোনাতে হয়, তা'হলে সর্বাগ্রে স্ব-প্রতিষ্ঠ ও আত্মস্থ হতে হবে তাকে। অন্যথা পূর্বাবস্থায় ফিরে যেতে হবে, নতুন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উদরস্থ হতে হবে। কাজেই বিপর্যয় পূর্বাহ্নে রোধের প্রয়োজন। একাজে সকলের সহযোগিতা চাই, একাজে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত সকল দেশের সাহায্যও নেওয়া হবে; কিন্তু ভিক্ষুকরূপে নয়। দান গ্রহণ করা হবে দানশোধের উদ্দেশ্যে। ভারত তথা এশিয়ার জাগরণ তাই তাৎপর্যবোধক। তিনি বলেন: "আমরা এশিয়াবাসীরা বহুকাল আদালতে আবেদন-নিবেদন করছি। এখন এ-অবস্থার অবসান ঘটা প্রয়োজন। আমরা আত্মনির্ভর হ'তে চাই। যারা এ ব্যাপারে সহযোগিতা করবে, তাদের সাথে আমরা সহযোগিতা করব। আমরা অন্যের ক্রীড়নক হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছুক নই। জগদ্ব্যাপারে এশিয়াকে নিজস্ব নীতি উদ্ভাবন ও অনুসরণ করতে হবে। তবে পশ্চিম গোলার্ধ আমাদিগকে বারবার যুদ্ধের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই সেদিন যুদ্ধ শেষ না হতেই আণবিক বোমার যুগে আবার নতুন যুদ্ধের কথা শোনা যাচ্ছে। এই আণবিক যুগে শান্তিস্থাপনের জন্য এশিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করতে হবে। এশিয়া তার যোগ্য অংশ গ্রহণ না করা পর্যন্ত শান্তি স্থাপিত হতে পারে না। পৃথিবীর বহু দেশে ও এশিয়ায় গোলযোগ চল্‌ছে। এ সত্ত্বেও এশিয়া শান্তির দৃষ্টিতে সব কিছু দেখে থাকে। বিশ্বব্যাপারে এশিয়া যোগ্যস্থানে আসীন হলে জগতে শান্তিপ্রতিষ্ঠায় এর প্রভাব হবে অসাধারণ। কিন্তু সমস্ত জাতি স্বাধীন, সর্বত্র মানুষ মুক্ত ও নিরাপদ হ'লেই শান্তি স্থাপিত হতে পারে। সুতরাং শান্তি ও স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক উভয় দিক হতেই দেখতে হবে। তবে এশিয়ার দেশগুলো অত্যন্ত অনুন্নত, জীবনযাত্রার মানও এখানে অতিশয় নীচু। এই

বৈষয়িক সমস্যার আশু সমাধান প্রয়োজন ; অন্যথা সঙ্কট ও বিপদ আমাদিগকে অভিভূত করতে পারে।" সুতরাং এশিয়ার উভয়সঙ্কট, সমূহ বিপদ। পশ্চাদ্বর্তী হলেও অনগ্রসরতার পঙ্ককুণ্ড,—অগ্রসর হতে গেলেও প্রতিপদে বিপদাপদ। কিন্তু অগ্রগামিতাই জীবনের লক্ষণ ; কাজেই অসীম সাহস, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যদি সিদ্ধিলাভ হয় তা হলে অক্ষয় কীর্তি স্থাপিত হবে, এশিয়ার জীবন-প্রবাহে জোয়ার আসবে। "বর্তমানের ইতিহাস যখন রচিত হবে তখন এ-ঘটনা এশিয়ার অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দেবে ; এ ইতিহাস রচনায় আমাদের যোগ থাকায়, আমরাও ঐতিহাসিক গৌরবের খানিকটা অংশভাগী হব।"

২রা এপ্রিল, ১৯৪৭ সাল। এদিন এশিয়া মহাসম্মেলনের শেষ প্রকাশ্য অধিবেশন। গান্ধিজী সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিমণ্ডলীর কাছে ভারতের প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী প্রচার করেন ; বিশ্ব-ব্যাপারে এর তাৎপর্য ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন ; আর প্রতিনিধিদের কর্তব্য নির্দেশ করেন। এ ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা অবিসম্বাদী, তাঁর নেতৃত্ব সন্দেহাতীত। আর বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত পল্লী-অঞ্চলে শান্তির বাণী প্রচার ও শান্তি স্থাপন করে সদ্যোমাত্র রাজপ্রতিনিধি লর্ড লুই মাউণ্টব্যাটেনের আহ্বানে জটিল শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সম্পর্কে পরামর্শ দিতে দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত তিনি। কাজেই তাঁর অভিভাষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "সত্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করে প্রাচ্য মহাদেশ পাশ্চাত্যকে জয় করবে। অধুনা আণবিক বোমার উৎপাদনহেতু প্রতীচীতে হতাশার ভাব লক্ষিত হচ্ছে। কারণ, আণবিক বোমার সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে শুধু যে পাশ্চাত্য জগৎই ধ্বংস হবে এমন নয়, সমগ্র জগৎও ধ্বংস হবে। আর বাইবেলোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হলে মহাপ্লাবন অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বর করুন, এরূপ মহাপ্লাবন যেন না ঘটে।" তারপর তিনি বলেন, "পাশ্চাত্ত্য দেশের মনোভাব নিয়ে অথবা

আণবিক বোমা নির্মাণের কৌশল অনুসরণ করে এশিয়ার বাণী অনুধাবন করলে চলবে না। যদি আবার পাশ্চাত্ত্য দেশকে এশিয়ার বাণী শোনাতে ইচ্ছা করেন, তা' হলে সত্য ও প্রেমের বাণী প্রচার করতে হবে।** জগদ্বাসীকে আণবিক বোমার অনিষ্টকারিতার বিষয়ে আপনাদিগকেই অবহিত করতে হবে। তা-ই হবে আপনাদের ও আমার গুরু এশিয়ার বাণী। সকলে যদি একাগ্রচিত্তে প্রাচ্যের মহাপুরুষদের বাণীর অন্তর্নিহিত সুর হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়, যদি ঐ মহাবাণীর যোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণিত করা যায়, তা'হলেই পাশ্চাত্ত্য দেশকে জয় করা সম্ভব হবে, আর সে জয় প্রেমের মাধ্যমে হবে সম্পূর্ণ।"

নয়া দিল্লীতে এশিয়া মহাসম্মেলনের অনুষ্ঠান সমসাময়িক এশিয়ায় এক ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ সময়টি ভারতের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ; প্রায় দু'শতাব্দী ব্যাপী ইংরেজ শাসনের অবসান হয়ে ভারত সার্বভৌম ক্ষমতায় পুনরধিষ্ঠিত হবার পথে অগ্রসর। অন্তবর্তী সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে এদেশ হতে শাসকশক্তি বৃটিশের অন্তর্ধানের ব্যবস্থায় এশিয়ায় নূতন শক্তিরূপে ভারতের আবির্ভাব-কালটি নিঃসন্দেহে একটি স্মরণীয় ব্যাপার। কিন্তু এও নিরুপদ্রবে ঘটেনি। আপোস-রফা ও শান্তি-পূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যে জটিল শাসনতন্ত্রঘটিত সমস্যার ফয়সালা হয়েছিল, ক্ষমতা-হস্তান্তর পর্বটি কিন্তু অত সহজ সরল-ভাবে হয়নি। এটি নেতাদের কাছে সত্যই অপ্রত্যাশিত। কিন্তু ইংরেজের কূটনীতি ও আমাদের স্বদেশবাসী একশ্রেণীর সাম্প্রদায়িক ধ্বজাধারীর মূঢ়তা ও অর্বাচীনতার ফলে দেশকে খণ্ডিত করার পরিকল্পনা তখন প্রায় সম্পূর্ণ। এজন্যে দেশের নানাস্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গোলযোগ প্রায় লেগেই ছিল। অবশ্য অন্তবর্তী সরকার তখনও চালু। আর এরি ভেতর এশিয়া সম্মেলনের আহ্বান। অথচ এটি সরকারী নয়, দলীয় ব্যাপার নয়, রাজনীতির সঙ্গে

সম্পর্ক-শূন্য স্রেফ সামাজিক বৈঠক। তবু পণ্ডিত নেহরু, শ্রীমতী নাইডু আর গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলে এর মর্যাদা ও গুরুত্ব বাড়ে। এ হয়ে ওঠে এশিয়াবাসীদের নবজাগরণের দ্যোতক, আর শ্রীনেহরু প্রতিভাত হন এশিয়ার দলিত শোষিত ও চির-অবহেলিত জনতার আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্তিমান বিগ্রহ, নবজাগ্রত এশিয়ার অন্তরপুরুষ-রূপে; ভারতবর্ষ হয়ে ওঠে নতুন এশিয়ার নবজন্মের প্রতিভূ ও নায়ক।

এশিয়া আফ্রিকা সম্মেলনের পর দু' বছরও অতীত হতে না হতেই এশিয়ায় নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এশিয়ার ভবিষ্যতের দিক হতে এর প্রভাব দূরপ্রসারী। কারণ, একদিকে য়ুরোপের অন্যতম প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশিয়ায় ১৯৪৮ সালের ১৮ই ডিসেম্বর হঠাৎ আক্রমণ করে ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রী জরুরী গবর্ণমেণ্টের বহু নেতাকে আটক করে ও বহু শহর দখল করে নেয়, অন্যদিকে চীনেও শনৈঃশনৈঃ ঘরোয়া বিবাদের চরম পর্যায় উপস্থিত হয়। এর অর্থঃ প্রাচ্যে পুনর্বার ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শাসন কায়েমের নতুন প্রয়াস, আর চীনের মতো লোকবল ও আয়তনের দিক হতে মহাদেশতুল্য দেশে নতুন শক্তির অভ্যুদয়, সাম্যবাদের জয়যাত্রার সূচনা। কিন্তু চীনে যা ঘরোয়া বিবাদ, আর যে-সমস্যার মীমাংসা নিজেদের মধ্যেই সম্ভব, ইন্দোনেশিয়ার ব্যাপার তা' থেকে স্বরূপের দিক হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখানে বহিঃশক্তি ও বাহিরের শত্রুর হস্তক্ষেপই বড় কথা। যুদ্ধপূর্ব-কালে অবশ্য সাড়ে তিনশ' বছর ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ আধিপত্য ছিল, আর ছিল এশিয়ায় সে অন্যতম প্রধান ঔপনিবেশিক শক্তি বলে গণ্য। কিন্তু যুদ্ধের সময় আপনা হতেই তার কর্তৃত্ব লোপ পায়, শূন্য স্থানে জাপান তখন আসর জাঁকিয়ে বসে। কিন্তু যুদ্ধাবসানের সঙ্গে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান ঘটে; জাতীয়তা-বাদীরা বহু শহর ও গ্রামাঞ্চলে শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করে। কাজেই

এদের অধিকার নাশ না করে পুনরধিষ্ঠানের আশা নেই। এহেতু শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত আলাপ আলোচনার অছিলায় ওলন্দাজরা অকস্মাৎ আক্রমণ করে যে কাণ্ড করে বসে, তা'তে নেতৃবর্গ হতবুদ্ধি হয়ে পড়েন; কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ একবার যারা পেয়েছে, তাদের প্রাণশক্তি অজেয়। তাই সমূহ বিপদেও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরোধ শক্তি অব্যাহত। তবে এর ভেতরও নেতারা আশার আলোক দেখলেন,—দেখলেন নিরুপদ্রবে বিরোধ মেটাবার ক্ষেত্র এক নম্বর রাষ্ট্রপুঞ্জ ও দু' নম্বর নবগঠিত এশিয়া ও আফ্রিকা সম্মেলন। কাজেই উভয়ের হস্তক্ষেপ প্রার্থী হলেন তাঁরা। এদিকে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে ইন্দোনেশিয়ায় যুদ্ধ-বিরতি ঘটলো; নিরাপত্তা পরিষৎ কর্তৃক নিযুক্ত শুভেচ্ছা মিশন ইন্দোনেশিয়ায় বিরোধ মেটাতেও এলেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদী নেতারা ওলন্দাজদের সঙ্গে ন্যায়সম্মত ভিত্তিতে আপোষরফার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেও ওলন্দাজদের গড়িমসি ও প্রতিবন্ধকতায় অচলাবস্থার অবসান হলো না। কালাপহরণ চললো, কিন্তু সুফল ফলবার আশা দূরপরাহত। আর রাষ্ট্রপুঞ্জও উদ্যোগী হয়ে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে কোন সক্রিয় ব্যবস্থাবলম্বনে তেমন উৎসাহী নয়। কাজেই আশা কোথায়? নিরন্ধ্র আঁধারে আলোরেখা কৈ?

এমনি পটভূমিকায় এশিয়া সম্মেলনের আহ্বান। এশিয়ার বিপদ নিবারণে ও সমস্যাসমাধানে এশিয়াই এবার উদ্যোগী। ১৯৪৭ সালে আহূত এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলন ছিল অদলীয়, অরাজনৈতিক ও নিছক সংস্কৃতিমূলক ব্যাপার; পক্ষান্তরে এবারকার সম্মেলন শ্রীনেহরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কর্তৃক আহূত। অর্থাৎ এবারকার সম্মেলনে রাজনৈতিক ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। তা'ছাড়া, এশিয়া-আফ্রিকা সম্মেলনে পূর্বগৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঘরোয়া কলহে বিপর্যস্ত চীনে বৈঠক না হয়ে এবারও ভারতই হলো সম্মেলনক্ষেত্র। কাজেই অতিথি-দেশ হিসাবে তো বটেই, নবার্জিত স্বাধীনতার রং

উজ্জীবিত রাষ্ট্ররূপেও ভারতের ভূমিকা বিশেষভাবেই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ভারত কারু ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপে আদৌ অভিলাষী বা বিশ্বাসী নয়—যেমন নয় নিজের ব্যাপারে অন্যের হস্তক্ষেপে। সে শুধু মিত্র-রাষ্ট্ররূপে অন্যের বিরোধ-মীমাংসার সহায়তা করতে ইচ্ছুক,—তা'ও যদি পক্ষভুক্ত কেউ তার সাহায্য প্রত্যাশী হয়। কিন্তু তার এ সদভিপ্রায়েরও বিকৃত ব্যাখ্যা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কোন কোন য়ুরোপীয় শক্তি করতে শুরু করে। ভারতের এ-প্রয়াসকে এশিয়ার তৃতীয় শক্তিগোষ্ঠী গঠনের চেষ্টা বলে বরং অপব্যাখ্যা করা হয়। এটি প্রচার-সর্বস্ব য়ুরোপীয় রাজনীতির ভেল্কিবাজি। কিন্তু এর প্রতিবাদ করাও একান্ত প্রয়োজন; নইলে অসূয়া-প্রসূত মিথ্যাও সত্যের ছদ্মবেশে খাঁটি বলে চালু হওয়া বিচিত্র নয়। আর এশিয়া তথা বিশ্ব-ব্যাপারে ভারতের প্রথম উদ্যোগকে অঙ্কুরে নাশ করারও চাল এটা হতে পারে। কাজেই ১৯৪৯ সালের ১০ই জানুয়ারী কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে শ্রীনেহরু ভারত সরকারের মনোভাব বর্ণনা করে বল্লেন: "এ-সম্মেলন (এশিয়ায়) আহ্বানের পশ্চাতে য়ুরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ কিংবা আমেরিকার বিরুদ্ধে এশিয়া-গোষ্ঠী গঠনের কোন পরিকল্পনাই নাই। এটা য়ুরোপ, পাশ্চাত্য অথবা আমেরিকা-বিরোধী সম্মেলন নয়। তবে এ-সম্মেলন নিশ্চিতভাবে সাম্রাজ্যবাদী অথবা উপনিবেশবাদী মনোভাবের বিরোধী। * * আর রাষ্ট্রপুঞ্জকে দুর্বল করাও এর উদ্দেশ্য নয়, বরং শক্তিবৃদ্ধি করাই লক্ষ্য। আমরা শান্তি ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রসার করার জন্য আসন্ন সম্মেলনে মিলিত হবো।"

কিন্তু সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হবার আগেই ভারতের পক্ষ হতে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে দুটো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, যথা (১) ভারতে অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহী ওলন্দাজ বিমান অবতরণে বাধাদান; পাকিস্থান ও অপর কয়েকটি দেশও এ ব্যাপারে ভারতের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এতে বিশেষ সুফল পাওয়া যায়: এবং (২) নিরাপত্তা পরিষদে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি স্বর্গত স্যার বেনেগল নরসিংহ রাও-এর

অশ্রান্ত চেষ্টা। তিনি সম্মেলন আরম্ভের তিনদিন আগেও নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে হল্যাণ্ডের অযৌক্তিক কার্যকলাপের কঠোর নিন্দা করে ইন্দোনেশীয় সমস্যা সমাধানের নিম্নোক্ত ৪টি প্রস্তাব করেন, যথা (১) ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী অধিকৃত অঞ্চল হতে ওলন্দাজ সেনা সরিয়ে নিতে হবে, (২) সাধারণতন্ত্রী সরকারকে যথাশীঘ্র পূর্বাবস্থায় বহাল করতে হবে, (৩) গণভোট গ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করতে হবে ও (৪) অন্তবর্তীকালে সাধারণতন্ত্রী সরকার গঠন করতে হবে। এ প্রস্তাব ইন্দোনেশিয়ার জরুরী সাধারণতন্ত্রী সরকারের দাবীর অনুগামী। তাঁদের দাবী ছিল তিনটি যথা (১) সাধারণতন্ত্রী সরকারকে ক্ষমতা অর্পণ (২) অধিকৃত অঞ্চলসমূহের প্রত্যর্পণ ও (৩) ওলন্দাজ সৈন্য অপসারণ।

২০শে হতে ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত নয়াদিল্লীতে এশিয়া সম্মেলনের চারদিনব্যাপী অধিবেশন হয়। এতে আমন্ত্রিত ইথিওপিয়া, মিশর, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন সহ ১৯টি রাষ্ট্রের মধ্যে তুরস্ক ছাড়া সকলেই প্রতিনিধি প্রেরণ করে এবং শ্যাম, নেপাল, নিউজিল্যাণ্ড ও চীনের পক্ষ হতে 'পরিদর্শক' উপস্থিত থাকেন। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ও বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধি কল্পে অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার বিরোধ মীমাংসার সহায়তা কল্পে সম্মেলন আহূত হয়। কাজেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রথম এশিয়া সম্মেলনের প্রতিনিধিদের মনে ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ আক্রমণের সমস্যা একক ও বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, বরং এ-ঘটনা সমগ্র এশিয়া মহাদেশেরই সমস্যা বলে দৃঢ় প্রতীতি জন্মে। অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ার সমস্যা স্বরূপে ও আসলে যে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদেরই রূপান্তরিত সমস্যা, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না। কাজেই সম্মেলনে নতুন আওয়াজ তোলা হলো: এশিয়া ছাড়ো। এটি ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি। এটী ভারতের নেতৃত্বে নবজাগ্রত এশিয়ার হুঁশিয়ারী, প্রতিস্পর্ধা।

সম্মেলনের সভাপতি শ্রীনেহরু যে বক্তৃতা করেন তা' নিঃসংশয়ে তাৎপর্যসূচক। তিনি বলেনঃ 'রাজনৈতিক দিক হতে নব এশিয়া স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের প্রতীক; প্রাচ্যের অতীত সভ্যতা ও পাশ্চাত্ত্যের বর্তমান সভ্যতার সংমিশ্রণ।' সম্মেলনের উদ্দেশ্য বর্ণনায় তিনি বলেন, "নিরাপত্তা পরিষদের প্রচেষ্টায় সহায়তা করাই আমাদের উদ্দেশ্য, তাকে খর্ব করা নয়। কোন জাতি বা শক্তিগোষ্ঠীর বিরোধিতা করার জন্য আমরা এখানে সমবেত হই নি; স্বাধীনতার পরিধি প্রসার করে শান্তি প্রতিষ্ঠাই আমাদের লক্ষ্য। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের স্বাধীনতা আজ বিপন্ন; অতীতের মুমূর্ষু উপনিবেশ-বাদ আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। নতুন বিশ্বের বনিয়াদ গড়ার কাজে যেসব শক্তি প্রাণপাত করছে, তাদের দ্বন্দ্বে আহ্বান করা হয়েছে। ······এ হচ্ছে নবজাগ্রত এশিয়াকে দ্বন্দ্বে আহ্বান,—যে এশিয়া ঔপনিবেশিক শোষণে নিগৃহীত। এ চ্যালেঞ্জ মানবাত্মা ও বিভক্ত উদ্‌ভ্রান্ত বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিনিচয়ের বিরুদ্ধেও বটে। চিন্তাশীল ও শুভবুদ্ধিপরায়ণ মানুষের যে আদর্শ অখণ্ড জগৎ, তারই প্রতীক রাষ্ট্রপুঞ্জকে বিদ্রূপ করা, আর তারি ব্যক্ত ইচ্ছাকে অপমান করা হয়েছে। কার্যত যদি এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেয়া না হয়, তবে পরিণামে শুধু ইন্দোনেশিয়ার পক্ষেই নয়, এশিয়া তথা সমগ্র পৃথিবীর ওপরও এর কুফল বর্তাবে। সেক্ষেত্রে ধ্বংস ও অরাজকতার অশুভ শক্তিই বিজয়ী হবে, আর অবশ্যম্ভাবী ফল হবে—বিরামহীন সংঘর্ষ ও বিশ্ব বিপর্যয়।" এরপর এশিয়ার স্বাধিকার ও আত্মস্থতার বাণী ঘোষণা করে তিনি বলেন, "এশিয়া দীর্ঘকাল বিজিত ও পরাধীন; তাই অন্যান্য দেশের খেলার সামগ্রী ছিল। কিন্তু নিজের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সে আর বরদাস্ত করতে নারাজ। ······আমেরিকা এরই ভেতর সমস্বার্থভাগিতার প্রয়োজনীয়তা বোধ করে সাধারণ স্বার্থ-রক্ষা কল্পে একটি সংস্থা গড়েছে; য়ুরোপেও অনুরূপ আন্দোলন চলছে। কাজেই এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলোও যে সাধারণ অভীষ্ট

সিদ্ধির মানসে পারস্পরিক মতবিনিময় ও যৌথ কর্ম প্রচেষ্টা অনুসরণের জন্যে কোন স্থায়ী ব্যবস্থার কথা চিন্তা করবে, এতো স্বাভাবিক ব্যাপার।" কিন্তু কীভাবে একাজ সম্পন্ন হবে? হিংসা ও বিদ্বেষের পথে কি? এর উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা যদি হিংসার পথে চলি, আর পৃথিবীকে আরো খণ্ডিত করার চেষ্টা করি তা হলে আমাদের অভীষ্ট পূর্ণ হবে না। পক্ষান্তরে এশিয়ার যুগযুগান্তের মর্মবাণী অনুধাবন করে আমরা যদি নিজ নিজ গণ্ডী ও রণক্লান্ত বিশ্বে সত্য ও শান্তির আলোকবর্তিকা তুলে ধরতে পারি, তবে বিশ্ববাসীকে স্বতন্ত্র এক জগতের সন্ধান দিতে পারবো।"

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়, যথা—(১) ইন্দোনেশিয়ার সাধারণতন্ত্রী সরকারের নিকট পূর্ণক্ষমতা হস্তান্তর ও ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারীর পূর্বে ওলন্দাজ সেনা অপসারণ করতে হবে; (২) ইন্দোনেশীয় সমস্যার ন্যায়সম্মত ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসাকল্পে নিরাপত্তা পরিষদকে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ করতে হবে; (৩) ১৯৪৯ সালের মার্চের পূর্বেই অন্তবর্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন ও ১লা অক্টোবরের পূর্বে গণপরিষদে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে; (৪) ইন্দোনেশীয় সেনা পরিচালনা ও বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগের ক্ষমতা অন্তর্বতী সরকারকে দিতে হবে। এসব প্রস্তাব ছাড়াও সমাজতন্ত্রী নেতৃবৃন্দকে অবিলম্বে মুক্তিদান, অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের আগে ওলন্দাজ সৈন্যদের পূর্বস্থানে অপসারণ, ব্যবসাবাণিজ্য পুনরারম্ভ ও রাষ্ট্রপুঞ্জের মীমাংসা কমিটির উদ্যোগ দু' পক্ষের মধ্যে আপোষ আলোচনা নতুন করে শুরু করার অনুরোধ করেও বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। আর রাষ্ট্রপুঞ্জ কর্তৃক যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে মূল প্রস্তাবের নকল নিরাপত্তা পরিষদে পেশ করা হয়। কাজেই রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়করূপে এশিয়া সম্মেলন ইন্দোনেশীয় সমস্যার মীমাংসায় যেরূপ ক্ষিপ্রতা সহকারে গঠনমূলক প্রস্তাব রচনা ও সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করে, তা'

এক হিসাবে অভূতপূর্ব ব্যাপার। এ থেকে একদিকে প্রমাণ হয় যে, এশিয়া সম্মেলন রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থা নয়, য়ুরোপ বা পাশ্চাত্ত্য-বিরোধীও নয়, আবার শ্বেতাঙ্গ-অশ্বেতাঙ্গ প্রশ্নও এখানে বড়ো কথা নয়। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত হলো যে, জটিল রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসার যোগ্যতা এশিয়ার রাষ্ট্রনায়কদেরও কারু চেয়ে কম নয়। এশিয়ার সমস্যা তো বটেই, গুরুতর আন্তর্জাতিক প্রশ্ন মীমাংসায়ও তাঁরা তৎপর ও সক্ষম। শ্রীনেহরুর ভাষায় বলা চলে, "রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্মেলনসমূহের বহু বিলম্ব ঘটে, আর প্রায়ই কোন সন্তোষজনক মীমাংসা হয় না। তবু আমরা শুধু ইন্দোনেশীয়া-ই নয়, এশিয়া ও সমগ্র পৃথিবীর ভবিষ্যৎ শান্তি সম্পর্কিত এক অতি গুরুতর সমস্যা সম্পর্কে অত্যল্প কালের মধ্যেই একমত হয়েছি। এটাই আমাদের সাফল্য।...বিশ্বের ইতিহাসে য়ুরোপ ও আমেরিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে, ভবিষ্যতেও থাকবে। কিন্তু এশিয়া তার যথাযোগ্য অংশ চায়, আর সে তার কর্তব্য পুরাপুরি পালন করবে। এশিয়ার কাজ হবে: শান্তি ও সহযোগিতার কাজ। পৃথিবী আজ বহুধাবিভক্ত ও সংঘর্ষময়। এর পরিধি আর না বাড়ে, এমন কিছু যেন আমরা না করি।"

পরিকল্পনার দিক হতে এশিয়া সম্মেলন আদৌ অভিনব ব্যাপার নয়; পূর্বেও এ জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব হয়েছে। কিন্তু কার্যত সম্মেলনের আয়োজন বা অনুষ্ঠান হয়নি। তা' ছাড়া, পূর্বে বৈঠক হলে তা' কতকটা কৃষ্টিমূলক অথবা সামাজিক ব্যাপার হতো; বর্তমানের মতো সরকারী পর্যায়ে হতো না। আর এর প্রভাব এতোটা ব্যাপক গভীর বা দূরপ্রসারী হতো না, তাৎপর্যও হতো না এতোটা ঐতিহাসিক। কাজেই যখন বর্তমান শতকের প্রথম দিকে বিখ্যাত জাপ মনীষী কাউন্ট ওকাকুরা—'এশিয়া এক ও অবিভাজ্য' বলে তত্ত্ব প্রচার শুরু করলেন, অথবা স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা এশিয়ার অন্তর্নিহিত ঐক্যের বাণী শোনালেন, তখন এতত্ত্ব

শোনার মতো মন এশিয়াবাসীর হয়নি, বর্তমানের মতো অনুকূল মানসিক পরিমণ্ডলও গড়ে ওঠেনি। অবশ্য এশিয়া যখন ঘোর তামসিক ভাবাপন্ন,—প্রতি দেশে সামন্ত ও ভৌমিকতন্ত্রের প্রাধান্য, আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোরশ্মি জাতীয় কুসংস্কারের রন্ধ্রপথ ভেদে অক্ষম তেম্‌নি সময়ে বিগত শতাব্দীর প্রথম দু'তিন দশকে রাজা রামমোহন রায় আন্তর্জাতিকতার মহাবাণী প্রচার করে গিয়েছেন; বিভিন্ন সংস্কৃতি সমন্বয়ের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তাঁর এক শতাব্দী কাল পর আর একজন বিশিষ্ট বাঙালী ও ভারতবাসী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ১৯২৫ সালে ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে রাষ্ট্রিক আদর্শ সম্পর্কে Pan-Asiatic Federation বা নিখিল এশিয়া যৌথরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর কল্পরাজ্যে অন্য-নিরপেক্ষ স্বাধীন ভারতের রূপ স্থান পায়নি। তাঁর মতে সকলের সঙ্গে যোগেই ভারতের পুষ্টি, পূর্তি ও বিকাশ সম্ভব,—ভারত এশিয়ার অন্যান্য মুক্তিকাম জাতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাক্‌বে, আর তাদের সহযোগিতায় নিখিল এশিয়া যৌথরাষ্ট্র গড়ে তুলবে। পরবর্তীকালে ভিন্ন উদ্দেশ্যে নেতাজী শ্রীসুভাষচন্দ্র বসুও এশিয়ার জাতি সমূহের সম্মেলন আহ্বানের পরিকল্পনা করেছিলেন। আবার ১৯৪৩-'৪৫ সালে পূর্ব এশিয়ায় জাপ অভিযানের সময় মালয় ব্রহ্ম শ্যামে তাঁর কার্য-কলাপেও সেখানকার ভারতীয় ও পূর্ব-এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটা ঐক্যবোধ গড়ে উঠেছিল, অবশ্য এর ভিত্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা। সর্বোপরি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পালন করে কবিসার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আন্ত-র্জাতিকতার আদর্শ বাস্তবে রূপায়নে প্রয়াসী হয়েছিলেন; তাতেই মহাদেশের সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। কিন্তু এসব উদ্যোগের প্রায় সবটাই ব্যক্তিগত; এদের পেছনে সার্বভৌম কর্তৃত্ব-সম্পন্ন রাষ্ট্রের পোষকতা ছিল না। কাজেই ভারত সরকারের নেতৃত্বে যে এশিয়া সম্মেলন হয়, তা'র মর্যাদা সম্পূর্ণ আলাদা, গুরুত্বও

অনন্যসাধারণ। পরবর্তীকালীন ঘটনাবলীতেই এর ঐতিহাসিক মূল্য নির্ণীত ও স্বীকৃত হয়েছে।

এশিয়া মহা-সম্মেলনের পর পূর্ব এশিয়ার (Far & Near East) পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি ঘটে ; বিশেষ করে কোরিয়ার যুদ্ধ (২৫শে জুন, ১৯৫০—৩০শে জুন '৫১) ও ইন্দোচীনেব নব-পর্যায়ে সংগ্রাম শান্তিকামীদেব পক্ষে বিশেষ শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কোরিয়াকে উপলক্ষ কবে যেমন সারাবিশ্বে (সোবিয়েৎ বনাম ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠী), তেমনি ইন্দোচীনকে কেন্দ্র কবে সাবা এশিয়ায় যুদ্ধের দাবাগ্নি বিস্তারের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে। এই প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতিব অভাব ছিল না ; কিন্তু শান্তিকামী রাষ্ট্র হিসাবে ভাবতেব ভূমিকা অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। কোরিয়াব যুদ্ধবিরতিব ব্যাপাবে বিবোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে ভারতেব দৌত্য ও রাষ্ট্রপুঞ্জে তা'ব প্রচেষ্টা সফল হবাব পব যুদ্ধবিবতিব সর্তানুযায়ী নিযুক্ত নিবপেক্ষ কমিশনের সভাপতিরূপে ভাবতেব কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট সকলেব অভিনন্দন লাভ কবে। এরপব ইন্দোচীনে (১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগে) ডাঃ হো চী মিনেব নেতৃত্ব কম্যুনিষ্ট বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে বিপর্যস্ত ফরাসী ও সম্মিলিত সহযোগী রাষ্ট্রত্রয়ের (কম্বোডিয়া, লাওস ও ভিয়েৎনাম) শোচনীয় দশা উপস্থিত হয়। এতে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের উদ্বেগ বাড়ে। তাদের ধারণা জন্মে, ইন্দোচীনের যুদ্ধ প্রকারান্তরে এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট অগ্রগতির দুর্বার অভিযান। এ-যুদ্ধে যদি হো চী মিনের সেনাবাহিনী জয়ী হয় তা' হলে প্রাচ্যে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী দেশ সমূহে কম্যুনিষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়বে ; তাইল্যাণ্ড, মালয় ও ব্রহ্মের চালু শাসন ব্যবস্থা দুর্বল ও বিপর্যস্ত হবে। কাজেই এক বিরাট ভূখণ্ড জুড়ে সাম্যবাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা বিস্তার লাভ করলে একদিকে কম্যুনিষ্ট চীনের বাহুতে হবে শক্তি সঞ্চার, অন্যদিকে বৃটিশ-মালয়, মার্কিন সাহায্যপুষ্ট তাইল্যাণ্ড, সমাজতন্ত্রী ব্রহ্ম ও সমুদ্রশাসিত ইন্দোনেশীয়

দ্বীপপুঞ্জে কম্যুনিষ্টরা আবার মাথা চাড়া দেবে। কাজেই যে-ব্যবস্থার সম্ভাব্য পরিণাম ফল অশুভজনক, 'গণতন্ত্রের নায়ক' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে উপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করেনি। 'তাই গণতন্ত্রকে নিরাপদ' করার নামে ফ্রান্সকে কোটি কোটি ডলার ঋণ ও অজস্র সমর-সম্ভার দিয়ে তার সাহায্য দান চল্‌তে থাকে; এমনকি ফরাসী সেনাবাহিত মার্কিন বিমান বহু দেশের ওপর দিয়ে চলাচল করতে থাকে। অদৃষ্টের পরিহাসে, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আমেরিকাই ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়া সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এটা ভারত তথা নবজাগ্রত এশিয়ার পক্ষে বিপদ-সংকেত; কারণ যুদ্ধায়োজনজনিত যে যুদ্ধাতঙ্ক মনুষ্য সমাজকে গ্রাস করে বস্‌ছিল, তা এশিয়ার নতুন রাষ্ট্রসমূহের প্রগতির অন্তরায়; তাদের পুনর্গঠন কার্যসূচী রূপায়নের পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। শুধু তাই নয়; এ-যুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে জড়িয়ে পড়বার আশঙ্কাও সমভাবে বর্তমান। এর ফলে এসব রাষ্ট্রকেই কুফলভাগী হতে হবে। এহেন অবস্থায় যুদ্ধকে সর্বাগ্রে সীমাবদ্ধ করা ও পরে সংশ্লিষ্ট দেশকে উপনিবেশ ও সাম্যবাদ উভয়ের প্রভাব হতে মুক্ত করে আপাতত জাতীয়তাবাদকে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। ভারত সরকার এ-উদ্দেশ্যেই ভারতের আকাশে চলাচলকারী ফরাসী সেনাবাহী মার্কিন বিমানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কিন্তু পাকিস্থান ও সিংহল ফরাসী সেনাবাহী মার্কিন বিমানকে নিজ নিজ রাজ্যে ওঠানামার সুযোগ-সুবিধা দেয়। কাজেই এশিয়া সম্মেলনে যোগদানকারী রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিবেশী এ-তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রথমেই নীতিগত বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার পাক-মার্কিন ও ইঙ্গ-সিংহল প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদনে এদের মধ্যে প্রতিরক্ষার ব্যাপারেও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের সূচনা হয়। কিন্তু এ সত্ত্বেও ইন্দোচীনের যুদ্ধকে অবশ্যই সীমায়িত করা, আর সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির আত্মপ্রসারের উদ্যোগ সঙ্কুচিত করা প্রয়োজন। অন্যথা

এশিয়ার বিভিন্ন নতুন রাষ্ট্রের সদ্যোলব্ধ স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, গঠন-মূলক কর্মধারা ব্যাহত হবে ; এশিয়ার বুকে আবার আগুন জ্বলবে। কোরিয়ার যুদ্ধ বন্ধ হলে শুভ ফল লাভের বৃহৎ প্রত্যাশা জেগেছিল ; ইন্দোচীনে নতুন করে যুদ্ধারম্ভে তা' ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়। এম্‌নি পটভূমিকায় সিংহলের রাজধানী কলম্বোতে ২৮শে এপ্রিল হতে ১লা মে পর্যন্ত ৪ দিন স্থায়ী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পঞ্চ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের অনুষ্ঠান। একে বলা হয় কলম্বোশক্তি সম্মেলন।

এশিয়ার এ-সংকটে সিংহলের প্রস্তাব অনুযায়ী ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রিগণ মন্ত্রণার জন্যে মিলিত হন কলম্বোয়। তাঁদের উদ্দেশ্য—এশিয়ার ক্রান্তি মোচনের উপায় নির্ধারণ। আর অন্যের নিকট, বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য বৃহৎ শক্তি-বর্গের দ্বারস্থ হওয়া তাঁদের অনভিপ্রেত ; তবে তাদেব সঙ্গে পাল্লা দেওয়া নয়, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা ও রাষ্ট্রপুঞ্জের সহায়তা করে পৃথিবীতে শান্তি-স্থাপন করাকে তাঁবা নিজেদের লক্ষ্য বলে ঘোষণা কবেন। স্বাভাবিক ভাবেই ভাবতের প্রধান মন্ত্রী এঁদের মুখপাত্র। তবে যুদ্ধবিগ্রহের আশংকার সঙ্গে নতুন অস্ত্র বিশেষত এবার হাই-ড্রোজেন বোমার 'আতংক ঘটায়—সমস্যা নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এর মীমাংসা কী ? এহেতু সম্মেলনের উদ্বোধনকালে শ্রীনেহরু বলেন, 'বর্তমান সময়ে পৃথিবীতে ইন্দোচীনের সমস্যাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।...আমরা প্রস্তাব করেছি, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা ও এ বিষয়ে আরো বিবেচনা করা সম্পর্কে একটা স্থিতাবস্থা চুক্তি স্বাক্ষর করা যেতে পারে। ইন্দোচীন সংক্রান্ত প্রস্তাবে এমন কতগুলো ব্যবস্থার ইংগিত দেওয়া হয়েছে, যা' সমস্যা মীমাংসার সহায়ক। এসব ব্যবস্থা আমাদের দ্বারা নয়—সংশ্লিষ্ট দেশগুলো কর্তৃক অবলম্বনের জন্যেই প্রস্তাব করা হয়েছে।...তবে আমরা বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নির্বিরোধ সম্পর্ক রক্ষা করতে যত্ন করেছি। আমরা কারু সঙ্গে বিবাদ করতে কিংবা পুরাণো বিরোধ ও ঘৃণা জিইয়ে

রাখতে চাই না।...বহু দুঃখ-দুর্ভোগের পর আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ; তা' রক্ষার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের প্রবল। আমরা আমাদের স্বাধীনতার পরিধি বিস্তার করতে চাই ; এর অর্থ এই যে, আমাদের জনগণের অবস্থার উন্নতি করে, আর তাদের বৈষয়িক ও অন্যান্য উন্নতি করে আমরা আমাদের স্বাধীনতা দৃঢ়ভিত্তিক করতে চাই। এহেতু বর্তমান বিশ্ব-পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শান্তি রক্ষার জন্য আমাদের আগ্রহ এতো বেশি। এশিয়া অতি প্রাচীন হলেও অধুনা বিশ্বে নতুন ভাবধারা সৃষ্টি করেছে। এ-বিশ্বকে আমরা ভাল-ভাবেই জানি। অতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলো বিরোধের ফলে সমভাবে স্নায়ুযুদ্ধে পীড়িত। তবে আমরা এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আমদানী করেছি ; এটাই আমার ধারণা ও বিশ্বাস।'

পৃথিবীর মানসিক পরিমণ্ডল আচ্ছন্ন ; সকলে যুদ্ধভীত, শংকিত। কিন্তু শান্তি এশিয়ার জীবন-মরণ সমস্যা ; যেহেতু অবসর ও সুযোগ না থাকলে সে শক্তিমান ও সম্পদশালী হতে পারবে না। কাজেই গান্ধি-শিষ্য নেহরুর কণ্ঠে এশিয়ার শান্তিবাণী। কাণ্ডীতে প্রদত্ত মেয়রের ভোজসভায় তিনি বল্লেন, "প্রত্যেক দেশের মানুষের একান্ত কামনা, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হোক।" কিন্তু শান্তি স্থাপনের কথা বলা যত সহজ, কাজ তত নয়। এমনকি নানা স্বার্থ-বিড়ম্বিত প্রতিবেশী রাষ্ট্রও যখন অন্যের স্বার্থবাহ বা আজ্ঞাবহে পরিণত হয় তখন তো এ কাজ নিতান্তই দুঃসাধ্য। কলম্বো সম্মেলনের সময়ও এরূপ অবস্থারই উদ্ভব ঘটে। পাকিস্থান আমেরিকার সঙ্গে তখন সদ্য প্রতিরক্ষা চুক্তিতে আবদ্ধ ;—এহেতু হয়ত তা'র একটা বাধ্য-বাধকতা বর্তমান। কাজেই সম্মেলনের প্রারম্ভেই তার তরফ হতে কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপনে আলোচনায় অন্তরায় সৃষ্টি হয় ; আবার ইন্দোচীন সম্পর্কিত প্রস্তাবে সে নীতিগত ভাবে অসম্মত হয়। প্রস্তাব করা হয়েছিল যে শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি, অবিলম্বে যুদ্ধ-বিরতি ও যথাশীঘ্র ইন্দোচীনের স্বাধীনতা ঘোষণা করা প্রয়োজন।

তবে শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধিই জয়ী হয়; সম্মেলনে উত্থাপিত সকল প্রশ্নেই মতৈক্য হয়। বৈঠক অন্তে প্রকাশিত ইস্তাহারে—(১) ইন্দোচীন সমস্যার মীমাংসাকল্পে আশু যুদ্ধ বন্ধের ও এপ্রশ্নের সঙ্গে জড়িত পক্ষগুলোর মধ্যে সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করতে আবেদন জানান হয়; (২) হাইড্রোজেন বোমা ও অন্যান্য আণবিক অস্ত্রের প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে এবং অন্য চুক্তি সম্পাদন-সাপেক্ষ কোন বিস্ফোরণ ঘটান অনুচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করা হয়; তা' ছাড়া, এসব অস্ত্রের প্রলয়ঙ্কর ক্ষমতা ও সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করতে রাষ্ট্রপুঞ্জ ও সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুরোধ করা হয়; (৩) রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিনিধিত্ব এশিয়ার সংহতি তথা বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমন ও দূর প্রাচ্যে সমস্যা সমাধানের সহায়ক বলে মত প্রকাশ করা হয়; (৪) ঔপনিবেশিক শাসন বিশ্বশান্তির হন্তারক ও মানুষের মৌলিক অধিকাব নাশক বলে নিন্দা করা হয়; (৫) তিউনিসিয়া ও মরক্কোর স্বাধীনতার দাবী স্বীকার করা ও তাদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া উচিত বলে মত ব্যক্ত কবা হয় এবং (৬) গণতন্ত্রে আস্থা ব্যক্ত কবে নিজ নিজ দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে বাইরের কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট অথবা অন্যান্য শক্তির হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। এ সঙ্গে ইন্দোচীন সম্পর্কে গৃহীত প্রস্তাবের নকল তৎকালীন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ অ্যাণ্টনী ইডেনের নিকট পাঠান হয়। পরবর্তীকালে এ ব্যবস্থার বিজ্ঞতা প্রমাণিত হয়। কারণ কলম্বো সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে ২৬শে এপ্রিল জেনেভায় কোরিয়া ও ইন্দোচীন সম্পর্কে যে বৈঠক আরম্ভ হয়, তা'তে মিঃ ইডেনের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। জেনেভা বৈঠকের স্থায়িত্বকাল প্রায় আড়াই মাস; বৈঠক শেষ হয় ২১শে জুলাই ('৫৪ সাল)। এ সময় ইন্দোচীন সমস্যার অচলাবস্থা অবসান ঘটাবার ব্যাপারে মিঃ ইডেন এবং ভারতের ভ্রাম্যমাণ দূত শ্রীকৃষ্ণ মেননের দৌত্য ও প্রচেষ্টা উল্লেখযোগ্য। বৈঠকে ভারতের

অনুপ্রেরণায় এবং ইডেন-মেনন যৌথ উদ্যোগে ইন্দোচীনে ২০শে জুলাই ('৫৪) শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তা'তে নিম্নোক্ত চারটি মূল বিষয় সন্নিবিষ্ট হয় যথা, (১) ভিয়েৎনাম হতে লাওসগামী মূল সড়কের ১২॥ মাইল উত্তর বরাবর যুদ্ধবিরতির সীমারেখা নির্দিষ্ট হবে ; (২) দশ মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের সেনাদলকে নিজ নিজ এলাকায় সরিয়ে নিতে হবে ; (৩) দু' বছর শেষ হবার আগেই নির্বাচন শেষ করতে হবে ও (৪) ভারত, পোল্যাণ্ড ও কানাডাকে নিয়ে আন্তর্জাতিক যুদ্ধবিরতি কমিশন গঠিত হবে এবং ভারত কমিশনের সভাপতি পদে বৃত হবে।

লক্ষ্যের বিষয়. জেনেভা বৈঠকের উদ্বোধন কালে ১৯টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকলেও শেষ পর্যন্ত মাত্র ৯টি রাষ্ট্র ইন্দোচীনে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে ; আর এতে চীনের প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ চৌ এন্ লাইকে আমন্ত্রণ করতে হয়। এক্ষেত্রেও ভারতের প্রভাব ক্রিয়াশীল ছিল। কাজেই কলম্বো সম্মেলন কার্যত জেনেভা বৈঠকেরই পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। ভারত শুধু এশিয়ার মুখপাত্ররূপেই নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনের মতো বৃহৎ ব্যাপারেও তার পরামর্শ মূল্যবান বলে গ্রাহ্য ও স্বীকৃত হয়। এসব বৃহৎ প্রশ্ন মীমাংসার সফলতা বা বিফলতা তার মতামতের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল হয়ে পড়তে থাকে। কাজেই ধাপে ধাপে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার খ্যাতি ও মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠ হয়।

ইতিমধ্যে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় ভারতের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির নতুন রূপান্তর ঘটে। এটা হলো ভারত-তিব্বত বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক চুক্তি। ১৯৫৪ সালের ২৯শে এপ্রিল দিল্লী হতে এক ঘোষণায় বলা হয় যে আজ পিকিং-এ ভারত ও চীন আট বছর মেয়াদী চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। তবে ঐ চুক্তি সম্পাদনের আগে চার মাসকাল উভয় পক্ষের মধ্যে এ বিষয়ে আলাপ আলোচনা চলে। এর ফলে ভারত তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌম অধিকার

পুরাপুরি স্বীকার করে নেয়। এ-স্বীকৃতিরই অনুপূরক হিসেবে তিব্বত হতে ভারতীয় সামরিক প্রহরী, ডাক ও তার অফিস সরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়। তবে চুক্তি অনুযায়ী যাতুং, জ্ঞানৎসে ও গ্যাংটকে তিনটি ভারতীয় বাণিজ্য সংস্থা রাখার এবং বদলে দিল্লী, কলকাতা ও কালিম্পং-এ চীনের বাণিজ্য দূতাবাস রাখা বিহিত হয়। আবার ভারত ও তিব্বতের মধ্যে যাতায়াত আন্তর্জাতিক প্রবেশপত্র (ভিসা) দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা হলেও দু' অঞ্চলে বাণিজ্যে ব্যাপৃত ব্যক্তি, সীমান্ত জেলাবাসী, তীর্থযাত্রী, কুলী ও অশ্বেতর দলের চালকগণের বেলায় নিয়মকানুন কিছুটা শিথিল করার ব্যবস্থা হয়। এর ফলে তিব্বতের সঙ্গে ভারতের বিগত ৫০ বছর কাল স্থায়ী স্থিতাবস্থার অবসান ঘটে। কারণ, চীনে কম্যুনিষ্ট আধিপত্য স্থাপনের আগে তিব্বতের ওপর চীনের কোন প্রত্যক্ষ শাসন ছিল না। বরং পররাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক চুক্তি সম্পাদনে তিব্বতের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা ছিল; শুধু এক্ষেত্রে চীনের অধিরাজক ক্ষমতার নামোল্লেখ ও স্বীকৃতিমাত্র থাকত। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে বৃটিশ-ভারত ও বৃটেনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক এ ব্যাপারে দৃষ্টান্ত-স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। এ চুক্তি স্বাক্ষর উপলক্ষে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে উক্তি করেন, তা স্মরণীয়। তিনি বলেন যে এতে করে অনাক্রমণ, আঞ্চলিক সংহতি ও সার্বভৌম অধিকার স্বীকৃত এবং কারু ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসৃত হয়েছে। এ দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশ অনুসরণ করলে বিশ্বের বহু জটিল সমস্যার মীমাংসা হতে পারে। চুক্তির ফলে দুটো প্রতিবেশী রাষ্ট্র শান্তি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে বাস করবে, আর এশিয়ার একাংশে শান্তি রক্ষা বহুলাংশে সুনিশ্চিত হবে। তিনি আশা করেন যে, শান্তির এলাকা ক্রমপ্রসারিত হয়ে সমগ্র এশিয়া তথা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হবে।

জেনেভা হতে চীন প্রত্যাবর্তনের পথে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর

আমন্ত্রণে মিঃ চৌ এন লাই ২৫শে জুন ('৫৪) নয়াদিল্লী এলেন। এ-আমন্ত্রণ আদৌ সামাজিক ব্যাপার নয়; এর রাজনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তখন ঘোর দুর্দিন; জেনেভায় কোরিয়ার অচলাবস্থার অবসান ঘটাবার ও ইন্দোচীন সমস্যা মেটাবার আয়োজন হয়েছিল। মিঃ চৌ এন লাই জেনেভা গিয়েছিলেন এ সব সমস্যা মীমাংসায় সহায়তা করতে। আন্তর্জাতিক বৈঠকে তাঁর এটাই প্রথম আমন্ত্রণ; কারণ কম্যুনিষ্ট চীনকে জাতে উঠাবার যত চেষ্টা অর্থাৎ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য করবার প্রয়াস যতবার ভারতের তরফ হতে হয়েছে, ততবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগোষ্ঠি তার ঘোর বিরোধিতা করেছে। কিন্তু অবস্থার চাপে সেই কম্যুনিষ্ট চীনকে যখন জেনেভা বৈঠকে আমন্ত্রণ করা হয়, তখন তার অর্থ, এশিয়ার ব্যাপারে কম্যুনিষ্ট চীন আর উপেক্ষণীয় নয়।

কাজেই এটা তাদের মনোভাব পরিবর্তনের লক্ষণ মাত্র। কিন্তু এতদিন যে বিশ্ব-দরবারে অপাংক্তেয় ছিল, তাকে জাতে তুলতে বাধবাধ ঠেকেছে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, ভ্রান্ত মর্যাদাবোধই এক্ষেত্রে অন্তরায়; তাই খোলাখুলি তাদের পক্ষে চীনকে একবারে স্বীকার করে নেয়া অসম্ভব। আবার অন্যদিকে তাদের চক্ষুলজ্জাও রয়েছে— ফরমোজায় যে-চিয়াং কাইশেককে চীনাধিপতিরূপে বসিয়ে লোক-দেখানো অভিনয় চলেছে, তারও তো একটা সুরাহা প্রয়োজন। তাই ১৯৫৬ সালের জুলাই পর্যন্তও প্রজাতন্ত্রী চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য হতে দেয়া হয়নি। কিন্তু ভারতের অবস্থা স্বতন্ত্র। বিশ্ব রাজনীতিতে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই, ভুয়া মর্যাদার বালাইও নেই। কিন্তু নিজের ও অন্যের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও মর্যাদা সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট। আবার প্রতিবেশী রাষ্ট্ররূপে চীনের অসাধারণ গুরুত্ব সম্পর্কেও ভারত যথেষ্ট অবহিত। পক্ষান্তরে যে-রাষ্ট্র তার প্রজাপুঞ্জের সমর্থন-পুষ্ট, লোকবলে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ, যার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অপরিমেয়, তার অভ্যুদয়কে প্রথমাবধি স্বাগত জানিয়ে ভারত দূরদর্শিতা

দেখিয়েছে। শুধু তা-ই নয়। বিশ্বসভায় তাকে তার যথাযোগ্য আসনে সুপ্রতিষ্ঠ করার ব্যাপারে তার (ভারতের) চেষ্টার বিরাম নেই। এদিক হতে প্রথম ধাপ হিসেবে তিব্বতের ব্যাপারে ভারত-চীন চুক্তি চীনের সার্বভৌমত্বেরই স্বীকৃতি। সুতরাং ভারতে চীনের প্রধান মন্ত্রীর শুভাগমন বিশেষ তাৎপর্যবোধক; এটা কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পট-পরিবর্তন, নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। যেহেতু তাঁর ভারত-দর্শনের উদ্দেশ্য— এশিয়ায় শান্তি স্থাপনের উপযোগী নয়া কর্মনীতি উদ্ভাবন, শান্তি-এলাকার সম্প্রসারণ। অর্থাৎ পরোক্ষে বিশ্ব-শান্তির সহায়তা।

নেহরু-চৌবৈঠক সম্পর্কে ২৭শে জুন (১৯৫৪) চীনা প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই নিম্নোক্ত ঘোষণা করেন: "আলোচনা এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত করবার সহায়ক হবে। * * * সদ্য-সম্পাদিত চীন-ভারত চুক্তির পটভূমিকায় সন্নিবিষ্ট পাঁচটি নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের ছোটবড সবল দুর্বল সকল রাষ্ট্রই পাশাপাশি অবস্থান করতে পারে—এ সব রাষ্ট্রের সমাজ ব্যবস্থা যা-ই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। এ নীতি হলো—(১) পারস্পরিক আঞ্চলিক সংহতি ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আস্থা; (২) অনাক্রমণ; (৩) অপরের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা (৪) পারস্পরিক কল্যাণ সাধন (৫) শান্তি-পূর্ণ সহাবস্থান।" এর পরদিন সাতশ' শব্দ সম্বলিত নেহরু-চৌ বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় যে পরপ্রভাবমুক্ত গণতন্ত্রী ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইন্দোচীনের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ-রাষ্ট্র কোনক্রমে পররাষ্ট্র আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত হতে পারবে না অথবা এতে কোন বৈদেশিক হস্তক্ষেপ চলবে না। এ-ব্যবস্থায় সবদেশে আত্মবিশ্বাসের ভাব দেখা দেবে ও প্রতিবেশীদের সঙ্গে সৌহার্দ বাড়বে। জেনেভা বৈঠকের সাফল্য কামনা করে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে বৈঠকের আলোচনায় সহায়তা করার জন্যেই উভয় নেতার মধ্যে বৈঠকের অনুষ্ঠান। তিব্বত সংক্রান্ত চুক্তিতে ভারত ও চীন যেসব

নীতি স্বীকার করেছে, সেসব পুনরায় সমর্থন করে বলা হয় যে এগুলো মেনে চললে ভিন্ন কোন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না। ইন্দোচীনের ক্ষেত্রে এ-নীতি বিশেষ-ভাবে প্রযোজ্য। এর পর বলা হয় যে চীন-ভারত মৈত্রী বিশ্বশান্তির সহায়ক; এ মৈত্রী ভারত তথা এশিয়ার সকল দেশকে নিরুপদ্রব আত্মবিকাশে সাহায্য করবে। কাজেই উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজন অশেষ। আর চীন-ভারত ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে শান্তি রক্ষায় যাতে সাহায্য করা যায়, সেজন্য উভয় রাষ্ট্রের অভিমত স্পষ্টাস্পষ্টি অবগত হওয়াই প্রধান মন্ত্রী চু'ভ্নার উদ্দেশ্য। তিব্বত সম্পর্কে ভারত-চীন চুক্তিতে নিম্নোক্ত পঞ্চনীতি সন্নিবিষ্ট ও স্বীকৃত হয় যথা (ক) পারস্পরিক আঞ্চলিক সংহতি ও সার্বভৌমত্বের ওপর আস্থা (খ) অনাক্রমণ (গ) কারুর ঘরোয়া ব্যাপারে অনধিকার চর্চা না করা (ঘ) সমানাধিকার ও পারস্পরিক কল্যাণ সাধন এবং (ঙ) পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস। তাঁরা স্বীকার করেন যে এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক সংগঠনে পার্থক্য বিদ্যমান। কিন্তু পূর্বোল্লিখিত নীতিগুলো মেনে নিয়ে কাজ করা হলে এ-প্রভেদ কখনো শান্তিরক্ষার অন্তরায় হতে পারে না, কিংবা এতে বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে না। প্রত্যেক দেশের আঞ্চলিক সংহতি, সার্বভৌমত্ব ও অনাক্রমণ সম্পর্কে যদি নিশ্চয়তা থাকে তা'হলে সংশ্লিষ্ট সকল দেশের নিরুপদ্রবে সহাবস্থান ও পরস্পরের মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব। এর ফলে পৃথিবীতে উত্তেজনা কম্‌বে ও এ-ব্যবস্থা নিরুত্তেজক পরিমণ্ডল রচনায় সহায়ক হবে।

সাংবাদিক বৈঠকে মিঃ লাই এ সম্পর্কে বল্লেন: "প্রত্যেক জাতির জনগণের জাতীয় স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সম্মান করতে হবে। প্রত্যেক রাষ্ট্র তার সংবিধান ও সামাজিক জীবন নিজ ইচ্ছানুযায়ী গড়ে তুলবে, তাতে অন্যের হস্তক্ষেপ

চলবে না। বিপ্লব রপ্তানীযোগ্য পণ্য নয়; তেমনি কোন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে অনধিকার চর্চাও বাঞ্ছনীয় নয়।" এ ঘোষণার অর্থ অতি সরল, অতি প্রাঞ্জল। এতে কূটনীতি নেই, দর কষাকষি নেই, কল্পিত আত্মরক্ষার তাগিদে সামরিক চুক্তির কথা নেই। এতে শুধু রয়েছে শান্তি, শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক কল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়। অর্থাৎ পৃথিবীতে এতকাল কূটনীতি যে ছকবাঁধা পথে চলেছে, নেহরু-চৌ ঘোষণা তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক অভিনব পরিকল্পনা। এ যেন নতুন জগতের সন্ধান। আধুনিক রাজনীতিক পরিভাষায় এর নাম 'পঞ্চশীল',—আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নতুন আচরণ বিধি, নয়া অবদান।

কলম্বোয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের পর ৬ই এপ্রিল (৫৫) নয়া দিল্লীতে একটি অদলীয় ও বে-সরকারী এশিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। এতে জাপান সহ ১৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের দাবি,—তাঁরা নিজ নিজ দেশের বিভিন্ন সংস্থা ও জনমতের প্রতিনিধি। সম্মেলনের সভানেতৃত্ব করেন শ্রীমতী রামেশ্বরী নেহরু। তিনি ভারতের নারী সমাজের অন্যতম প্রতিনিধি-স্থানীয়া ও সুপরিচিত কংগ্রেসনেত্রী। কাজেই সম্মেলনের সঙ্গে সরকারী যোগ না থাকলেও এর মর্যাদা ও প্রভাব নেহাৎ কম নয়। অন্ততঃ বেসরকারী দিক হতে তো নয়ই। দূর দূরান্তের ১৪টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিই তার প্রমাণ। তা'ছাড়া, এশিয়া মহাদেশে পঞ্চশীলের নীতি যে চতুর্দিকে রাষ্ট্রিক ও জাতীয় ভিত্তিতে ক্রমশ অনুমোদিত হচ্ছিল, এ সব সভাসমিতি তারই বার্তাবহ। সম্মেলনে সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত হলো: পঞ্চশীল এশিয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার সনদ। এতে অনুরোধ করা হলো, এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ যেন এ-নীতির ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। আর আসন্ন বান্দুং সম্মেলনের সাফল্য কামনাও প্রস্তাবে করা হলো। আবার অন্যান্য প্রস্তাবে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ বৈষম্য আইন লঙ্ঘনকারীদের অভিনন্দন, উপনিবেশবাদ ও আধা-উপনিবেশবাদের নিন্দে করে

তিউনিসিয়া ও মরক্কোবাসীদের সংগ্রামে সহানুভূতি ও মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ, ইস্রায়েল ও তুরস্কের মাধ্যমে আরব রাষ্ট্রসমূহকে পাশ্চাত্ত্য শক্তিজোটে যোগ দেওয়ার জন্যে চাপ দেয়ার নিন্দা, আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা, বীজাণুযুদ্ধ ও রাসায়ণিক অস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধের দাবি এবং পূর্ব এশিয়ার অশান্তি প্রশমনের অন্যতম উপায়রূপে কম্যুনিষ্ট চীনকে নিরাপত্তা পরিষদে গ্রহণের অনুরোধ করা হয়। সংক্ষেপে বলা চলে, বর্তমান জগতে অশান্তির বিষয়ীভূত সকল হেতুর মূলোচ্ছেদেই সম্মেলনের আগ্রহ প্রকাশ পায়।

১৮ই এপ্রিল ('৫৫) এশিয়া তথা পৃথিবীর কূটনৈতিক ইতিহাসে লাল অক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। কারণ এই দিনটিতে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং সহরে যে মহাসম্মেলন আরম্ভ হয়, পরবর্তীকালে জগতের রাজনৈতিক আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তার প্রভাব অপ্রতিহত। এদিক হতে বিবেচনায় এ-সম্মেলন নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী। তবে কলম্বো শক্তি অর্থাৎ ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়া কর্তৃক সম্মেলন আহূত হয়; এতে যোগ দেয় এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রিগণ। আমন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শুধু মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন ছিল এতে অনুপস্থিত। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ এর উদ্বোধক ও তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আলী শাস্ত্রমিদজোজো করেন পৌরোহিত্য। সংক্ষেপে সম্মেলনের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ যথা ঃ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে শুভেচ্ছা ও সহযোগিতার মনোভাব বৃদ্ধি, সমস্বার্থ নির্ণয়, প্রতিবেশীসুলভ ও মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন, যোগদানকারী দেশসমূহের সামাজিক বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা আলোচনা, জাতীয় সার্বভৌমত্ব, জাতি ও বর্ণবৈষম্য সম্পর্কে এশিয়া-আফ্রিকা জনগণের বিশেষ সমস্যা পর্যালোচনা এবং বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বৃদ্ধির ব্যাপারে দুই মহাদেশের কর্তব্য নির্ধারণ। ১৫ই এপ্রিল দিল্লী হতে শ্রীনেহরু বান্দুং যাত্রার প্রাক্কালে ঘোষণা করলেন—"বান্দুং এশিয়ার নবচেতনা ও নব দ্যোতনার উৎস।

এশিয়ার এ নবজাগরণে যুগধর্ম রূপ পরিগ্রহ করছে।...এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বে একটা পারস্পরিক সহযোগিতার সুস্থ শান্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা, আর অখণ্ড বিশ্ব-গঠনের অনুভূতিকে রূপায়িত করার প্রয়াসে সহায়তা করা এ-সম্মেলনের উদ্দেশ্য।"

১৪০ কোটি লোকের প্রতিনিধিস্থানীয় ২৯টি রাষ্ট্রের মুখপাত্রদের যোগদানে সম্মানিত এশিয়া-আফ্রিকা অথবা বান্দুং মহাসম্মেলনের সাতদিন স্থায়ী অধিবেশনের উদ্বোধন করে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বললেন, "এ-সম্মেলন সৌভ্রাতৃ সম্মেলন। যদি এশিয়া-আফ্রিকার জাতিগুলো শান্তি ও সামঞ্জস্য বিধানেব মধ্যে 'বাঁচ ও বাঁচতে দাও' নীতিকে মেনে নেয় তা' হলে বিশ্বের মহাকল্যাণ হবে। এ ব্যর্থতার অর্থ, আলোব অভাব; বুঝতে হবে, মানব জাতি আলোর কল্যাণস্পর্শ লাভ করার আগেই ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি আকাশ ছেয়ে ফেলেছে।" এর পর তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে বললেন, "পৃথিবী হতে উপনিবেশবাদের মৃত্যু হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকার বিরাট অঞ্চল এখনো পরাধীন। উপনিবেশবাদ চতুর, শত্রুও কঠোর। এর আবির্ভাব বহুরূপে। একে পৃথিবী হতে অবশ্যই উৎখাত করতে হবে।" এ সঙ্গে তিনি ১৯৪৯ সালে নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়া সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়াব ঘোর বিপদে ভারত যে-সাহায্য করেছিল, তিনি কৃতজ্ঞচিত্তে তার উল্লেখ করতে ভোলেন নি। সম্মেলনের সভাপতিরূপে ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ডাঃ আলী শাস্ত্রমিদজোজো বললেন,—"পৃথিবী আজ নবযুগের অভ্যুদয়ের পথে উপস্থিত। আণবিক বিজ্ঞান পৃথিবীকে এক বিরাট প্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মনে হয়, মানুষ স্বীয় প্রতিভাবলে অর্জিত এ-পরিবর্তনের জন্যে নীতিধর্মের দিক হতে প্রস্তুত হয়ে ওঠেনি। এক নতুন আদর্শ ও ভাবধারা নিয়ে আণবিক যুগকে স্বাগত জানাতে হবে। এক সর্বজনীন নীতিধর্মকে আশ্রয় করে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।"

বান্দুং সম্মেলনে নবীন চীনের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়ার অন্যতম প্রধান রাষ্ট্ররূপেই শুধু নয়, কূটনীতির দিক থেকেও তা'র প্রধান মন্ত্রীর ঘোষণাবলী বিশ্বে রীতিমতো চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ১৯শে এপ্রিলের বৈঠকে তিনি বলেন, "আমরা এশিয়া-আফ্রিকার জাতিসমূহ নিজেদের ভেতর মিলনের সূত্র খুঁজে নোব। আদর্শগত বৈষম্য সত্ত্বেও আমাদের ঐক্যবদ্ধ হবার পথে যেন কোন অন্তরায় না থাকে। আমরা ঐক্যের সূত্র অনুসন্ধানে এসেছি, বৈষম্য সৃষ্টি করতে আসিনি। তবে প্রশ্ন এই: ঐক্য খুঁজে বের করা সম্ভব কি না। আমি বলবো—হাঁ, নিশ্চয়ই। পরশাসনের অভিশাপ ও দুর্গতি মোচনে আমাদের সংকল্পই সকলের ভেতর মিলনের সেতু রচনা করবে।...উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে চীনের জনগণ শতাব্দী কালেরও বেশি সময় সংগ্রাম করেছে। তারাই চীনের বিপ্লবকে সার্থক করে তুলেছে। বিপ্লব-বিরোধীরাও একথা অস্বীকার করতে পারবে না। আমরা চাই না, বাইরের কেউ আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। এ-অবস্থায় আমরাই বা অপরের ব্যাপারে কেন হস্তক্ষেপ করবো? চীনের চারদিকে কোন যবনিকা রচনা করা হয়নি। উপস্থিত প্রতিনিধিরা যেকোন সময় চীন পরিদর্শনে গেলে আমরা আনন্দিত হবো। কিন্তু আমাদের চারদিকে ধূম্রজাল সৃষ্টি করছে, এমন লোকেরও অভাব নেই।" পঞ্চশীল নীতির প্রতি চীনের নিষ্ঠার পুনরুক্তি করে তিনি বলেন, "পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সাথে পঞ্চশীল মেনে চলার ভিত্তিতে আমরা এশিয়া-আফ্রিকার সকল দেশ, বিশেষ করে আমাদের প্রতিবেশী সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহশীল। * * * প্রতিবেশী রাষ্ট্রে অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ চালাবার অথবা অনিষ্ট সাধনের বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমাদের নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের দেশে নাশকতা করে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে।" এর পরদিন অর্থাৎ ২০শে এপ্রিল চীন ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রী—এ দু'জনার

মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এক গুরুতর আন্তর্জাতিক প্রশ্নের মীমাংসা হয়। তাঁদের ভেতর চুক্তি হলো: ইন্দোনেশিয়ার অধিপ্রবাসী ২৫ লক্ষ চীনাকে নিজেদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে এক বছরের মধ্যে মনঃস্থির করতে হবে। দ্বিজাতিত্ব ও ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি গোপন মমতা ও আনুগত্য অবসানের এ-ব্যবস্থায় এশিয়া তথা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসকারী অন্য রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু প্রজা-সমস্যা মীমাংসার মূলসূত্র নিহিত। এতে অধিপ্রবাসী চীনাদিগকে হয় ইন্দোনেশীয় নাগরিকত্ব বরণ করে সে-দেশের জনদেহে চিরকালের জন্য লীন হয়ে যেতে হবে, নয় বিদেশীরূপে বসবাস করতে হবে। কাজেই সুযোগমত কখনো নিজেদের চীনা, কখনো বা ইন্দোনেশীয় বলে আইনকে ও রাষ্ট্রকে ফাঁকি দেওয়া চলবে না, কিংবা বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে উভয় রাষ্ট্রের ভেতর মন কষাকষির হেতু হওয়া যাবে না। এরূপ অবস্থায় অন্তর্দ্রোহিতা ও জাতীয় সংহতি নাশের এই মূল ব্যাধি দূর করার ব্যবস্থা শুধু চীন বা ইন্দোনেশিয়ার স্বার্থেই অত্যাবশ্যক নয়, সম্মেলনে যোগদানকারী এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশের স্বার্থেরও পোষক বটে। বিশেষ করে ভারত এ-সমস্যায় কিছুটা বিব্রত। দক্ষিণ আফ্রিকা, পূর্ব আফ্রিকা, সিংহল, ব্রহ্ম, মালয় অথবা অন্যান্য বৃটিশ উপনিবেশের ভারতীয় বাসিন্দাকে নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে ভারতকে একটা বিশেষ মনোভাব অবলম্বন করতে হয়েছে; এ বিষয়ে অধিপ্রবাসী ভারতীয়দের যুক্তিসঙ্গত পরামর্শ দেবার জরুরী প্রয়োজনও তা'র হয়েছিল ও এখনো হচ্ছে; অবশ্য পীড়াদায়ক এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি এখনো হয়নি। দৃষ্টান্ত সিংহল, দৃষ্টান্ত দক্ষিণ আফ্রিকা। তবে না হবার হেতু শুধু ভারতীয়রাই নয়, এ সমস্যা জিইয়ে রাখার জন্যে সংশ্লিষ্ট দেশের ক্ষমতাভোগী দলও দায়ী। কাজেই যে-সমস্যায় নিজেরা পীড়িত, তারই অনুরূপ চীনাদের সমস্যা সমাধানে ভারতের পক্ষে অগ্রণী হয়ে প্রভাব বিস্তার করা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

২৩শে এপ্রিল চৌ এন্ লাই এক চাঞ্চল্যকর ঘোষণা করলেন। ঘোষণাটি এক হিসেবে সম্মেলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুফল বলে গণনীয়। তিনি বললেন: "চীনারা মার্কিন জনসাধারণের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের বিরোধী। চীন প্রাচ্যের, বিশেষ করে ফরমোজা এলাকার উত্তেজনা দূর করার জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় রাজি।" প্রকাশ্যে রাষ্ট্র করার আগেও প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এ-ঘোষণার বিষয় জানতেন; অর্থাৎ চৌ এন্ লাই এ বিষয়ে নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে থাকবেন। যা' হোক, এ-তে মার্কিন সরকারী মহলে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়। যেহেতু নবীন চীনের আন্তরিকতায় তারা সন্ধিহান। তাই বলা হলো: সংবাদ আশাজনক। কিন্তু সদুদ্দেশ্যে প্রমাণ করতে হবে। ফরমোজা এলাকায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, চীনে বন্দী ও দণ্ডিত মার্কিন বৈমানিকদের মুক্তিদান ও ফরমোজায় যুদ্ধ বন্ধের জন্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রস্তাবে সম্মত হতে হবে। চীন অবশ্য যুদ্ধ বন্ধের ঘোষণাতেই ক্ষান্ত থাকে নি। ২৩শে এপ্রিল তারিখেই সম্মেলনের রাজনৈতিক কমিটিতে চৌ এন্ লাই আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘোষণা করলেন। এ-ঘোষণা অবশ্য পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রজোট, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ। চীনের কার্যকলাপ সম্পর্কে আমেরিকার মনে কারণে অকারণে যেসব সন্দেহ পুঞ্জিত হয়েছিল, তা' দূর করে একটা সুস্থ ও স্বচ্ছ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করাই এর আসল উদ্দেশ্য। তিনি বললেন: চীন ভিন্ন রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে অনধিকারচর্চা করতে অনিচ্ছুক। চীনারা যদি ভুল করে প্রতিবেশীর সীমানা লঙ্ঘন করে, তাদের ফিরিয়ে আনা হবে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীন মিত্রতা স্থাপনে উৎসুক। যারা চীনের এ-প্রচেষ্টার সহায়ক হবে, তাদেরই চীন সমর্থন করবে।" আবার চীনের অভিসন্ধি সম্পর্কে শত্রুমিত্র সকলকে নিঃসন্দেহ করার উদ্দেশ্যে চীনের দক্ষিণ সীমান্তবর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্র তাইল্যাণ্ড, লাওস ও ব্রহ্মের

প্রতিনিধিগণকে চীন সীমান্ত পরিদর্শনের জন্যে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে চীনের আন্তরিকতা প্রমাণ করতে তিনি ঘোষণা করলেন: "পররাজ্য আক্রমণে চীনের কোন অভিসন্ধি নেই; নিজ এলাকা সম্প্রসারণেব অভিলাষও তার নেই। কাজেই এ বিষযে চীনেব প্রস্তাব সাতটি যথা—(১) এশিয়া-আফ্রিকাবাসীদের পারস্পবিক ও সাধারণ স্বার্থেব উন্নতি, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার প্রতি যথোচিত মর্যাদা প্রকাশের ভিত্তিতে শান্তি ও সহযোগিতাব মনোভাব নিয়ে এক সঙ্গে বসবাসেব সঙ্কল্পবদ্ধ হতে হবে; (২) কারুব বিরুদ্ধে আক্রমণ চালানো যাবে না অথবা হুমকি দেওয়া চলবে না; (৩) অন্যের ঘবোয়া ব্যাপাবে হস্তক্ষেপে বিরত থাকতে হবে; (৪) বর্ণসাম্য স্বীকার করতে হবে; (৫) ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমঅধিকাবেব নীতি মানতে হবে; (৬) সকল রাষ্ট্রেব জনগণের জীবনযাত্রা প্রণালী, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি নির্ধাবণেব অধিকার স্বীকার করতে হবে ও (৭) পবস্পরেব ক্ষতিসাধন হতে নিবৃত্ত থাকতে হবে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মনোমালিন্য দূর করা অথবা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য করণীয় সব কিছু কবা বা সমর্থন করা হবে। তবে বড বড আন্তর্জাতিক সংস্থায় চীনকে বহু দুর্গতি ভোগ করতে হয়েছে। তাই সতর্কতা তার পক্ষে প্রয়োজন। কিন্তু চীন সামবিক জোটেব বিরোধী; উত্তর (NATO) অন্তলান্তিক চুক্তি সংস্থা অথবা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থার (SEATO or SEADO) ন্যায় সর্বপ্রকার সামরিক গোষ্ঠি গঠন কিছুতেই সমর্থনীয় নয়। যদি এ-চেষ্টা চলে, চীনও অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করতে বাধ্য হবে। এর নির্গলিতার্থ এই: পঞ্চশীলের ভিত্তিতে সহাবস্থান নীতিতে চীন বিশ্বাসী। কিন্তু জোট বেঁধে ভয় দেখালে সেও জোট বাঁধবে। ইট মারলে পাটকেলটি খেতে হবে।

বলাবাহুল্য, বান্দুং সম্মেলন অত সহজে সফল হয়নি। এর

ভিত্‌ও বার কয়েক চিড় খেয়েছে ; ঐক্যতানেও বেসুরা বহুবার বেজেছে। এমনকি মূলেও গলদ না ছিল এমন নয়। যে-কলম্বো শক্তি-পঞ্চ বান্দুং সম্মেলনের আহ্বায়ক, তাদের ভেতর পাকিস্থান ও সিংহল নিরপেক্ষ শক্তি নয় অথবা নিরপেক্ষতায় তেমন আস্থাও এদের নেই। সিংহল বৃটেনের সঙ্গে আর পাকিস্থান আমেরিকার সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তিতে বাঁধা। কাজেই নীতি ও কর্মপন্থার দিক হতেও এদের পক্ষে নিরপেক্ষতা নীতি কিংবা শক্তিগোষ্ঠিতে যোগদান না করার ব্যবস্থা সমর্থন করা সম্ভব নয়। এহেন অবস্থায় ভারত, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়ার চিন্তা ও কর্মধারা হতে এরা মূলত পৃথক। আবার সম্মেলনে যোগদানকারী তুরস্ক, তাইল্যাণ্ড, ইরাক, ফিলিপাইন ও অষ্ট্রেলিয়াও প্রতিরক্ষা চুক্তি জোট গঠনে আস্থাশীল। অর্থাৎ ইচ্ছা অনিচ্ছায় এসব রাষ্ট্র প্রাচ্য ভূখণ্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবাহ। পক্ষান্তরে প্রজাতন্ত্রী চীনের মত সাম্যবাদী ভাবাপন্ন নয়াগণতন্ত্রী রাষ্ট্রের যোগদানে সম্মেলনের সমগ্র রূপের না হলেও প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে। এরি সঙ্গে আমেরিকারও রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব, কিন্তু নেপথ্যে তার ভূমিকা। তারই মুখপাত্ররূপে পাকিস্থান, ফিলিপাইন, তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ প্রত্যক্ষভাবে, আর সিংহল পরোক্ষে ক্রিয়াশীল। আমেরিকা যেন এদের নেপথ্য গায়ক, প্লে-ব্যাক'—-বাইবেলোক্ত গল্পের অদৃশ্যসঞ্চারী কণ্ঠস্বর একজনার, কিন্তু স্পর্শ অন্যের ; The voice is Jacob's voice but the hands are the hands of Esau. কাজেই সম্মেলন য়ুরোপের মতো দু'টোতে নয়, তিনটি শিবিরে বিভক্ত। এহেন পটভূমিকায় ২০শে এপ্রিলের অধিবেশনে তৎকালীন পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত সপ্তশীল প্রস্তাব করেন। আন্তর্জাতিক আচরণ বিধি-রূপে ভারত কর্তৃক প্রবর্তিত পঞ্চশীলের এটি পাল্টা জবাব। ওর ১নং দফায় সমস্ত জাতির সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক সংহতি মান্য করা, ৪নং দফায় কোন দেশের আঞ্চলিক সংহতি বা রাজনৈতিক স্বাধীনতা

নাশের চেষ্টা না করা ও ৫নং দফায় একক বা সমষ্টিগতভাবে আত্মরক্ষার অধিকার স্বীকার করার প্রস্তাব করা হয়। পাক প্রধান মন্ত্রীর মতে বিশ্বশান্তি রক্ষার পক্ষে এ-ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ধোপে টেকেনি এ। এর পর ২২শে এপ্রিল সিংহলের প্রধান মন্ত্রী স্যার জন কোটেলাওয়ালা সোবিয়েৎ-তাঁবেদার রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনার দাবী জানিয়ে মৃদু চাঞ্চল্য সঞ্চার করেন। এর জের সামলে ওঠতে বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়। শেষে তিনি তাঁর সদিচ্ছার প্রমাণরূপে দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে, সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব নয়, শুধু তথ্য পেশ করাই তাঁর অভিপ্রায়। কিন্তু পাকিস্থান এ-সুযোগ ছাড়তে নারাজ। পুরাণো ও নয়া উপনিবেশবাদ সম্পর্কে আলোচনা করাই তার সংকল্প। তুরস্ক, ইরাক, ইরাণ, লেবানন, ফিলিপাইন ও লাইবেরিয়া তার প্রস্তাবের সমর্থক। পক্ষান্তরে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব বিস্তার এবং নাশকতামূলক কাজ ও গোপন ক্রিয়াশীলতার নিন্দা করে তুরস্ক একটি প্রস্তাব করে। কিন্তু পাকিস্থান ও তুরস্কের যুক্তিতর্কের ছেঁদো দিক উদ্ঘাটন করে শ্রীনেহরু এক জোরালো ও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন; সম্মেলনে এ-বক্তৃতাই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় হলো: সম্মেলনে যোগদানকারী বহু সরকার প্রস্তাবে উল্লিখিত কম্যুনিষ্ট-তাঁবেদার রাষ্ট্রগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছেন; রাষ্ট্রপুঞ্জেরও অনেকে সদস্য। ইন্দোচীনে আন্তর্জাতিক কমিশনের অন্যতম সদস্য পোল্যাণ্ড। এসব রাষ্ট্রের সঙ্গে অনেকে সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ। কাজেই এদের মূল ধরে টেনে লাভ? তবে একথা স্বীকার্য, কম্যুনিষ্টরা যেমন, কম্যুনিষ্ট-বিরোধীরাও তেমনি ভ্রান্তনীতি অনুসারী। চৌ এন লাই এ-ব্যাপারে শ্রীনেহরুকে সমর্থন করেন। মিশরের প্রধান মন্ত্রী কর্ণেল নাজের উপনিবেশবাদ সম্পর্কিত প্রস্তাবের মুখবন্ধ রচনার জন্যে প্রস্তাব করলে শ্রীনেহরু সানন্দে তাতে সম্মত হন। কিন্তু কমিটিতে প্রস্তাবের শব্দ-বিন্যাসে নানা ওজর আপত্তি ওঠে। তবে চূড়ান্তভাবে গৃহীত প্রস্তাবে সাম্যবাদের নাম গন্ধও নেই। কাজেই

শেষ পর্যন্ত সকল পক্ষের মধ্যেই একটা রফা ও বুঝাপড়া হয়। অবশ্য এটা নেহরু-প্রভাবেরই স্বীকৃতি।

২৩শে এপ্রিল শ্রীনেহরু সম্মেলনের রাজনৈতিক কমিটিতে "বিশ্বে শান্তি ও সহযোগিতার প্রসার" সম্পর্কে এক বক্তৃতা দেন। গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দিক হতে বক্তৃতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, যেসব বক্তৃতা তিনি সম্মেলনে করেন, প্রত্যেকটিতে বিশ্বব্যাপারে ভারতের নীতি, কর্মকাণ্ড ও মনোভাব বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত হয়। এতে ভারত সম্পর্কে বিভিন্ন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রের অকারণ সন্দেহ ও সংশয় যেমন দূর হয়, তেমনি ভারতের মিত্র সংখ্যা বাড়ে; ভারতের সঙ্গে যারা একমত নয়, তাদেরও প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হয়। ঐ বক্তৃতাটি ভাষাবিন্যাস, শব্দচয়ন, চিন্তার স্বচ্ছতা ও যুক্তিতর্কের দিক হতে অপূর্ব। এতে আত্ম-প্রত্যয় প্রতি ছত্রে পরিস্ফুট। এখানে তার প্রাসঙ্গিক অংশবিশেষ উদ্ধৃত হলো। তিনি বলেন: "এ বিরাট পৃথিবীতে সঙ্গীহীন একাকী চলাই যদি ভারত-ভাগ্যবিধাতার নির্দেশ হয় তবে আমরা একাই চলবো। প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কেউ আমাদের পাশে ছিলো না। যে সামান্য শক্তি আমাদের আছে তা দিয়েই আমরা আত্মরক্ষা করবো। আমাদের অস্ত্রশক্তি নিঃশেষ হলেও ভারত আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে। আমি ভারতকে চিনি, ভারতের জনগণকে চিনি। নিঃসন্দিগ্ধ আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এ আশায় আমি বেঁচে আছি যে পৃথিবীর কোন শক্তিই ভারতকে পরাস্ত করতে পারবে না। এমনকি দুটো বৃহৎ রাষ্ট্রের সম্মিলিত শক্তি, তাদের আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিপুল ধ্বংসকারিতা কোন কিছুই ভারতকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে পারবে না।" তুরস্কের যুক্তি খণ্ডন করে তিনি বলেন, "তুরস্ক বিশ্ব-পরিস্থিতির বাস্তব উপলব্ধির কথা বলেছে। কিন্তু তথাকথিত এ উপলব্ধি পৃথিবীকে আর একটা মহা-যুদ্ধের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। * * ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না, কিন্তু পৃথিবীতে যে দুটো বিরাট শক্তিগোষ্ঠি মাথা চাড়া দিয়েছে,

তাদের কেউ একে অন্যেকে নিশ্চিহ্ন করতে পারবে না।" প্রতিরক্ষা চুক্তির অযৌক্তিকতা ও অন্যায্যতা দেখিয়ে তিনি বলেন, 'নাটো' (উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা অথবা North Atlantic Treaty Organisation সংক্ষেপে NATO) নিজ সীমা লঙ্ঘন করেছে, অতলান্তিকের সীমা ছাড়িয়ে অন্য সাগরে—মহাসাগরের দিকে বাহু বিস্তার করেছে। * * * 'নাটো' আজ ঔপনিবেশিক শক্তির সবচেয়ে বড় সহায়ক। * * * 'নাটো'র সদস্য পর্তুগালের অনুরোধে নাটো প্রায়ই আমাদিগকে 'এটা করো না ওটা করো না' বলে নির্দেশ দিয়ে থাকে। * * এটা এক ধরণের অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য; নবীন ও প্রজাতন্ত্রী ভারতের মতে এ-ঔদ্ধত্যের মার্জনা নেই।" সহ-অবস্থিতির জয়ধ্বনি করে তিনি দৃপ্তকণ্ঠে অস্ত্রবলের ওপর এশিয়ার নৈতিক শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "এই কি বিধিলিপি,—যে-এশিয়া মহাদেশে একদা চিন্তানায়ক ও ধর্মগুরুর আবির্ভাব ঘটেছিল, যে-মহাদেশ পৃথিবীকে কত ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে, সে-মহাদেশের জনগণ অন্যের সাথে জোট পাকিয়ে অপরের স্তাবকতা করে, তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে সন্তুষ্ট থাকবে? আত্মমর্যাদাশীল মানুষ-বা রাষ্ট্রের পক্ষে এ-অবস্থা অপমানকর। এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো একবার পরশাসন মুক্ত হয়ে আবার এভাবে নিজেদের জীবনে অপমান ও কলঙ্কের বোঝা বইবে, তা' চিন্তারও অতীত। * * * অন্যের তল্পীবাহক হবার জন্যে নিজের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া আমার দ্বারা কদাপি সম্ভব নয়। আমি জানি, শেষ পর্যন্ত নৈতিক শক্তিই জয়ী হবে! রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশের আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার শক্তি উপেক্ষা করে এশিয়া-আফ্রিকার জনগণের নৈতিক শক্তিই জয়ী হবে।"

২৪শে এপ্রিল বান্দুং মহাসম্মেলনের শেষ দিন; সপ্তাহ ব্যাপী আলাপ আলোচনা ও বাদানুবাদের পর এদিন বৈঠকের ফলাফল সম্বলিত সুদীর্ঘ চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হয়। এটি সর্ববাদীসম্মত।

এতে এশিয়া-আফ্রিকার সমস্বার্থ বিষয়ক সকল ব্যাপার আলোচনা করে উভয় মহাদেশের পূর্ণতম বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা লাভের উপায় পর্যালোচনা করা হয়; আর এ সম্পর্কে মোটামুটি বিভক্ত নিম্নোক্ত ৭টি বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয় যথা— (১) বৈষয়িক সহযোগিতা (২) সাংস্কৃতিক সহযোগিতা (৩) মানবিক ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার (৪) পরাধীন জাতিসমূহের সমস্যা (৫) অন্যান্য সমস্যা (৬) বিশ্বশান্তির সহায়তা ও সহযোগিতা ও (৭) বিশ্বশান্তির সহায়ক ও সহযোগিতা বিষয়ক ঘোষণা। বারটি বিভিন্ন খণ্ড-সম্বলিত প্রথম প্রস্তাবে এশিয়া-আফ্রিকা অঞ্চলে বৈষয়িক উন্নতির জরুরী প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত হয়। এতে বলা হয়, প্রস্তাবের অর্থ এ নয় যে সংশ্লিষ্ট এলাকা-বহির্ভূত দেশ হ'তে সহযোগিতা লাভ অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রয়োজনীয়। তবে স্বীকার করা হয় যে আন্তজাতিক ও দ্বি-পাক্ষিক ব্যবস্থা দ্বারা সম্মেলনে যোগদানকারী কোন কোন দেশ ভিন্ন রাষ্ট্র হতে যে সাহায্য পাচ্ছে তদ্দ্বারা তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা সফল করার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য হচ্ছে; সম্মেলনে যোগদানকারী বিভিন্ন রাষ্ট্র নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী পারস্পরিক সাহায্য দানে সম্মত হয়; রাষ্ট্রপুঞ্জকে একটি বিশেষ ধনভাণ্ডার গঠন করতে সম্মেলন অনুরোধ করে; পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্যে গঠিত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক এর সম্পদের বৃহদংশ এশিয়া-আফ্রিকার দেশ-গুলোর জন্য বরাদ্দ করবে; যথাশীঘ্র একটি আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা গঠন করতে হবে, আর সমস্বার্থের দিক হতে লক্ষ্য রেখে এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলোর যুক্ত প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতে হবে। ছ'টি খণ্ডে বিভক্ত দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয় যে এশিয়া ও আফ্রিকা ধর্ম ও সভ্যতার আদি লীলাক্ষেত্র; এর সংস্কৃতি আত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব-জনীনতার ওপর স্থাপিত; কিন্তু বিগত কয়েক শতক এশিয়া ও আফ্রিকার মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; এক্ষণে উভয় মহাদেশের মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক সহযোগিতা স্থাপনকল্পে কাজ করার সংকল্প

ঘোষণা করা হয় ; তার পর উপনিবেশবাদ সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ব্যাহত করে ও জাতীয় সংস্কৃতি দমন করে। কোন কোন বিদেশী শক্তি পরাধীন জাতির শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক অধিকারও অস্বীকার করেছে ; তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও মরক্কোর ক্ষেত্রে এ বিষয় সত্য ; আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে অনুরূপ ধরণের বৈষম্য প্রচলিত ; সম্মেলন এ-জাতীয় মৌলিক অধিকার অস্বীকৃতির ও বর্ণবৈষম্যের নিন্দা করে ; তবে নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করাও এ দু' মহাদেশের অভিপ্রেত। আবার এশিয়া-আফ্রিকার যেসব দেশে সৌভাগ্যক্রমে বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী সংস্থা ও উন্নত ধরণের শিক্ষায়তন রয়েছে, সেগুলোতে এশিয়া-আফ্রিকার অনুন্নত অঞ্চলের ছাত্রদের ভর্তির সুযোগ দিতে হবে ; এরূপ অবস্থায় পারস্পরিক সাংস্কৃতিক ও তথ্য বিনিময় আর জ্ঞান অর্জনই সাংস্কৃতিক সহযোগিতা লাভের উপায়। দু'টো খণ্ড যুক্ত মানবিক ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে বর্ণিত মানবিক অধিকার ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের মৌলিক নীতি সমর্থন করা হয় এবং পৃথিবী ও আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে প্রচলিত বর্ণবৈষম্য নীতির নিন্দা করা হয়। দুটো ধারা বিশিষ্ট পরাধীন জাতিসমূহের সমস্যা সংক্রান্ত ৪নং প্রস্তাবে উপনিবেশবাদের নিন্দা করে বলা হয় যে পরাধীনতা ও শোষণ ব্যবস্থা রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ-বিরোধী, বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতার পরিপন্থী ; কাজেই পরাধীন জাতিগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গকে ও অবিলম্বে আলজেরিয়া, মরক্কো ও তিউনিসিয়ার জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার মঞ্জুর করতে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়। ৩টি খণ্ডে বিভক্ত ৫নং প্রস্তাবে প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের, পশ্চিম ইরিয়ানের ওপর ইন্দোনেশিয়ার এবং এডেন ও ইয়েমেনের দক্ষিণাংশে ইয়েমেনের দাবী সমর্থন করে সংশ্লিষ্ট শক্তি-বর্গকে আপোষ মীমাংসায় উপনীত হতে অনুরোধ করা হয়। দু'টো

ধারাবিশিষ্ট ৬নং প্রস্তাবে রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদকে কম্বোডিয়া, সিংহল, জাপান, জর্ডন, নেপাল ও সম্মিলিত ভিয়েৎনামকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরূপে গ্রহণের, এশিয়া-আফ্রিকা অঞ্চলের সদস্যগণকে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বেশি সংখ্যায় নিয়োগের অনুরোধ জানান হয় ; পক্ষান্তরে আণবিক অস্ত্রের ভয়াবহ ধ্বংস ক্ষমতার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাষ্ট্রপুঞ্জকে এ-অস্ত্র নিষিদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে এবং সংশ্লিষ্ট সকল শক্তিকে ব্যাপক ধ্বংস-ক্ষমতার অধিকারী সর্বপ্রকার অস্ত্র নির্মাণ সীমায়িত, নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস, পরীক্ষা করতে ও এ উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে তুলতে আবেদন জানান হয়। সর্বশেষ ৭নং প্রস্তাবটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতে আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পারস্পরিক আচরণ বিধি ও নীতি নির্ধারিত হয়। কাজেই এর তাৎপর্য ঐতিহাসিক। ভারতের উদ্ভাবিত পঞ্চশীলই এর মূল ভিত্তি। বান্দুং-এ 'বিশ্বশান্তির সহায়তা ও সহযোগিতা ঘোষণা' সংক্রান্ত প্রস্তাবে এ-পঞ্চ নীতি তো অন্তর্ভুক্ত হয়েইছে, অধিকন্তু এসব নীতির পোষকতামূলক ব্যাখ্যাও এতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। তবে প্রস্তাবে যৌথ প্রতিরক্ষা সম্পর্কিত একটি ব্যবস্থার বিষয়ও উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য শক্তি-সাম্য ও শক্তি-সঞ্জাত আপোষ আলোচনা-ভিত্তিক সামরিক চুক্তি ও বিরোধী শিবিরে বিভক্ত বিভিন্ন জাতির জোট পাকানো ব্যবস্থায় ভারত বিরোধী হলেও নীতি হিসেবে যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মেনে নেয়। এর আসল হেতু এই যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের ৫১নং নিবন্ধে বর্ণিত ব্যবস্থার সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ। এতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রপুঞ্জের কোন সদস্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালিত হলে নিরাপত্তা পরিষদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার বিধি ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অথবা যৌথ ভাবে আত্মরক্ষার জন্মগত অধিকার আছে।" তা' ছাড়া, সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবে দুটো রক্ষাকবচও রয়েছে, যথা, (১) যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে নিয়োগ করা

যাবে না ও (২) কোনরূপ বাইরের চাপ দেওয়া চলবে না। প্রস্তাবে বলা হয় যে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষা সমস্যার সঙ্গে শান্তি রক্ষার সমস্যা সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে সমর-সম্ভারের পরিমাণ হ্রাস ও আন্তর্জাতিক সংস্থার তত্ত্বাবধানে আণবিক অস্ত্র নির্মাণ বন্ধের উদ্দেশ্যে সহযোগিতা করা উচিত। এ ভাবেই আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপিত হতে পারে ও মানব-কল্যাণে আণবিক শক্তির প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে স্বাধীনতা ও শান্তি পরস্পর নির্ভরশীল। এহেতু সকল জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত ও পরবশ জাতিদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া বিধেয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের নীতি অনুযায়ী সকল জাতির নিজ নিজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি এবং জীবন যাত্রার রীতি গড়ে তোলার অধিকার থাকা উচিত। ভীতি ও অবিশ্বাস হতে মুক্ত হয়ে এবং পারস্পরিক আস্থা ও শুভেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে জাতি সমূহকে নিম্নোক্ত দশটি নীতির ভিত্তিতে সহনশীলতা চর্চা করা, সৎ প্রতিবেশীরূপে শান্তিতে বসবাস করা এবং সৌহার্দসূচক সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করা উচিত, যথা—(১) রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে বর্ণিত মৌলিক মানবিক অধিকার এবং সনদের উদ্দেশ্য ও নীতির প্রতি শ্রদ্ধা; (২) সকল জাতির সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে মর্যাদা দান; (৩) সকল জাতির সাম্য এবং ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল রাষ্ট্রের সমাবস্থার স্বীকৃতি; (৪) অন্য দেশের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা; (৫) রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একক বা যৌথভাবে প্রত্যেক জাতির আত্মরক্ষার অধিকার (৬) [ক] বৃহৎ শক্তিবর্গের বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে যৌথ প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠন করা চলবে না ও [খ] অন্যান্য দেশের ওপর চাপ দেওয়া যাবে না; (৭) কোন দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ অথবা আক্রমণ বা আক্রমণের ভীতি প্রদর্শন করা যাবে না; (৮) আপোষ আলোচনা, রফা, মধ্যস্থতা, বিচার বিভাগীয় মীমাংসা ও

রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে বর্ণিত অন্যান্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা; (৯) পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা ও সহযোগিতার ভাব বৃদ্ধি এবং (১০) ন্যায় বিচার ও আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। কাজেই এসব নীতি অনুযায়ী সৌহার্দ্যের ভাব সৃষ্টি করা হলে তা' আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার সহায়ক হবে; পক্ষান্তরে বৈষয়িক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সকলের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পোষক হবে।

ব্রত উদ্‌যাপনের পর মানুষের মনে একটা তৃপ্তি, বৃহৎ প্রত্যাশা, একটা বৃহত্ত্বের অনুভূতি জাগা স্বাভাবিক। বিশেষ করে যে-জীবন বা কর্মনীতি নিজের ব্যক্তিগত স্তর ছাড়িয়ে বিশ্বমুখীন হয়ে থাকে, তার সর্বজনীন স্বীকৃতিতে আত্মশ্লাঘা হয়, আত্মবিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হয়। কিন্তু বৃহৎ ব্যক্তিত্বের কাছে আবার এটাও আত্ম-জিজ্ঞাসার হেতু হয়ে দাঁড়ায়, পরবর্তী কর্মযজ্ঞে আত্মাহুতির সোপানে পরিণত হয়। শ্রীনেহরুর ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসও তা-ই। সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশনে শ্রীনেহরুর বক্তৃতায় সেই চিরপরিচিত সুর ও ইঙ্গিত বিশেষ লক্ষণীয়। তিনি বলেন: "সম্মেলনে যা হয়েছে তা খুবই সন্তোষজনক। এশিয়া ও আফ্রিকার সমস্যাকে বিশ্ব-সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, আর যুগপৎ উভয় সমস্যার মীমাংসা করতে হবে। বিশ্ব রাজনীতিতে এশিয়া-আফ্রিকাকে পশ্চাতে ফেলে রাখা চলবে না। আমরা এ সুযোগে এগিয়ে না গেলে আবার পিছিয়ে পড়বো। * * * য়ুরোপ ও আমেরিকার বৃহৎ দেশগুলোর মিত্রতা কামনা করি। কিন্তু তাদের কলহেই সমগ্র বিশ্ব জড়িত; আমরা কেন তাদের বিবাদ ও সংগ্রামে লিপ্ত হবো? * * আমরা এশিয়া বা আফ্রিকাবাসী ছাড়া আর কিছুই নই। আমাদিগকে রাশিয়া, আমেরিকা অথবা য়ুরোপের যেকোন দেশের অনুসরণকারী বলা আমাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা, নতুন মর্যাদা ও মনোভাবের পক্ষে আদৌ সম্মানজনক নয়। * * সম্মেলনে মতভেদ হয়েছে; মতসাম্যও হয়েছে। আমরা কারু

পাছদোহার নই। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে এশিয়া ও আফ্রিকায় হাততোলা শ্রেণীর কেউ থাকবে না। অতীতে এ কাজ যথেষ্ট হয়েছে। * * * আমরা এখানে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। গত সাত দিন বান্দুং একদিক হতে সমগ্র এশিয়া ও আফ্রিকার রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল, আর সারা পৃথিবীর দৃষ্টি ছিল এর ওপর নিবদ্ধ।"

পঞ্চশীল

সর্বগ্রাসী ক্ষুধানল উঠেছে জাগিয়া
তাই আসিয়াছে দিন,—
পীড়িত মানুষ মুক্তিহীন,—
আবার তাহারে
আসিতে হবে যে তীর্থ দ্বারে
শুনিবারে—
পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরস্থির
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র,—"বুদ্ধের শরণ লইলাম॥"

—'বোরো বুদুর'—রবীন্দ্রনাথ।

সাধারণের মানুষ হয়েও অসাধারণ। এ কেমনতরো কথা? অথচ জওহরলালের ব্যাপারে এটাই কিন্তু সবচেয়ে খাঁটি বিশেষণ। অর্থাৎ তাঁর বিচরণক্ষেত্র ইতরজন; তাদের নিয়েই তাঁর কারবার। এক কথায় তাদের বেদনা-দুঃখের প্রতিভূ তিনি; দেশবাসীর উদ্‌গীর্ণ তীব্র হলাহল আকণ্ঠ পান করে তিনি নীলকণ্ঠ। রাজনীতি তাঁর পেশা ও নেশা; কিন্তু এর শাঠ্য তাঁর যেন ধাতস্থ নয়। তাঁর সরল

ও স্পষ্টোক্তি মাঝে মাঝে তাঁর পদ-মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। রাজনীতিবিদ্‌দের তিনি 'ডায়ানোসোরের' মতো এক অপসৃয়মান জীব বলে মনে করেন। কাজেই সবকিছুর মধ্যে থেকেও তিনি চিত্তবৃত্তির দিক হতে স্বতন্ত্র, নিঃসঙ্গ। নির্জনতা তাই তাঁর এত প্রিয়, নিসর্গ তাঁকে এমন করে আকর্ষণ করে থাকে; তাদের সঙ্গে তাঁর চিত্তবিনিময় হয়—নিজেকে তিনি খুঁজে পান, আত্ম-মহিমা অনুভব করেন। 'প্রকৃতির এই দুরন্ত শিশু' অদৃষ্ট-চক্রে সমষ্টি-জীবনের নায়ক; কিন্তু স্বভাবের দিক হতে স্বাতন্ত্র্যবাদী। এটাই মানুষ জওহরলালের অন্তরঙ্গ পরিচয়। আবার নিজের প্রমাদ ও ত্রুটি স্বীকারে তাঁর কুণ্ঠা নেই, লজ্জাও নেই। ভিন্ন দেশ হলে এ ভুল-স্বীকারই যে-কারু রাজনৈতিক জীবন অবসানের পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতো। যেহেতু অভ্রান্ততাই রাজনীতিবিদের পসার-প্রতিপত্তির বনিয়াদ। সে প্রতিষ্ঠা-ভূমিতে ফাটল দেখা দিলেই বিপদ; তিল-তিল গড়া প্রভাবও কর্পূরের মতো উবে যেতে বেশি সময় লাগে না। তা' ছাড়া, রাজনীতিতে কৃতজ্ঞতার স্থান নেই, শূন্যতারও অবকাশ নেই। অথচ আশ্চর্য এই জওহরলাল। দ্বৈত তাঁর ব্যক্তিত্ব। ভুলে-ভরা সাধারণ মানুষেরই একজন তিনি; কিন্তু রাষ্ট্রনীতিতে পারঙ্গম; আবার এতে চিত্তবৃত্তির আমদানীও তিনি করেছেন। তাই জনতার মানুষকে জনসাধারণ এত ভালবাসে; ভারতবাসী তাঁকে আপনার জন বলে মনে করে। এমনকি সময় সময় তাঁকে প্রশ্রয় দিয়েও থাকে বলে ভুল হয়। কথাটা বেশ শ্রুতিকটু; অনেকের মনে খট্‌কা লাগাও অসম্ভব নয়। কিন্তু এ সর্বাংশে সত্য। তারপর ভারতবাসী পুরাপুরি রাজনৈতিক মানুষ নয়, অন্তত এখনো হয়ে ওঠেনি; যেহেতু এখানকার জল-বায়ু ও ধাতু একটু আলাদা। প্রকৃতিদত্ত কতগুলো দোষ গুণে ও অবস্থা-বৈগুণ্যে ভারতীয় স্বভাব একটা বিশিষ্ট আকার ধরেছে। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এর তুলনা মেলা ভার। তা-ই ভারতীয় জনতা

গান্ধিজীকে চিন্‌তো; জওহরলালকেও চেনে,—অত্যন্ত আপনার জন বলেই। অথচ চরিত্র ও স্বভাবের দিক হতে তিনি ভারতীয় সাধনার ধারায় পুষ্ট নন। সাধক-ভারতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়ও নেই। কিন্তু বাহ্যিক দিক হতে এর গভীরতা ও ব্যাপ্তি হৃদয়ঙ্গমের চেষ্টা তিনি করেছেন ও করে থাকেন; নতুন একটা দিক্‌-দর্শনে উদ্যোগীও তিনি হয়েছেন। এতে আন্তরিকতার অভাব তাঁর আদৌ নেই। তবে নিজের দিক থেকে তাঁর শক্তি-সামর্থ্যের একটা সীমা আছে। এটা তিনিও জানেন, সবাই জানে। কিন্তু এক স্থানে তিনি অদ্বিতীয়। জাতীয় জীবনের গ্লানিমোচন ও দারিদ্র্য-দুঃখ নাশের চেষ্টায়, ঐশ্বর্য আহরণ ও বৃদ্ধির আয়োজনে এবং বিশ্ব-মানচিত্রে ভারতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর জুড়ি নেই। এটাই তাঁর জীবনবেদ। কে না জানে, জওহরলাল আশৈশব ভোগবিলাসে লালিত? কিন্তু ভোগবাদ, তামসিকতা ও রজোগুণের তিনি ঘোর শত্রু। 'কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্ত' নীতির তিনি বিরোধী. আবার চার্বাক দর্শনের 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ'-বাদের সমর্থকও তিনি নন। ভগবানের অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে মাথা তিনি ঘামান না,—সে সময়ও তাঁর নেই। জন্মান্তরবাদ-জাত কর্মফলভোগে বিশ্বাস তাঁর আছে বলে জানা যায়নি। তবে আসলে তিনি কী? তাঁর শক্তির উৎস কোথায়? এতো অমিত ক্ষমতা ও অপরিমেয় উদ্যমের আধার তিনি হলেন কী করে? এর একমাত্র উত্তর: ভারতবাসীর অতলান্ত বেদনা ও দুঃখভার বহনের উত্তরাধিকার লাভ। এ থেকেই তিনি জীবনরস আহরণ করে থাকেন, এ-ই তাঁকে নতুন নতুন কর্মোদ্যমে ব্রতী করে থাকে। এভাবেই জাতীয় জীবনের অপরিসর তুলসীমঞ্চ হতে আন্তর্জাতিক জীবনের সুপরিসর অঙ্গনে তাঁর প্রবেশ ও আত্মপ্রকাশ। এতে রয়েছে একটা তীব্র আত্মানুভূতি, মানবিকতাবোধ ও ব্রত উদ্‌যাপনের নিষ্ঠা। কিন্তু গীতোক্ত 'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'-এ তাঁর আস্থা। ইহলোকের

কর্মফল দ্বারা পরলোকে অনন্ত ও অখণ্ড সুখের প্রত্যাশী তিনি নন। বরং নিরীশ্বরবাদী হয়েও তিনি এক হিসেবে আস্তিক্যবাদী। যেহেতু আসক্তি-রহিত কর্ম-যজ্ঞে তাঁর আত্মাহুতি। জাতীয় জীবনের আত্ম-কেন্দ্রিকতা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার সেবা ও বন্দনায় তা' ঊর্ধ্বায়িত। এখানে শুধু মানুষ জওহরলালই নয়, রাষ্ট্র-নায়ক জওহরলালেরও জীবনদর্শনের মূলসূত্র নিহিত।

জওহরলালের আত্মজীবনীতে 'ধর্ম কি?' শীর্ষক অধ্যায়ে এক স্থানে তিনি বলেছেন: "* * * নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি চাই উন্মুক্ত সমুদ্র, তরঙ্গ-সংকুল ঝটিকা বিক্ষুব্ধ। মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেই পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নাই। তাই জীবনের সমস্যাগুলিই আমার মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট। চীনের প্রাচীন পরম্পরাগত ধারা—যাহা মূলত নৈতিক অথচ ধর্মের সহিত সম্পর্কহীন, কিংবা আধ্যাত্মিক সংশয়বাদ,—উহার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে, কিন্তু আমি উহা জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নহি। 'তাও' অর্থাৎ পথ মানিতে হইবে—জীবনের পথ আমার ভাল লাগে; ইহাকে জানিতে হইবে, বুঝিতে হইবে,—ইহাকে ত্যাগ করিয়া নহে, গ্রহণ করিয়াই ইহাকে প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গি ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমার মতে ইহা সুস্পষ্ট চিন্তার শত্রু বলিয়াই মনে হয়। নির্বিচারে কতকগুলি অপরিবর্তনীয় ও সুনির্দিষ্ট মত ও ধারণা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তদনুসারে মনের ভাবাবেগ, মনের ও ইন্দ্রিয়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত।" আবার অন্য এক জায়গায় তিনি বলেন, "ধর্ম সাধারণত ঈশ্বর ও পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্য অনুসন্ধান এবং ধার্মিক ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের মুক্তি লইয়াই বেশি ব্যস্ত। নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামাজিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। উহা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক

পাপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্যই প্রণালীবদ্ধ আনুষ্ঠানিক ধর্ম স্বভাবতই কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয় এবং অনিবার্যরূপে সমস্ত প্রকার পরিবর্তন ও উন্নতির বিরুদ্ধ-শক্তিরূপে কার্য করিয়া থাকে।" এই হলো ধর্ম ও পরমার্থিক চিন্তা সম্পর্কে জওহরলালের মোটামুটি মনোভাব ও সুচিন্তিত ধারণা। এ ব্যাপারে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে প্রভেদ আকাশ-পাতাল।

ধর্ম ও ধর্মাত্মা সম্পর্কে জওহরলালের অভিমত সর্বজনগ্রাহ্য নয়। ধর্ম ও ধার্মিকতার সংজ্ঞা নিরূপণেও অনেকের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হওয়া আশ্চর্য নয়। ইংরেজী Religion শব্দ যে অর্থবাচক, সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও তাৎপর্য তদপেক্ষা গভীরতর। ধৃ ধাতু মন প্রত্যয়যোগে প্রাপ্ত 'ধর্ম' শব্দের অর্থ যা' ধারণ করে; অর্থাৎ মানুষ যা'কে অবলম্বন করে স্বস্থান হতে বিচ্যুত হয় না। জীবন-চর্যার সমগ্র ভিত্তিমূল এতে স্থাপিত। বেদে ধর্মের অর্থ করা হয়েছে,—যা' মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত করায়, যা'র ফলে 'স্বর্গ', 'মুক্তি' বা 'উন্নতি' লাভ হয়। মীমাংসা দর্শনমতে 'চোদনা লক্ষণঃ অর্থঃ ধর্মঃ।' 'চোদনা' কি? 'কর্মপ্রবৃত্তিজনকং বাক্যং চোদনা।' বেদের পূর্ব মীমাংসা (কর্মকাণ্ড) ও উত্তর মীমাংসায় (ধর্মকাণ্ড) কর্ম ও ধর্মের মধ্যে একটা সমতা বিধানের চেষ্টা হয়েছে। এতে কর্ম ও ব্রহ্মলাভ হিন্দু-আর্যের জীবন-দর্শনের মূল ভিত্তি বলে স্বীকৃত। জীব কর্ম করে কর্মক্ষয় করবে; ক্রমশ মধ্যবর্তী স্তর পেরিয়ে মোক্ষলাভের পথে এগিয়ে যাবে। মধ্যবর্তী স্তরে দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ শোধ করবে। কিন্তু কর্ম ছাড়া কর্মক্ষয় সম্ভব নয়। মায়ার বাঁধন কাটিয়ে তা-ই ক্রমশ মোক্ষ বা স্বর্গলাভের পথে অগ্রসর হওয়া হিন্দুর কাম্য। কাজেই 'ধর্ম' ও 'Religion' শব্দের অর্থগত পার্থক্য মৌলিক। Religion বল্‌তে ধর্মের আনুষ্ঠানিক রীতিই বোঝান হয়ে থাকে; অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক উপাসনাপদ্ধতি, সংস্কার, ঈশ্বর, ও ইহকাল-পরকাল বিষয়ক মতামতের এতে প্রাধান্য। কাজেই

জওহরলাল-কথিত religion জীবনের বহিরঙ্গ দিকেরই অভিব্যক্তি; জীবনের মর্মমূল এতে স্পর্শ করে না। পক্ষান্তরে ভারতে 'ধর্ম' শুধু আচারবাদ নয়; ভারতবাসী 'ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গিকে ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন'ও করেনি; অথবা এদেশে 'ধার্মিক ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ অপেক্ষা নিজের মুক্তি লইয়াই বেশি ব্যস্ত' থাকেনি। তবে 'ধর্ম' যেখানে অনঢ় রক্ষণশীলতা ও কায়েমী স্বার্থের বাহন, পুরোহিত-বাদে পর্যবসিত, স্বাধীন চিন্তা ও সমষ্টি-কল্যাণের পরিপন্থী, সেখানেই ধর্ম মানবমন ও সমাজদেহের পক্ষে বিষস্বরূপ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন ধর্মমতের উত্থান-পতনের ইতিহাস এর সাক্ষ্য। এসব ক্ষেত্রেই জওহরলালের বক্তব্য সমধিক প্রযোজ্য। কিন্তু 'ধর্ম' ভারতবাসীর সারাজীবনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত; তার কর্ম-সাধনাও এর অঙ্গ। বরং তার জীবনটাই একটা অখণ্ড যজ্ঞানুষ্ঠান। ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও আপ্তবাক্য, আর লোক ও ধর্মগুরুদেব জীবন-সাধনা এরই সূত্রানুসারী। এ সাধনা ইহলোকবিমুখ নয়, জীবনবিরোধীও নয়। আসক্তি-রহিত কর্মযজ্ঞে আহুতিই এর শিক্ষা। এদানীং কালে গান্ধিজীর জীবন-দর্শন, শিক্ষাধারা ও কর্মকাণ্ড এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁর অস্তিত্বের প্রতি-অনুকণা ধর্মভাবে অনুরঞ্জিত, ধর্মশীলতায় পরিব্যাপ্ত। তবু তাঁর মতো কর্মনেতা, জীবনযোদ্ধা পৃথিবীতে বিরল। তাঁর জীবন কি ইহকাল-বিমুখ? আড়াই হাজার বছর আগের 'শূন্যবাদী' বুদ্ধদেব কি জীবন-বিরোধী, শুধু মোক্ষকামীই ছিলেন? ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনকারী অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য? শিবাজী-গুরু সাধু রামদাস বা শিখ-গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দ সিংহ? আর্যধর্ম প্রবর্তক স্বামী দয়ানন্দ? আর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দই বা কী?

'তাও'-ধর্ম জীবনাশ্রিত; মহাচীন এর উদ্ভব ও লীলাক্ষেত্র। জ্ঞান ও কর্মযোগী শ্রীনেহরুর এ-ধর্মে গভীর অনুরাগ। এর নীতি-নিষ্ঠা ও ধর্ম-নিরপেক্ষতার আদর্শ তাঁর চিত্তবৃত্তি ও চিন্তার অনুসারী।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই: বৌদ্ধধর্মও তো 'তাও'বাদেরই সমগোত্রীয়; আর এর উদ্ভবস্থল খোদ ভারতবর্ষ। কাজেই স্বদেশের চিন্তাধারা ও মতবাদ তাঁর দৃষ্টি এড়ালো কী করে? বলতে গেলে বৌদ্ধধর্ম তাঁর স্বভাব ও চিন্তাধারার একান্তই অনুকূল। এ ধর্মমত মূলত অজ্ঞেয় বা নিরীশ্বরবাদী; তবে পার্থিব জীবনে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত আচারবিধি প্রয়োগে বিশ্বাসী। আবার ধর্মীয় নিরিখে এ কোন তথাকথিত প্রণালীবদ্ধ ধর্মমত নয়; বরং গৃহীদের উপযোগী কতকগুলো বিধিবদ্ধ নীতিশিক্ষাব উৎস। এগুলো মুখ্যত বৈষয়িক জীবনের শুভাশুভের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কাজেই সাংসারিক উপযোগিতার দিক থেকে বিচারে অথবা যুক্তিবাদী মনের আশ্রয়রূপে এ নীতিধর্ম 'তাও'বাদেরই সমকক্ষ। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস এই: বৌদ্ধধর্মকেও প্রায় হাজার বছর পর নিজ ভূমি হতে বিচ্যুত হয়ে মহাচীনে আশ্রয় নিতে হয়েছিলো। এব কার্যকাবণ আছে; তা' অন্যত্র বিচার্য। তবে শ্রীনেহরুকেও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে পরে অবহিত হতে হয়েছে। 'আত্মজীবনী'-তে ধর্ম সম্পর্কে নিজ জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করার পর এ-ধর্মমত সম্পর্কে তিনি শুধু শ্রদ্ধাশীলই নন, রীতিমত অনুরাগীও হয়েছেন। এটা নেহরুর স্বভাবধর্মের রূপান্তর মাত্র। এখানে তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্তন লক্ষণীয়; তাঁর অভারতীয় সত্তার ক্রমিক রূপান্তর আর ভারতীয়তার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় ও সংযোগ সাধন—তাঁর বাহ্যিক খোলস ত্যাগের সূচনা মাত্র। এতে করে তিনি ভারতীয় মনের গভীরে প্রবেশ করেছেন, তার চিত্তের সঙ্গে সাযুজ্যলাভ তাঁর হয়েছে। তাই স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় জীবনের বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে তিনি বৌদ্ধ মতবাদকে প্রয়োগ করেছেন, এর নীতিধর্মকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। এ-কৃতিত্ব নিশ্চয়ই সাধারণ নয়। গৌতম ও অশোকের আদর্শে তাঁর ব্যক্তিসত্তা আচ্ছন্ন, চিত্তলোক উদ্ভাসিত। কলুষ ধরণীতল কলঙ্কশূন্য করার পক্ষে করুণাঘন অনন্তপুণ্য শান্ত ও মুক্ত সিদ্ধার্থের সঞ্জীবনী

বাণীই তাঁর মতে একমাত্র ভরসা। আর অশোক-আচরিত প্রেম মৈত্রী ও করুণারসধারাই তাপিত পৃথিবীর পক্ষে অমৃত মন্ত্র। এর প্রমাণ ঃ ভারত সরকারের শীলমোহর ও রাষ্ট্রীয় পতাকায় অঙ্কিত অশোক-স্তম্ভের প্রতিলিপি, আর গৌতম-প্রচারিত নীতিধর্ম 'পঞ্চশীল'।

'পঞ্চশীল' ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতির মূলসূত্র ; পঞ্চশীল বিশ্ব-বিশ্রুত। সর্বত্র এর জয়জয়কার, এর বন্দনা। কিন্তু আসলে 'পঞ্চশীল' কী ? এর উদ্ভব কোথা হতে হলো ? এক কথায় এর অর্থ ভেদ করা দুরূহ ; তাৎপর্য ব্যাখ্যা কঠিন। তবে বলা নিষ্প্রয়োজন, 'পঞ্চশীল' বৌদ্ধমতবাদ ও নীতিধর্মের সার-সংগ্রহ। বৌদ্ধধর্মের আদি মতবাদ বা শিক্ষায় চারটি মহৎ ও মৌলিক সত্য স্বীকৃত—যথা (ক) জীবিত সকলকেই দুঃখভোগ করতে হবে ; (খ) মানুষের রিপুই দুঃখের আদি উৎস ; (গ) রিপুর তাড়নারাহিত্যই সর্বপ্রকার দুর্ভোগ হতে মুক্তিলাভের উপায় ও (ঘ) অষ্টবিধ পথই কষ্টযন্ত্রণা রাহিত্যের পথ। এসবের প্রথম তিনটিতে দার্শনিক ও চতুর্থ টিতে ধর্মীয় মতবাদ প্রকট। আর একথাও সত্যি, শেষোক্ত সত্যেই বৌদ্ধধর্মের ব্যবহারিক নীতিবাদ নিহিত। সর্বসাধারণের পক্ষে এসব আচরণীয় ও গ্রহণীয়।

নিম্নোক্ত অষ্টবিধ পথ বৌদ্ধ নীতিবাদের সারমর্ম যথা (১) যথার্থ বিশ্বাস (২) যথার্থ প্রতিজ্ঞা (৩) যথার্থ বাক্য (৪) যথার্থ কার্য (৫) সৎ জীবন (৬) সৎ চেষ্টা (৭) সৎ চিন্তা ও (৮) সঠিক ধ্যান-ধারণা। বলা প্রয়োজন, বৌদ্ধমতে ব্যবহারিক নীতিবাদ বা নৈতিকতা তাত্ত্বিক জ্ঞানভূয়িষ্ঠ ; আর নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সমবায়ে পূর্ণ ব্যক্তি-জীবনই বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের সর্বোচ্চ লক্ষ্য। ব্যবহারবিধিবর্জিত শুধু জ্ঞান অথবা ব্রহ্মানন্দে তদগতাবস্থা পূর্ণতা নয় ; পক্ষান্তরে সত্যের গভীরতর প্রদেশে অন্তর্দৃষ্টিহীন নৈতিকতা ভিত্তিহীনতার নামান্তর। ভিন্ন কথায়, কর্মহীন জ্ঞান শুধু ভারস্বরূপ, যেমন কুরূপা নারীর কণ্ঠলগ্ন নেকলেশ ছড়া।

অষ্টবিধ পথের প্রথম পর্যায় যথার্থ বিশ্বাস। নির্বাণ পথের পথিক, বিশেষ করে ভিক্ষুদের পক্ষে এ অপরিহার্য। সাধারণ মানুষের মিথ্যাচার পরিহার করে চরম সত্যের উৎস বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত আচরণ-বিধি পালন করা বৌদ্ধনীতিবাদে মহৎ সত্য বলে স্বীকৃত। বৌদ্ধধর্মের মতো খৃষ্টধর্মেও এ হলো ধর্মের অন্যতম মূল অঙ্গ। অষ্টবিধ পথের পরবর্তী পাঁচটি পর্যায় পাঁচটি নির্দেশাত্মক নীতি দ্বারা চালিত। এগুলো সাধারণ মানুষের আচার ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট ; এর প্রায় সবকটিতেই প্রতিবেশীর প্রতি মানুষের কর্তব্য নির্ণয় করা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত সুর দয়াদাক্ষিণ্য ; সংস্কৃতে এর নাম মৈত্রী, পালিতে মেত্তা ও সেন্টপলের ভাষায় human kindness বা মানবিক দয়া। মানবিক দয়া বা মৈত্রীলাভের ব্যাপারে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রে একটি উপদেশ দেয়া হয়ে থাকে : সৎকাজ দ্বারা অসৎ কাজের প্রতিদান দিতে হবে। বৌদ্ধধর্মে এ-হিতবাক্য প্রকৃতপক্ষে অনুশীলিতও হতো। তবে দয়া-দাক্ষিণ্যপ্রসূত এ জাতীয় উপদেশ খ্রীষ্টও দিতেন। কিন্তু কনফুসিয়াস এতদূর এগুতে পাবেন নি। তিনি বলতেন : অসৎ কাজের প্রতিদান দিতে হবে ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে, সৎকাজ দিয়ে নয়।

বুদ্ধের কাছে ধর্মের স্থান দর্শনেরও ওপব। ধর্ম শুধু তর্ক বা বিচারের বস্তু নয়, অভ্যাস ও ব্যবহারের বস্তু। কিন্তু ধর্মচর্চার জন্য পাঁচটি ব্রত গ্রহণীয়। এ ব্রত উচ্চস্তরের নীতিধর্ম। এগুলোই পঞ্চশীল বা পাঁচটি নির্দেশাত্মক নীতি যথা (ক) জীবহিংসা না করা (খ) অদত্ত গ্রহণ (চুরি) না করা (গ) অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা না করা (ঘ) অসত্য না বলা ও (ঙ) মাদকদ্রব্য ব্যবহার না করা। পূর্বোক্ত অষ্টবিধ পথে এ পাঁচটি নির্দেশও অন্তর্ভুক্ত। (ক)-তে বর্ণিত 'জীবহিংসা করবে না'-র অর্থ, শুধু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষেই জীবনাশ হতে বিরতি নয়, সবল বা দুর্বল প্রাণীদেরও ক্ষতি না করা বাঞ্ছনীয়। সম্রাট অশোকের এক রাজাজ্ঞায় এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। এতে জীবহত্যা ও যজ্ঞে আহুতিদান নিষিদ্ধ করা হয়। এ-নীতিরই ব্যাপক প্রয়োগে বৌদ্ধধর্ম

জগতের শ্রেষ্ঠ সহনশীল ধর্মমতে পরিণত। যেহেতু কদাপি গায়ের জোরে এর বিস্তার ঘটেনি। পরবর্তীকালে অহিংসা (জীবহত্যা না করার নির্দেশ যার অঙ্গ) হিন্দুধর্মেও স্বীকৃত হয়েছে। বাইবেলোক্ত দশটী আজ্ঞায় (Ten Commandments) অন্যতম 'হত্যা করবে না'-তেও অনুরূপ ভাব লক্ষণীয়। কিন্তু এর প্রয়োগক্ষেত্র মানবসমাজের বাইরে বিস্তৃত নয়। (খ)-তে বর্ণিত অদত্ত গ্রহণ না করার অর্থ সরল ভাষায় চুরি না করা। এর নির্গলিতার্থ হলো: যা' দেয়া হয়নি, তা' নিয়ে নেয়া হতেই শুধু বিরত থাকতে হবে না, এ-জাতীয় কাজ করান বা অনুমোদন করা হতেও বিরত থাকতে হবে। এর সদর্থক দিক উদারতা-ভূয়িষ্ঠ। বাইবেলোক্ত দশটী আজ্ঞার অন্যতম এই নিষেধ বাক্যের সঙ্গে তুলনীয়। (গ) অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা করবে না বা ব্যভিচার করবে না। এর প্রয়োগক্ষেত্র দ্বিবিধ: যথা সাধারণ লোকের বেলায় এতে করে অবৈধ যৌনসংসর্গ নিষিদ্ধ, আর মঠবাসীদের ব্যাপারে কৌমার্যব্রত পালনবিধি অপরিহার্য। (ঘ) অসত্য না বলা বা মিথ্যাচার না করার অর্থ কুৎসা রটনা, ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করা ও ভুয়া সাক্ষী সাজানোসহ সকল রকমের অনৃতভাষণ নিষিদ্ধ। এর সদর্থ হলো: প্রতিবেশীর ভালো দিকটাই বিশেষ করে বলতে হবে, শুধু যে সদ্ভাবের সহায়ক বাক্যই বলতে হবে তা' নয়। (ঙ) মাদক দ্রব্য ব্যবহার না করা বা নেশা না করার অর্থ হলো: অন্যকে মদ খাওয়ানো অথবা অন্যের এ-জাতীয় কাজ অনুমোদন করা অবিধেয়। যেহেতু এতে ভ্রম জন্মে; আর ভ্রমের পরিণতি পাগলামি অথবা হিতাহিত বোধশূন্যতা। পূর্ব-বর্ণিত পাঁচটী আজ্ঞা বা নির্দেশাত্মক নীতি ইতরজন ও ভিক্ষু উভয়েরই পালনীয়; কিন্তু শেষোক্তের পক্ষে আরো পাঁচটী নীতি বিশেষভাবে প্রতিপাল্য যথা বিধিরহিত সময়ে ভোজন না করা, নাচগান ও নাটকাভিনয় না করা, মালা সুগন্ধি ও অলঙ্কার ব্যবহার না করা, উঁচু বা প্রশস্ত বিছানায় না শোওয়া এবং রূপা বা সোণার কোন উপহার না নেয়া।

অষ্টবিধ পথের সপ্তম পর্যায় সৎ বা যথার্থ চিন্তা ভাবনা এবং অষ্টম পর্যায় সঠিক ধ্যান-ধারণা। এইটেই ভিক্ষুদের প্রতি বেশি মাত্রায় প্রযোজ্য। প্রথমোক্ত ব্যবস্থায় বুদ্ধ ও মঠের প্রশংসায় স্তোত্র ও শ্লোক উচ্চার্য। বুদ্ধও তো দেহী। তবে পরিনির্বাণ লাভের পর তাঁর নরদেহের অস্তিত্ব ছিল না। তাই প্রথমদিকে প্রার্থনা জানাবার মতো কোন মহাপুরুষের অস্তিত্ব কল্পনা করা যেত না, প্রার্থনারও কোন নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। কাজেই 'প্রতিমোক্ষ' বা আত্মদোষ স্বীকৃতির প্রথা প্রবর্তন। শেষোক্ত পর্যায়টি অর্থাৎ সঠিক ধ্যান-ধারণার প্রথা পূর্ব-প্রচলিত প্রার্থনার স্থলবর্তী হয়। এতে মনঃসংযোগ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যে শ্বাসপ্রশ্বাস প্রণালীর সুনিয়ন্ত্রিত চালনা বিহিত হয়। কাজেই বুদ্ধ সর্বপ্রকার আত্মনিগ্রহের বিরোধী হলেও কোন কোন যৌগিক-প্রক্রিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ নীতিধর্মে বুদ্ধের ব্যক্তিত্ব সর্বব্যাপী ; এর সঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতা অথবা মুক্তাবস্থা ও উদারতা জড়িত। তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বহু উপদেশ বুদ্ধ দিয়েছেন ; কিন্তু আক্ষরিক ভাবে নয়, এদের সারই শুধু গ্রাহ্য বলে নির্দেশ দিয়েছেন। পরিনির্বাণ লাভের প্রাক্কালে বুদ্ধের শেষ উপদেশে এটা সুস্পষ্ট। এতে তিনি বলেন: 'শিষ্যগণ, গৌণ উপদেশাবলী পরিহার করে নিজেরাই নিজেদের চালক বা আলোকবর্তিকা হবে।' এতে যে উদার ভাবের প্রকাশ, বোধিলাভের পর বেনারসে তাঁর প্রদত্ত প্রথম উপদেশে তারই সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষণীয়। এ-শিক্ষায় তিনি 'মধ্যপথ' অবলম্বনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাজেই 'অতি-ভোগ' ও 'অতি-সন্ন্যাস'—এ দুটোই তিনি পরিহার শিক্ষা দিয়েছিলেন। গৃহীদের সাধারণত তিনি সন্ন্যাস-দীক্ষা দিতেন না, 'অষ্টাঙ্গিক মার্গে'র ধর্মাচরণ শিক্ষা দিতেন। যার বৈরাগ্যোদয় ও সংসার হতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা হয়েছে, মাত্র তাকেই সন্ন্যাসে দীক্ষা দেওয়া হতো। তাঁর শিক্ষায় নির্বাণ লাভের প্রথম সোপান কার্যত

ধর্মাচরণ ও ধর্মাভ্যাস। উদ্যম ও প্রয়াসই হচ্ছে এর মূল ভিত্তি। এটাই বৌদ্ধ ধর্মের মৌলিক নীতি। এর উত্থান-পতনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ-উপদেশবাণীই তার পথপ্রদর্শকের কাজ করেছে। যেহেতু সাংসারিক সুখোপভোগ ও তাপসিক আত্ম-নির্যাতনের মাঝামাঝি পথই শুধু এ নয়, এতে সত্য পথ অনুযায়ী আদর্শ-সিদ্ধির সদুপায়ও নিহিত। নমনীয়, উদার ও পরিমিত এ অন্তঃপ্রকৃতিই বৌদ্ধধর্মকে অন্যান্য সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, বিশেষ করে জৈনধর্ম হতে বিশিষ্টতা দান করেছে। নিজ প্রকৃতিগত প্রণালীবদ্ধতা হেতু জৈনধর্ম একটী আনুষ্ঠানিক দুশ্চর সন্ন্যাসবাদে পর্যবসিত, পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম নিজ আত্মবিকাশ ও বিস্তারের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন জাতি ও কালের সঙ্গে প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলো। বুদ্ধধর্ম যে বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়েছিল, এটা তার মুখ্য হেতু। কিন্তু হিন্দু বা জৈনধর্ম নিজস্ব অন্তঃপ্রকৃতির ঋজুতা ও প্রণালী-বদ্ধতার নাগপাশে আবদ্ধ। এহেতু বিশ্ব ধর্মমতে পরিণত হবার সকল উপাদান থাকা সত্ত্বেও সে-গৌরবভাগী হবার সুযোগ তাদের হয়নি। এখানে দ্রষ্টব্য ব্যাপার এই: বৌদ্ধ নীতিবাদের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ এ-মধ্যপন্থাই চীনের ধর্মগুরু কনফুসিয়াস প্রচারিত মধ্যমাচার নীতি অথবা গ্রীক নীতিবাদের মূলতত্ত্বের সমগোত্রীয়।

বৌদ্ধধর্ম হীনযান ও মহাযান—এ দু'সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রথমোক্ত শ্রেণী বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্মের মৌলিক শিক্ষা আক্ষরিকভাবে অনুসরণের, আর শেষোক্ত শ্রেণী সার গ্রহণের পক্ষপাতী। অর্থাৎ প্রথম দল রক্ষণশীল ও দ্বিতীয় দল উদারপন্থী। প্রথম শ্রেণীর আদর্শ হলো আত্মকেন্দ্রিক 'অহং' (সন্ন্যাসী); তাঁদের কাছে আত্মানুশীলনই নীতিধর্মের প্রথম উপাদান। দ্বিতীয় শ্রেণীর আদর্শ হ'লো 'বোধিসত্ত্ব'; তাঁরা আত্মানুশীলনের খাতিরেই চিন্তা ও কাজে পরোপচিকীর্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। মহাযানপন্থীরা পরোপকারের জন্যে কাজ করে থাকেন; অন্যকে বোধি বা জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে

যাওয়াই তাঁদের উদ্দেশ্য। এ-মত অনুযায়ী নির্বাণ লাভের ব্যাপারে পারস্পরিক সহায়তা সম্ভবপর। প্রকৃতপক্ষে এতে পরোপকারবৃত্তি নিহিত। কাজেই মহাযান মতবাদ নীতির দিক থেকে বিচারেও আত্মসর্বস্ব হীনযানবাদ হ'তে বহুলাংশে প্রগতিশীল। এর বাস্তব ফলাফলও অবশ্য উল্লেখযোগ্য। চীন ও জাপানে যে বৌদ্ধ-প্রভাব লক্ষিত, এ-আদর্শকে বিন্দু করে তা' কেন্দ্রায়িত।

পূর্ণতা বা নির্বাণ অথবা বুদ্ধত্ব লাভের সহায়ক যে-ধর্মাচরণ, তা-ই 'পারমিতা' নামে অভিহিত। সেই ধর্ম ও নীতি পালনের জন্য বৌদ্ধ সংঘারাম স্থাপিত হয়। এতে ভিক্ষু ও সংসারী মানুষ উভয়েই আশ্রয় পেত। এদের আচারবিচার বুদ্ধ-প্রবর্তিত 'বিনয়'-বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। নিষেধাজ্ঞা ও নির্দেশাত্মক শৃঙ্খলারীতি বিনয়-বিধির অন্তর্ভুক্ত। সংঘে প্রবেশকালে প্রত্যেকের পক্ষে ত্রিরত্ন (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি।) ও পাঁচটি নির্দেশাত্মক নীতি পালনের প্রতিশ্রুতি দেয়া আবশ্যিক কাজ। কিন্তু জীবনের অন্যান্য মান সম্পর্কে সংসারী মানুষ ও ভিক্ষুদের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রভেদরেখা বর্তমান। কাজেই বৌদ্ধধর্মে দ্বিবিধ নৈতিক মান আচরণীয়, যথা—(১) ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের জন্যে লোকোত্তর শিক্ষা ও (২) সাধারণ শিষ্যদের জন্যে ঐহিক শিক্ষা। শেষোক্ত শিক্ষায় মাতা পিতার প্রতি ভক্তি, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্প্রীতি, শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধার অনুশীলন পার্থিব জীবনে স্বর্গলাভের উপায় বলে গণ্য। কিন্তু বৌদ্ধ আদর্শ অনুযায়ী নীতি-ভূয়িষ্ঠ হ'তে হ'লে 'শীল' বা নৈতিক বিধি পালনীয়। এর জন্যে ভিক্ষু বা সংসার-ত্যাগী শ্রমণ জীবন যাপনই কাম্য। তবে সংসারীদেরও নির্বাণলাভ হ'তে পারে। এর প্রমাণঃ বৌদ্ধ সংঘে ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও সংসারী পুরুষ-নারী উভয়েই শিষ্যরূপে গৃহীত হতো। এদের চার শ্রেণীকেই একটি সংস্থাভুক্ত পরিবারের মতো গণ্য করার নিয়ম ছিল। বুদ্ধের মতে পবিত্রতার আধার যেকোন ভিক্ষু বা সংসারীর মধ্যে কোন প্রভেদ

নেই। আবার নর-নারীর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বা যৌন জীবন সম্পর্কে বৌদ্ধ আদর্শও এস্থলে বিচার্য। নারী স্বভাবত দুর্বল প্রকৃতির; এহেতু তাদের পূর্ণ নৈতিক জীবন লাভের অনুপযোগী বলে মনে করা হতো; কিন্তু নারী-সমাজের প্রতি এ মনোভাব অশ্রদ্ধাসূচক নয়; যেহেতু পুরুষদের ক্রূরতা সম্পর্কেও নারীদের সজাগ থাকার ও হুঁশিয়ার করে দেয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে মহাযান সম্প্রদায় নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক দোষাবহ মনে করেন না। তাঁরা শাক্যমুনির পূর্ব-জন্মের সাংসারিক জীবনকে আদর্শ ব'লে গণ্য ক'রে থাকেন। কাজেই সাংসারিক জীবনযাপন 'পারমিতা' বা ধর্মানুশীলন ও বোধিলাভের সংগে সামঞ্জস্যহীন নয়। এরূপ অবস্থায় মহাযান মতবাদে নীতিধর্ম একটা সর্বব্যাপক ভিত্তির ওপর স্থাপিত। 'ব্রহ্মজালা' নামক একটি মহাযান গ্রন্থে বৌদ্ধ নৈতিক শিক্ষা বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। এটি চীন ও জাপানে বৌদ্ধ 'বিনয়' (অনুশাসন) সম্পর্কে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে স্বীকৃত।

যে-পথে পৌঁছুলে 'নির্বাণ' ও পরম আনন্দ লাভ করা যায়, বুদ্ধ সে-পথের পথিক; তাই তিনি তথাগত। তিনি 'বোধি' বা পরম জ্ঞান লাভ করেছিলেন; তাই তিনি বুদ্ধ। সিদ্ধিলাভের পর ধর্ম প্রচার মানসে তিনি প্রথম বেনারস যান। সেখানে তিনি বোধিদ্রুম তলে লব্ধ পরম সত্য তাঁর পূর্বতন শিষ্য পঞ্চ ভিক্ষুর নিকট প্রকাশ করেন। এই প্রথম উপদেশ বিতরণই 'ধর্ম-চক্র প্রবর্তন' নামে খ্যাত। এর পর তিনি সংঘারাম স্থাপন করেন। আর মুক্তিদায়ী এ নববাণী প্রচারের জন্যে দেশ-দেশান্তরের ভিক্ষুদের পাঠালেন। তাঁদের বললেন: 'ভিক্ষুগণ, বহু প্রাণীর হিতে, মানব-জাতির কল্যাণে, জগতের প্রতি করুণাপরবশ হ'য়ে তোমরা যাও। ধর্ম প্রচার কর, ঐ ধর্মের বাহ্য ও অভ্যন্তর, আদি, মধ্য ও অন্ত মহিমমণ্ডিত। এমন প্রাণী আছে, যাদের চক্ষু ভস্মাচ্ছাদিত নয়; কিন্তু তাদের কাছে ধর্ম প্রচার না করা হ'লে তারা মুক্ত হবে না।

তাদের কাছে পবিত্রতার জীবন ঘোষণা কর। তারা প্রণিধান পূর্বক একে গ্রহণ করবে।'

তাঁর প্রেম মৈত্রী করুণা ও অহিংসার বাণী একদা পূর্ব এশিয়া মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল। উড়িষ্যার রণক্ষেত্রে দ্বেষ হিংসা ও লোভের ভয়াবহ পরিণাম দেখে এদেশেরই সম্রাট অশোক বুদ্ধ-আবির্ভাবের মাত্র শ' আড়াই বছর পর তাঁর প্রেম ও মৈত্রীর বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন; রূপান্তরিত হয়েছিলেন 'প্রিয়দর্শী' অশোকে। তখন তিনি গৌরব শিখরে আসীন; বাহুবলে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। কিন্তু যুদ্ধের ধ্বংসকারিতা দেখে তিনি বিচলিত হলেন: মানুষের অপার দুঃখে তিনি হলেন অভিভূত। ভাবলেন: যে-প্রাণের বদল নেই, তার বিনিময়-মূল্য কি শুধুই অন্তহীন দুঃখরাশি? রাজ্যলাভের দুরাকাঙ্ক্ষার বেদীমূলে কি নরমুণ্ড গড়াগড়ি দেবে? রাজ্যের পর রাজ্য ছারখার হয়ে শ্মশান হবে? মানুষের সুখ কোথায়? বিজয়ীর মনেই বা শান্তি ও নিবৃত্তি কৈ? এ রাজ্যজয়ের সার্থকতা কোথায়—যদি না সে-জয়ে মানুষের পরম কল্যাণ হয়? তাঁর উপলব্ধি হলো: সকলের মূলে লালসা ও ভোগাকাঙ্ক্ষা। কাজেই এ পরিহর্তব্য। তাঁর আত্মশুদ্ধি হ'লো। তিনি স্থির করলেন: ক্ষাত্রশক্তিতে নয়, পৃথিবীকে প্রেম মৈত্রী ও করুণায় করবেন বশ। কারণ, অস্ত্র বলে লোক বশ মানে সত্য, কিন্তু মনে প্রাণে নয়। আর যুদ্ধ দ্বারা যুদ্ধের মূলোচ্ছেদ হয় না, বরং বাড়ে; আর বাড়ে বিদ্বেষ, ঘৃণা ও তিক্ততা। কাজেই শুরু হলো তাঁর প্রেম ও মৈত্রীর অভিযান। তিনি আশ্রয় নিলেন বুদ্ধে, শরণ নিলেন তাঁর মহাবাণীতে। পুত্র কন্যাকে তিনি পাঠালেন দেশান্তরে মৈত্রী প্রচারে; সারা রাজ্যে শিলালিপি ও পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ হলো প্রেমবাণী; অনুজ্ঞা ও অনুশাসনে নিষিদ্ধ হলো হিংসা, যাগযজ্ঞ ও পশুবধ। প্রজাহিত ও লোকহিতে তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন সারাদেশময় চটি, বিশ্রামাগার, চৈত্য ও সংঘারাম। দেশে দেশে পাঠানো হলো

শান্তিবাণীবাহী ভিক্ষুদল। এম্নি করেই একদা লোভ ও রিপুর তাড়না হ'তে মুক্ত সুপ্রাচীন ভারত যথার্থ শান্তি স্থাপন করেছিল; বিশ্বে শান্তি ও কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় হয়েছিল পথিকৃৎ।

স্বীয় অন্তর্লীন মহিমায় ও রাজশক্তির সহায়তায় বৌদ্ধধর্ম একদা ভারতের কর্ম ও চিন্তা, সংস্কৃতি ও সাধনায় এক নতুন প্রাণোচ্ছলতা এনেছিল। তাতে উদ্দীপ্ত সম্রাট ও শান্তিপথিক ভিক্ষুদের যৌথ প্রয়াসে বুদ্ধবাণী ও ভারতীয় সভ্যতা ভারতের সাগর-সীমানা পেরিয়ে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে;—অসভ্য বর্বরদের করে সভ্যতার আলোয় উদ্ভাসিত, আর জোগায় সভ্যদের মধ্যে নতুন ভাবাদর্শের প্রেরণা। সেই নবীন মন্ত্রে দীক্ষিত তারা,—নিজেদের 'শাক্যমুনির পুত্র' বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করেছে। এটাই প্রাচীন ভারতের দিগ্বিজয়। বাহুবলে এ সিদ্ধি হয়নি, হয়েছে মৈত্রীবলে। মহামতি অশোকের ভাষায় এর নাম 'ধর্মবিজয়'। এর লক্ষ্য ধনরত্ন লুণ্ঠন নয়—মনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিতরণ। সে ধর্মবিজয়ের স্মৃতিরূপে তথাগত বুদ্ধের পদলাঞ্ছিত মগধ-কাশী-কোশল এখনো পরম তীর্থরূপে পূজিত; চীন, জাপান, শ্যাম, সুমাত্রা, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ বলি, সিংহল ও তিব্বতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত।

কিন্তু যে-ধর্মমতের প্রভাব এতো গভীর ও ব্যাপক, সমগ্র পূর্ব এশিয়ার সভ্যতা সংস্কৃতিতে যেনীতি-ধর্ম ভাবের জোয়ার এনেছিলো, এবং এখনো যেখানে তা'র প্রভাব বিলক্ষণ অনুভূত, সে-ই বৌদ্ধধর্ম ভারত হতে নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেলো কেন? প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক; কিন্তু আলোচ্য প্রসঙ্গে অবান্তর মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবু সংক্ষেপে এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা যেতে পারে। 'বয়ধম্মা সংখ্যারা' অর্থাৎ সমস্ত বস্তুই বিনাশশীল—বুদ্ধ এ তত্ত্ব তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন। ধর্ম সম্পর্কেও এ-তত্ত্ব সমভাবে প্রযোজ্য। দেশকালের প্রয়োজন ও পরিবর্তনশীলতার দিক হতে বিবেচনায় ও তারই কষ্টিপাথরের বিচারে এ-ও নিয়ত পরিবর্তনশীল।

আসল কথা, দেশকালের প্রয়োজন মিটাবার পর সত্যের রূপান্তর ঘটে, অথবা তা'ও ত্যাজ্য বিবেচিত হয়। কাজেই হাজার বছর ভারতের প্রয়োজন মিটিয়ে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ও ব্যাপ্তি যদি স্বভাববশেই পরিবর্তিত, মন্দীভূত ও বিলুপ্ত হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু এ ব্যাখ্যা অনেকের নিকট গ্রাহ্য নয়; তাঁরা এর পতনের হেতু দ্বিবিধ বলে মনে করেন যথা (১) বাইরের আঘাত ও প্রতিকূলতা ও (২) অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। বুদ্ধ বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধতা করেন, বেদ মানেন নি, ব্রাহ্মণ পুরোহিত সমাজের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডের নিন্দা করেন, ব্রাহ্মণেতর জাতিগণকে ব্রাহ্মণের মর্যাদা দেন এবং জাতি-ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নরদেবত্ব প্রভৃতিকে বিদ্রূপ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেন। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠ ও প্রাচীন ধর্ম সমাজের অস্থি-মজ্জাগত। তার বিরুদ্ধাচরণ শুভ নয়, সহজও নয়। যীশুখৃষ্টের অবস্থা এর সমতুল। গোঁড়া ইহুদী ধর্মের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়ে তিনি শেষে ধর্মযাজকদের চক্রান্তে প্রাণ হারিয়েছিলেন। কালক্রমে খৃষ্টধর্ম বিশ্বধর্মে পরিগণিত; কিন্তু ইহুদীদের কাছে ত্যাজ্য। 'সনাতন' হিন্দুধর্মকে স্বীকার করে অনেকে অনেক সংস্কারের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অসার ছেড়ে সারকে গ্রহণের চেষ্টা যাঁরা করেছেন, তাঁদের লাঞ্ছনার সীমা থাকেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মহাবীর প্রচারিত জৈন ধর্মের উল্লেখ করা যায়। বুদ্ধ-ধর্মের মতো মগধ বা বিহারেই এর উৎপত্তি; কিন্তু জন্মস্থান একেও ছাড়তে হয়েছে, আর এখন ভারতের পশ্চিম ও দক্ষিণ প্রান্তে হিন্দুধর্মের সংগে আপোষ করে কোনরকমে টিকে আছে। কাজেই সনাতন গোঁড়ামির প্রতিকূলতা ভারতে বৌদ্ধধর্মের তিরোভাবের অন্যতম হেতু। দ্বিতীয়ত, বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যদের প্রচারিত ও আচরিত ধর্মে নিজ ধ্বংসের বীজ উপ্ত ছিলো। বুদ্ধ-পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মে আচরিত কতকগুলো বিষয় এধর্মকে বিনাশের পথে

এগিয়ে নিয়ে যায়। কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম সংসারত্যাগী সংসার-বিদ্বেষী সংঘারামবাসী সন্ন্যাসীদের ধর্মে পরিণত হয়। আর যে-সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করায় গৃহাশ্রমের অবমাননা হয় ও সন্ন্যাস জীবনের অস্বাভাবিক গুরুত্ব ও এর প্রতি শ্রদ্ধা লোপ পায়। আবার বৌদ্ধ ধর্মে নিরীশ্বরবাদ, অনাত্মবাদ, দুঃখবাদ ও অনিত্যবাদ মৌলিক বিশ্বাস বলে স্বীকৃত। জগতে সবই অনিত্য ও দুঃখময়, আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, নির্বাণের অর্থ দেহমনের নির্বিশেষ বিনাশ ও বিলোপ— এ শিক্ষা ভারতবাসীর প্রকৃতির অনুকূল নয়। এটি য়ুরোপীয় অন্তঃপ্রকৃতিরও বিরোধী। তবে মংগোল সভ্যতার সংগে এর মিল খুব বেশী; সেজন্যে মংগোল জাতির মধ্যে এ আশ্রয় নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"য়ুরোপীয় সভ্যতা মংগোলীয় সভ্যতার মতো একমহাল নয়। তার একটি অন্তরমহল আছে। সে অনেক দিক থেকেই Kingdom of Heaven-কে স্বীকার করে আস্‌ছে। * * কৃতকর্মতা নয়, পরমার্থই সেখানে চরম সম্পদ। অনন্তের ক্ষেত্রে সংসার সেখানে আপনার সত্য মূল্য লাভ করে। * * আমাদের সংগে য়ুরোপের কোথাও মিল যদি না থাকে এই বড়ো জায়গায় মিল আছে। * * এই অন্তরমহলে য়ুরোপের সংগে আমাদের যাতায়াতের একটি পদচিহ্ন দেখতে পাই।" (জাপান যাত্রী, পৃঃ-১২৩) কাজেই একদিকে শূন্যবাদ ও ঐহিকবাদ এবং অন্যদিকে জীর্ণ বৌদ্ধধর্মে ক্রমে মন্ত্রতন্ত্রাদির প্রভাব ও সংঘজীবনে বিবিধ দুরাচারের প্রবেশেও এর শক্তিহানি ঘটে। এ সবার সামগ্রিক ফলাফলের পরিণতিই ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্মের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করে।

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বড়ো অভিযোগঃ এতে অনাত্মবাদ, সর্ব শূন্যতা অর্থে নির্বাণবাদ ও অক্ষয় অমরতা সম্পর্কে আশাহীন অন্ধকারের প্রাধান্য। কিন্তু কথা এই, এ-সাধনা কি বন্ধ্যাত্বের? ধর্মচক্র প্রবর্তন উপলক্ষে বুদ্ধ বলেছিলেন, "আমি অমৃতত্ব লাভ করেছি।" এতো শূন্যতা নয়। কাজেই নির্বাণও সর্বশূন্য নয়।

বরং এ একটা ধারণাতীত বিশাল অসীমের অবস্থা। দুঃখ নিবৃত্তির অবস্থাই বুদ্ধের কাছে নির্বাণ; এটা সসীম সুখের বদলে চির সুখের অবস্থা। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তা নাশ হয়ে দুঃখের সম্পূর্ণ বিলুপ্তিই নির্বাণ, অথবা সসীম ও সদুঃখ অবস্থার অভাবই নির্বাণ। এ-অবস্থার সঙ্গে উপনিষদের মুক্তাবস্থার বিশেষ বিরোধ নেই। পরমাত্মা ও জীবাত্মাকে স্বীকার করে মানুষের চরম আদর্শ সম্পর্কে বেদান্ত যে-ধারণায় উপনীত, জীবাত্মাকে অস্বীকার করে ও পরমাত্মা সম্পর্কে নীরব থেকে বুদ্ধও সেই একই আদর্শে পৌঁছেছিলেন। কাজেই সকলের গন্তব্য স্থানই এক; প্রভেদ শুধু মার্গ ও দৃষ্টি-ভঙ্গিতে। আবার জৈনধর্মে নির্বাণের আদর্শেও পরমাত্মা মানা হয়নি; কিন্তু জীবাত্মার মুক্তাবস্থা কল্পনা করা হয়েছে। এ-ও বেদান্তের মুক্তির অনুরূপ। বস্তুত ভারতীয় সাধনার পথ বহু, কিন্তু আদর্শ ও লক্ষ্য অভিন্ন। আবার বুদ্ধের নির্বাণবাদ রিক্ততার অবস্থা' নয়; লৌকিক সুখদুঃখের অতীত উচ্চতর বিরাট অচিন্তনীয় একটা অবস্থা। সত্য বটে, তিনি সংসারকে জরাব্যাধিদুঃখময় বলেছিলেন; কিন্তু এর উর্ধ্বে সুখের কথাও তিনি না বলেছিলেন এমন নয়। দুঃখতেই মানবজীবনের পরিসমাপ্তি,—একথা তিনি বলেননি। বরং সংসারের তুচ্ছ বিনাশশীল আদ্যন্তবান সুখ ছেড়ে নির্বাণের অক্ষয় সুখ লাভে সচেষ্ট হতেই তিনি বলেছিলেন। কাজেই তাঁর শিক্ষা মূলত দুঃখবাদী নয়, বরং দুঃখদ্বেষী, তুচ্ছ সুখত্যাগী পরমানন্দবাদী বলাই সঙ্গত।

ব্রাহ্মণ্যবাদ বৌদ্ধধর্মকে স্বীকার করেনি, একথা ঠিক। কিন্তু একথা আরো সত্য, বৌদ্ধধর্মে যা' কিছু সুন্দর মহনীয় ও বরণীয়, তা'কে আত্মসাৎ করে নিতেও তার আপত্তি হয়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের নির্বাণের আদর্শ ভারতীয় সাধনার ব্রহ্ম-ধারণায় গ্রহণ করা হয়েছে। আবার বুদ্ধ-প্রবর্তিত লোকসেবা, লোকহিতব্রত ও সুকর্মচর্যা প্রভৃতি কল্যাণধর্মী শিক্ষা হিন্দু আদর্শের

শ্রী বাড়িয়েছে। যে-কর্মবাদ ও সর্বজীবে সমভাব ও অহিংস নীতি ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাধারার মূল ভিত্তি,—তা' তো বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মমতের নিকটই ঋণী। কাজেই কর্ম ও জ্ঞানযোগের আদর্শ প্রচার করে বৌদ্ধধর্ম একদিকে সনাতন ধর্মে নতুন দর্শন ও চিন্তাধারার সংযোগ ঘটিয়েছে, অন্যদিকে ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলায় নতুন জীবনসঞ্চার করেছে। তারই বিশ্বজয়ী চিত্ত-বিমোহন বাণী ভারত সীমান্ত ও সমুদ্র-সীমানা পেরিয়ে তার দক্ষিণ ও পূর্বদিগন্তে বিঘোষিত হয়েছে; তাকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করে অসভ্য ও অর্ধসভ্য হয়েছে সভ্য, আর সভ্য করেছে নিজস্ব ঐতিহ্যের পুষ্টিসাধন। এ-ভাবেই হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার বিস্তার, দ্বীপময় ভারত গঠন, মহা-ভারতের সৃষ্টি। এখন হতে আড়াই হাজার বৎসরাধিক কাল আগে রাজপুত্র সিদ্ধার্থ 'অহিংসা পরমো ধর্মঃ' বাণীর উদ্ভাবন করেন; আর সে মহাবাণীর উত্তরসাধক চণ্ডাশোক থেকে রূপান্তরিত ধর্মাশোক তা'কে রাজনীতিক্ষেত্রে করেন সার্থক প্রয়োগ। এটাই হয় তাঁর বিশ্বজয়ের বীজমন্ত্র। তার ফলে বিশ্ব হতে লোপ পেয়েছিল লোভ, পরস্বাপহরণবৃত্তি, ভয়, হিংসা, হানাহানি আর বাহুবলে রাজ্যজয় ও বিস্তারের দুরাকাঙ্ক্ষা। কাজেই ভয়মুক্ত পৃথিবী হয়েছিল শিষ্টের বাসযোগ্য ও দুষ্টের পক্ষে অসহনীয়। সে-যুগ ও সে-পরিমণ্ডল সত্যই ছিল সহাবস্থিতির সর্বোত্তম পরীক্ষা ও বাসক্ষেত্র। তারপর নানা সংঘাতবিদীর্ণ মধ্যযুগ পেরিয়ে ইতিহাসের বর্তমান সিংহদ্বারে আমরা উপনীত। তারই শেষার্ধে হিংসোন্মত্ত জগতে আর এক শক্তিধর মানুষ আবার এ পরীক্ষানিরীক্ষায় রত। তিনি গান্ধী-শিষ্য জওহরলাল; ক্রমবিস্তারশীল অখণ্ড জগদাদর্শ রূপায়ণে যাঁর আস্থা অটুট, 'পঞ্চশীল' নীতির সার্থক প্রয়োগে যাঁর উদ্যম অক্লান্ত। উৎপীড়িত ও বঞ্চিত পৃথিবীর একাংশে তাঁর নেতৃত্ব আজ অবিসম্বাদী। যাঁদের মতবিরোধ রয়েছে, তাঁরাও এর সার্থকতায় সন্দিহান নন। তাই ভীত

ও ভয়াল সকলের শেষ আশ্রয় অভয়মন্ত্র 'পঞ্চশীল'। কবির ভাষায় বলা যায় :

ঐ নামে একদিন ধন্য হল দেশ দেশান্তরে
তব জন্মভূমি।
সেই নাম আরবার এ দেশের নগরে প্রান্তরে
দান করো তুমি ॥
বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হোক। মুক্ত হোক মোহ আবরণ,
বিস্মৃতির রাত্রি শেষে এ ভারতে তোমারে স্মরণ
নব প্রভাতে উঠুক কুসুমি ॥
চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধন মন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি
এনে দিক অজেয় আহ্বান ॥

—'বুদ্ধদেবের প্রতি'—রবীন্দ্রনাথ

ফলত 'পঞ্চশীল' বৌদ্ধ দর্শনের ভিত্তিস্থানীয় নৈতিক আচারবিধি। সংসারী বুদ্ধ-ভক্ত অথবা শ্রাবকের পক্ষে এগুলো অবশ্য পালনীয়, —যদি ঐহিক দুঃখ দুর্গতি হতে বন্ধনমুক্তি তার কাম্য হয়। অবশ্য ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের বিশুদ্ধতা ও সুখশান্তি রক্ষার জন্যেই এসব বিধি পালন অত্যাবশ্যক। আবার শ্রমণ বা সংসার-ত্যাগী ভিক্ষুদের পক্ষে পরিনির্বাণলাভের উপায় স্বরূপ আরো পাঁচটি 'শীল' অপরিহার্য। অর্থাৎ সর্বসমেত ১০টি 'শীল' (দশশীল) বৌদ্ধ শাস্ত্রের মূল অঙ্গ। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য, জৈন বা বৌদ্ধ

মতবাদে এগুলো সাধারণভাবে স্বীকৃত। পক্ষান্তরে ভারতেতর যেসব দেশ—যেমন সিংহল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, চীন, কোরিয়া, জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, ইন্দোচীন, বা ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল, সেসব দেশেও এসব নৈতিক আদর্শ সাধারণ লোক মেনে নিয়েছিল। কাজেই এক সময় বৌদ্ধ ধর্মের 'শীল' বা নৈতিকবিধি দ্বীপময় ভারতে নৈতিক পুনরুজ্জীবনে সহায়ক হয়েছিল। সমগ্র মধ্য ও পূর্ব-এশিয়ায় এটাই ভারতের নৈতিকবিজয়। * এর পটভূমি ভারতের অতীত ইতিহাসের আড়াই হাজার বছর জুড়ে প্রসারিত।

একটা জানবার কথা এই: বৌদ্ধ-জগতের 'পঞ্চশীল' ও নেহরু প্রচারিত 'পঞ্চশীলে'র মধ্যবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালে 'পন্তজ-শীল' (Pantja-Sila) বা নব পঞ্চশীলের উদ্ভব ঘটেছিল আধুনিক ইন্দোনেশিয়ায়। এ-কাহিনী অনেকের কাছে অজানা। অথচ মজা এই, শ্রীনেহরু 'পঞ্চশীলের' কথা প্রথম শোনেন তাঁর প্রথমবার ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণকালেই; এটা ১৯৫০ সালের জুন মাসের ঘটনা। ইন্দোনেশিয়ায় এ তত্ত্ব প্রবর্তনের ইতিহাস মোটামুটি নিম্নরূপ: দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব শেষ ভাগ; জাপানীরা ওলন্দাজদের কাছ থেকে ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ কেড়ে নেয়; কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়ে পরে এখান থেকে সরে যায়। তখন রাজনৈতিক শূন্যতা সর্বব্যাপী। এম্নি সময় ডাঃ সুকর্ণ ও ডাঃ হাতার নেতৃত্বে ইন্দোনেশীয় জাতীয়তাবাদীরা নিজ দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সে সময়ও কিন্তু মানচিত্রে ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অস্তিত্ব ছিল, ইন্দোনেশিয়ার নয়। ইন্দোনেশিয়া ছিল ইতিহাস ও সংস্কৃতির পণ্ডিতদের কল্পনারাজ্যে। নানা

---

* **পাদটীকা**:—মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান এবং পশ্চিম এশিয়ার মিশর, সিরিয়া ও গ্রীসও (খৃঃ পূঃ ২৫০ বছর) অশোক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। পণ্ডিতদের মতে, গোড়ার দিকে খৃষ্টধর্ম বৌদ্ধ মতবাদে প্রভাবিত হয়।

চিহ্ন ও সংযোগ সূত্রের প্রমাণে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁরা একে ভারতের সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণ ক্ষেত্র বলে মনে করতেন; বলতেন একে ভারত দ্বীপ বা দ্বীপময় ভারত। অর্থাৎ Indo বা ভারত ও Nesos বা island (দ্বীপ)—এ দুটো গ্রীক শব্দ যোজনা করে রচনা করা হলো Indo-nesia বা দ্বীপময় ভারত। যেমন নতুন শব্দ সৃষ্টি করা হয়েছে Micro-nesia, Melo-nesia ও Polynesia. ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী নেতারা নিজ দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক সংযোগ সূত্রে গর্বিত। তাঁদের মধ্যে অনেকে ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী; এ সত্ত্বেও 'ইন্দোনেশিয়া' নামটার আবেদন, তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ তাঁদের মনের গভীরে সাড়া দিয়ে থাকে। এহেতু ওলন্দাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নতুন নামকরণ তাঁরাই করেন ইন্দোনেশিয়া।

১৯৪৫ সালে যবদ্বীপ ও অন্যান্য দ্বীপে অরাজক অবস্থা; জাতীয়তাবাদীরা নিপ্পনী ও ওলন্দাজ গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ সংগ্রামরত। তাই তাঁরা মহা বিব্রতও। যে-স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছে, তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই তাঁদের পণ। এজন্যে এক কমিটি গঠিত হলো। '৪৫ সালের ২৯শে মে হতে ১লা জুন, আবার ১০ই হতে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত কমিটির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনও হলো। ১লা জুন স্বদেশভক্ত ইন্দোনেশীয়দের এক বৈঠকে ডাঃ সুকর্ণ ইন্দোনেশিয়ার আদর্শ ও লক্ষ্য করলেন ঘোষণা। এটাই ইন্দোনেশিয়ার পঞ্চশীল বা জাতীয় পঞ্চনীতি। জাতির লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য তিনি নিম্নোক্ত পাঁচটি নীতি বর্ণনা করলেন যথা, (১) স্বাজাত্যবোধ বা Ka-bengsa—সংস্কৃত বংশ শব্দের অপভ্রংশ; ইন্দোনেশিয়ায় বংশ বা বেংশ জাতিবাচক; Ka হচ্ছে দেশজ ভাষার উপসর্গ; (২) বিশ্ব মানবিকতা বোধ বা Ke-manusia-an; সংস্কৃত 'মনুষ্য' শব্দের বিকৃতি; '(৩) Ke-merdeka-an বা স্বাধীনতা; 'মের্দেকা' সংস্কৃত 'মহাঋদ্ধির' বিকার; এর অর্থ, মহাসমৃদ্ধি, যা'

স্বাধীনতায় নিহিত; (৪) Ke-aditan বা ন্যায় বিচার; ন্যায়ের আরবী প্রতিশব্দ আদ্‌ল (ADL) ও (৫) Ke-tuhan-an বা ভগবদ্বিশ্বাস; শব্দটি দেশজ; 'তুহানের' অর্থ স্বামী, প্রভু বা পরমেশ্বর।

ডাঃ সুকর্ণ বললেন যে পাঁচটি আচার বিধিকে সংস্কৃতে 'পঞ্চধর্ম' (ইন্দোনেশীয় ভাষায় Pantja-Dharma) বলে অভিহিত করার কথা তাঁর মনে হয়েছিল। কিন্তু 'ধর্মের' সঙ্গে নীতি ও কর্তব্যবোধ জড়িত। কাজেই চরিত্র-নীতির আশ্রয়রূপে এ-পাঁচটি নীতিকে 'পঞ্চশীল' (Pantja-Sila) আখ্যা দেয়াই সঙ্গত। এই হলো ইন্দোনেশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডাঃ সুকর্ণ উদ্ভাবিত 'পঞ্চশীলের' সমাজ বা জাতিগত ব্যাখ্যা।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ১৯৪৫ সালের ১লা জুন ইন্দোনেশিয়ায় জাতিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধিকল্পে হয় পঞ্চশীলের রূপান্তরিত প্রয়োগ। তারই ঠিক ন' বছর পর জুন মাসেই তিব্বত-ভারত চুক্তি,—যা'র মূল সূত্র পঞ্চশীল-ভিত্তিক সহাবস্থান। শ্রীনেহরু এর প্রচারক ও চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন্ লাই সমর্থক। এ পঞ্চনীতি বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা ও ঠাণ্ডা লড়াই অবসানের প্রারম্ভিক ব্যবস্থা। শুধু জাতিগত ক্ষেত্রেই নয়, বৃহৎ ও ব্যাপকতর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর স্বার্থকতা সকল জাতিই প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। চীনের পর ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া ও রাশিয়ায় নীতি হিসাবে এ-আন্তর্জাতিক আচরণবিধি স্বীকৃত। * আবার যারা সামরিক গোষ্ঠি গঠনে বিশ্বাসী, তারাও ক্ষেত্রবিশেষে এর উপযোগিতায় আস্থাশীল।

---

* **পাদটীকা**:—এশিয়া-আফ্রিকা বা বান্দুং সম্মেলনে যোগদানকারী ২৪টি রাষ্ট্র (৫টি আহ্বানকারী কলম্বো শক্তি ছাড়া সংশোধিত 'পঞ্চশীল' নীতির অনুগামী। তাছাড়া, য়ুরোপের অস্ট্রিয়া, পশ্চিম জার্মানী, পোল্যাণ্ড এবং এমনকি সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বৃটেনও সহাবস্থান বিধির সমর্থক।

কাজেই পৃথিবীর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় পঞ্চশীল একটা নতুন তত্ত্ব বা মতবাদ। যেমন মুস্লীম শব্দ 'দার-উল-হার্ব' বা যুদ্ধবিগ্রহের দেশ বনাম 'দার-উল্-সালাম্' অথবা শান্তির দেশ পরিভাষাটি। আবার জার্মানীতে ধর্মযুদ্ধের সময় প্রচলিত 'কুজাস রেজিও, এজাস রেলিজিও' (Kujas Rejio, Ejus Religio) শব্দ,—যার অর্থ রাজার ধর্ম প্রজার পক্ষে অবশ্য গ্রহণীয়। * এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মন্‌রো-নীতি' বা Monroe Doctrineএর কথাই ধরা যাক্; নতুন মহাদেশের ঘরোয়া ব্যাপারে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের অনধিকার চর্চা রোধই যার উদ্দেশ্য। আবার সগুলুপ্ত কমিণ্টার্ণ বা কমিনফর্মের রাজনৈতিক আওয়াজ—বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রচারের জঙ্গী কূট-কৌশল। পক্ষান্তরে দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ বংশধরদের প্রভুবাদ Herrenvolk, বর্ণ বৈষম্যবাদ বা Apartheid রীতি—যে ব্যবস্থায় পাশাপাশি বসবাস করেও কৃষ্ণাঙ্গরা জীবনধারণের মৌলিক সুযোগ-সুবিধায় বঞ্চিত, শ্বেতাঙ্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে উৎসৃষ্ট। এসব তত্ত্বের গোড়ার কথা ঘৃণা দ্বেষ ও হিংসা; পক্ষান্তরে এদেরই বিপরীতধর্মী পঞ্চশীল বা সহাবস্থান বিধি। সদ্ভাব ও তিতিক্ষার যুগপৎ বাঙ্ময় ও বাস্তব প্রকাশ। ভারতবর্ষের বিগত পঁচিশ শ' বছরের একটা ধারা-বাহিকতা ও ঐতিহ্যগত পারম্পর্যের সরব সাক্ষী।

---

* পাদটীকা:—হিটলারী জার্মানীর Superrace theory বা বংশগত ও সাংস্কৃতিক আর্যামির বড়াইও এসঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতের পররাষ্ট্রনীতি

"যে রক্তাক্ত পথ অবলম্বন করার জন্যে পাশ্চাত্ত্যের দেহে আজ ক্লান্তির চিহ্ন পরিস্ফুট, সে-পথ ভারতের নয়। সরল ও সাদাসিধে জীবনযাত্রার মাধ্যমে বিনা রক্তক্ষয়ে যে শান্তি আসে, সে হচ্ছে ভারতের পথ। আত্মার বিনষ্টের আশংকা ভারতের সম্মুখে বিদ্যমান; কিন্তু আত্মাকে নাশ করে ভারত বাঁচতে পারে না। ভারত যেন অসহায় ও অলসভাবে না বলে যে, 'পাশ্চাত্ত্যের অভিযানকে বাধা দিতে পারছি না'। নিজের ও সারা বিশ্বের জন্যেও প্রতিরোধ শক্তি তাকে অর্জন করতে হবে। সারা জগতের কল্যাণের জন্যেই আমি ভারতের অভ্যুত্থান কামনা করি। ভারত আত্মনির্ভর ও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলে এবং লালসা বা শোষণেচ্ছা তার চিত্তে বিকার না ঘটালে, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্ত্যের কোন শক্তিই আর লোভাতুর দৃষ্টিতে তার দিকে নজর দেবে না; আর ব্যয়বহুল রণসজ্জার বোঝা বহন না করা সত্ত্বেও ভারত নিরাপদ বোধ করবে। কোন বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে আভ্যন্তরীন বৈষয়িক নীতিই হবে তার পক্ষে নিরাপদ দুর্গস্বরূপ। স্বাধীনতার চেয়েও মহত্তর আদর্শ আমার কাম্য। ভারতের স্বাধীনতা তথাকথিত দুর্বল দেশসমূহকে পীড়নমূলক পাশ্চাত্ত্য শাসন থেকে মুক্তি দেবে,—এই আমার কামনা।"

—মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

স্বাধীন দেশ মাত্রেরই প্রতিবেশী অথবা ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি একটা বিশেষ ধরণের মনোভাব থাকে; অথবা একটা সু-বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে অন্য রাষ্ট্রের প্রতি তার আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এর মূলে রয়েছে নিজ স্বার্থরক্ষার তাগিদ। এই তাগিদই নিরন্তর তাকে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে অথবা সম্পর্কচ্ছেদে প্রবুদ্ধ করে থাকে; অথবা একের বিরুদ্ধে অন্যকে লেলিয়ে দিতে প্রবৃত্ত করে; অথবা দুই বা বহুর মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করে নিজ স্বার্থোদ্ধারে উদ্বুদ্ধ করে। এর নাম কূটনীতি। ভিন্ন রাষ্ট্র সম্পর্কে এর সু-প্রয়োগই পররাষ্ট্রনীতি বলে অভিহিত।

কিন্তু কূটনীতি মূলত স্বার্থোদ্ধারের নীতি। সব সময়ই লক্ষ্মীর মতো চঞ্চল। এতে স্থিরতা নেই, নেই নিশ্চয়তা, নেই একনিষ্ঠার ভড়ং। স্থানকালপাত্রভেদে এর রীতিনীতির বদল ঘটে। একদিকে সমস্বার্থ বা স্বার্থ-সংঘাত, ছোট বড়োর নানা পরস্পরবিরোধী প্রলোভন ও চৌম্বকাকর্ষ, horizontal and vertical interest—অন্যদিকে নিজস্ব তাগিদ, ঐতিহ্যগত পারম্পর্য, সামরিক গুরুত্ব আব ভৌগোলিক দূরত্ব ও নৈকট্যের প্রশ্ন রাষ্ট্রনীতির স্থায়ী নিয়ন্তা। আসল কথা : জাতীয় স্বার্থ, ইতিহাস, ভূগোল ও সামরিক বলাবলই পররাষ্ট্র নীতি নির্ণয়ের মূল ভিত্তি। তবে অনুন্নত, আধা-ঔপনিবেশিক ও কৃষিপ্রধান দেশ বা বিধ্বস্ত ও হীনবল রাষ্ট্রগুলোর কথা আলাদা। তারা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ জাতীয় শ্রীবৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধনেব দিক থেকে নিজস্ব বৈদেশিক নীতি স্থির করে। প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখা, আর শক্তিজোটে না জড়িয়েও শক্তিমানের কাছ থেকে বিনাসর্তে যাবতীয় সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ তার কাম্য। যেহেতু তার পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনকালে কিছুটা সময় নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ও উপদ্রবহীন থাকা একান্ত দরকার। এই পটভূমিকায় সহাবস্থান ও বিশ্বশান্তির প্রয়াস বিচার্য।

সাম দান ভেদ দণ্ড। এ চারটি শব্দে প্রাচীন কূটনীতির মর্ম সূত্রাকারে গ্রথিত। রাজ্য-শাসনের ব্যাপারে কোথায় ও কখন কার সাথে মিত্রতা স্থাপন ও রক্ষা করা প্রয়োজন, কা'কে বশে রাখা দরকার, কা'র বা কা'দের বিরুদ্ধে ভেদ সৃষ্টি করা অপরিহার্য এবং ভেদ-ভিন্নদের মধ্যে কীভাবে দণ্ড-নীতির প্রয়োগ করে আত্মস্বার্থ উদ্ধার করা যায়,—সেসব কৌশল এ-সূত্রে নিহিত। মোটামুটি আধুনিক রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থায়ও এসব কূটপদ্ধতি মাত্রা ও রকম ভেদে অনুসৃত ও প্রযুক্ত হয়ে থাকে। তবে যে-দেশ যত দক্ষতার সঙ্গে এর প্রয়োগে কৃতিত্ব দেখাতে পারে, সে-দেশের পররাষ্ট্রনীতি অথবা ভিন্ন দেশের সঙ্গে তার আচার-রীতি ততো বেশি সফল, ততো বেশি উচ্চকিত।

কিন্তু কোনো দেশের পররাষ্ট্রনীতিই স্বয়ম্ভু বা অন্য-নিরপেক্ষ নয়। স্বরাষ্ট্র বা নিজ ঘরোয়া সংগঠন বা শাসন-নীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক গভীর, এবং এমনকি অঙ্গাঙ্গী। যে-রাষ্ট্র আত্ম-শাসনে অযোগ্য বা অ-কৃতি, অথবা যা'র বৈষয়িক নীতি ও সমাজ-সংগঠন দুর্বল, বা শাসন-পদ্ধতিকে জোরদার করার অনুপযোগী—তা'র পররাষ্ট্র নীতিও তদনুপাতে অক্ষম ও মেরুদণ্ডহীন। এর আসল কারণ, সম্বলহীন, দুর্বল বা পরনির্ভর স্বভাবতই নিজ অস্তিত্ব-রক্ষার লড়াই-এ শ্রান্ত ও পরাভূত। কাজেই তার পক্ষে বাইরের ঝড়ঝাপ্টা সহ্য করা, ঘরোয়া ব্যাপারে হলেও বহির্ব্যাপারে নিজ স্বার্থ-রক্ষা করা অথবা প্রকারান্তরে অনধিকার চর্চা করা বাতুলতা। অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করা তো তার দূরের কথা। কাজেই বৈষয়িক দিক থেকে যে দেশ যতো উন্নত, শিল্পায়নে অগ্রসর ও যার আর্থিক ও সামরিক বনিয়াদ সুদৃঢ়, আর তারই সঙ্গে তাল রেখে যা'র সমাজ-সংস্থা যতো প্রগতিশীল, পরিণামে রাষ্ট্রিক বা পর-রাষ্ট্রীয় কূটনীতির খেলায় তা'র জয় অনেকটা সু-নিশ্চত। অন্য দিকে যেসব দেশ শুধু কৃষি-ভিত্তিক ও কাঁচা মাল উৎপাদন ও সরবরাহকারী, আর যাদের সমাজ-ব্যবস্থায় মধ্যযুগীয় ছাপ সুস্পষ্ট, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে তাদের পক্ষে পাল্লা দিয়ে চলা অসম্ভব। কাজেই অন্যের ওপর প্রভাব-বিস্তারের উপযোগী মাল-মসলা ও নৈতিক বল যেসব রাষ্ট্রের নেই, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দূরপ্রসারী ফল-বিস্তারে তারা অপারগ। ভিন্ন কথায়, শিল্পোন্নতিই সামাজিক প্রগতি ও শ্রীবৃদ্ধির সূচক, জাতীয় পূর্ণাঙ্গতার লক্ষণ। এ জাতীয় রাষ্ট্রের ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ করা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী ও জাপানের কথা; উল্লেখ করা যেতে পারে সোভিয়েৎ রাশিয়ার কথা। অবশ্য এদের মধ্যেও রয়েছে শ্রেণী-বিন্যাস, জাত ও গোত্রের বিচার। এদের এক প্রান্তে গণতন্ত্রী, অন্য প্রান্তে সমাজতন্ত্রী। উভয় রাষ্ট্রের সামাজিক ও বৈষয়িক গঠন-প্রণালীই বিশেষ মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত।

তবে এ' দুয়ের মধ্যে রাষ্ট্রিক আদর্শে অমিল থাকলেও বৈষয়িক প্রগতি ও শিল্পায়নের চরম লক্ষ্যে মিল গভীর। উভয় শ্রেণীর রাষ্ট্রেই জাতীয় কর্মোদ্যোগ এই স্থিরবিন্দুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। কিন্তু গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোতে শিল্প-বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল বহুদিন আগে। তা-ই পৃথিবীর অনুন্নত ও কৃষি-প্রধান দেশগুলো তাদের পণ্যের বাজার, তা-ই বিশ্ব-জোড়া বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা। তারই ফল : অঢেল ভোগের সম্ভার ও উপাচারের প্রাচুর্যে জাতীয় আত্ম-প্রসারেব দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। তারই পরিণাম হিংসা, বিদ্বেষ, সন্দেহ শক্তিমত্ততা ও যুদ্ধবিগ্রহ।

কিন্তু সর্বগ্রাসী বিস্তারশীল মনোবৃত্তিকে রোধ করার তাগিদেই শুরু হয় জোট বাঁধার, শুরু হয় সাজ-সাজ রব। অস্ত্রেব ঝণৎকাব, প্রতিরক্ষার আয়োজন। এ হলো স্নায়ু যুদ্ধ—war of nerves, নীরব যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই—cold war. কিন্তু এ দুয়েব মাঝামাঝি গরম ও ঠাণ্ডা লডাই—Hot and cold war. এটাই যুদ্ধবিগ্রহের উপযোগী চেতনা জাগাবার বা war Psychosis সৃষ্টিব অধুনাতন পর্যায়।

সবকালে ও সবদেশে এরি হেরফের। প্রকৃতির বদল হয়নি এব ; হয়েছে রূপেব, হয়েছে আকার ও পরিমাণেব। আদিম গো-যান সভ্যতা আর শিল্প-ভিত্তিক সভ্যতা ও আণবিক যুগারম্ভের মধ্যে যে-মৌলিক প্রভেদ, আধুনিক ও প্রাচীন যুগেব যুদ্ধবিগ্রহে সেই প্রকারভেদ প্রত্যক্ষ। পুরাকালে যার সীমা ছিল মাত্র কয়েক মাইল, তার বিস্তার আজ শুধু দেশ নয়, মহাদেশও নয় ; সারা পৃথিবী জুড়ে। ইথার তরঙ্গ প্রবাহের মতো বিশ্বের এক প্রান্তের ঘটনাবলী আজ অন্য প্রান্তে সাড়া জাগায়।

একটা বিষয় মনে রাখা দরকার। শান্তিকালীন ও যুদ্ধকালীন অবস্থার মধ্যে বর্তমানে সীমারেখা অতি সূক্ষ্ম ; এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে একাকার। শান্তিকালীন জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা কখন

যে ঘূর্ণি-হাওয়ায় ওলট-পালট হয়ে যাবে, নিস্তরঙ্গ নীল সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়া বইবে, তা'র স্থিরতা নেই। কাজেই মানুষ সদা সজাগ সতর্ক। কখন অজ্ঞাতে চক্রীর জালে জড়িয়ে পড়তে হয়! কিন্তু এতো করেও রক্ষা নেই। বিশ্ব দুটো শিবিরে ভাগ হয়ে গিয়েছে। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভিন্ন রাষ্ট্রাদর্শ সত্ত্বেও যারা ছিল একই শয্যাসঙ্গী, তারাই সাধারণ শত্রুর নিপাতের পর—এখন বিভক্ত ও মোটামুটি দুটো পরস্পর-বিরোধী জোটে বিন্যস্ত। গণতন্ত্রী রাষ্ট্রজোট 'ন্যাটো' (উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থা), 'সিয়াটো' (দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা) ও বোগদাদ চুক্তির ছায়াতলে নিজেদের নিরাপদ ভাবছে। ভাবছে নানা সামরিক চুক্তি ও জোটের মাধ্যমে গ্রীনল্যাণ্ড হতে য়ুরোপ, এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড পর্যন্ত প্রায় এক রেখায় প্রসারিত সব এলাকাকে 'কম্যুনিজম'-এর কাল্পনিক জুজুর ভয় দেখিয়ে সোবিয়েতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার প্রাচীর তুলে দেয়া যাবে। কিন্তু সমর-কৌশলের অভাবনীয় পরিবর্তনে, রণনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তরে, প্রচলিত সমরাস্ত্রের বদলে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার প্রবর্তনে, এক কথায় আণবিক যুগের অভ্যুদয়ে—নতুন যুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত। কিছুকাল আগেও ছিল এ-অবস্থা ধারণাতীত। এখন একদিকে আমেরিকা ও বৃটেন, অন্যদিকে সোবিয়েৎ রাশিয়ার মধ্যে চলেছে আণবিক অস্ত্র ও হাইড্রোজেন বোমার ভয়ংকারিতা পরীক্ষার দৌড়। চালু হাতিয়ার সব অচলপ্রায়। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় অগ্রসর ও শিল্পোন্নত দেশগুলো মানব-কল্যাণে আণবিক গবেষণা কতটুকু নিয়োগ করবে, তা' নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয়। হয়ত আত্মহননে হবে এর উপসংহার। বিজ্ঞান-বুদ্ধির (দুর্বুদ্ধি?) এ পাল্লায় কার হবে জিৎ, কার হার,—কেউ জানে না। হয়ত হবে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তী অবস্থার সমতুল। উভয় পক্ষই নির্জীব; যুদ্ধে জিতেও পাণ্ডবগণ ক্ষীণবল, বান্ধবহীন। পৃথিবী শ্মশানতুল্য, বাসের অযোগ্য। এরূপ এক সম্ভাবিত আশংকায় আজ শুভবুদ্ধি পরায়ণ মানুষ ম্রিয়মান

হতাশ। কিন্তু আশার হাতছানি অন্তহীন। নিশ্ছিদ্র আঁধারের আবরণ ভেদ করেই তো ঊষার উদয়।

এহেন অবস্থা মানবজাতির। বর্তমান তা'র ক্রান্তিকাল। শিল্প ও বিজ্ঞান আসুরিক রিপুর বশ। কল্যাণধর্মী ব্রতে এদের নিয়োগ আংশিক মাত্র। বহু সাধনায় গড়া সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুফলনাশেই যেন মাত্রাতিরিক্ত উদ্যম। রচনাত্মক মানুষী প্রতিভার চরম উৎকর্ষ হলো পরমাণু শক্তির সন্ধান। কিন্তু তার সার্থক প্রয়োগ ক্ষেত্র কতকটা স্বেচ্ছায় সীমায়িত, কতকটা কুণ্ঠিত। মতলববাজ রাষ্ট্রনায়ক তথা মুনাফাবাজ চক্রীদলের কারসাজির পরিণামফল এ। তা-ই আণবিক শক্তির ভয়াবহ করাল রূপটাই এখন প্রত্যক্ষ; শান্ত ও শিবরূপ এখনো নেপথ্যে। এর কারণটা কি? কারণ: যেসব রাষ্ট্র শক্তিধর ও পরমাণু শক্তির অধিকারী, তারা একে অন্যকে করে ঈর্ষা। ঈর্ষা হতে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস হতে সন্দেহ, সন্দেহ হতে জন্ম ভয়ের। তারপর ভয় হেতু আত্মরক্ষার তাড়না। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি হতে উৎপত্তি হয় শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দামতা; তা থেকে জন্ম আত্মবিস্তার ও অন্যকে বশ করার আকাঙ্ক্ষা। তারই ফল প্রলয়ঙ্কর মরণাস্ত্রের নব নব উদ্ভাবন। মানব সমাজের এ একটা নেতিবাচক দিক। এখানে আত্মনাশের তৃষ্ণা প্রবল। পরমাণবিক আয়ুধ, হাইড্রোজেন ও কোবাল্ট (?) বোমার আবিষ্ক্রিয়া এ সবার বহিঃপ্রকাশ। এ নিয়ে বিপরীতধর্মী রাষ্ট্রগোষ্ঠিতে বিরামহীন প্রতিযোগিতা। শিল্প বলে আমেরিকার তুলনায় রাশিয়া কিছুটা ন্যূন। কিন্তু পরমাণুশক্তির গবেষণা ও মারণাস্ত্রের আবিষ্কারে দক্ষতা এমন কিছু কম নয়। শক্তির দম্ভ প্রকাশে উভয়েই ওস্তাদ। কূটনৈতিক খেলায় কেউ কম যায় না। তাদের ছলাকলা ও বিজৃম্ভনে বিশ্ববাসী ত্রস্ত। বিসুবিয়সের জঠরে যেন তাদের বাস।

এবারের কথা ছেড়ে দিলেও পৃথিবীতে বল-প্রমত্ততার অভাব ঘটেনি আগে। কাছের দৃষ্টান্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। তখন ছিল না

আদর্শগত সংঘাত; ছিল আত্মসম্প্রসারণের দুর্বার বাসনা; ছিল ভাগ-বাঁটোয়ারা করার তৃষ্ণা। পৃথিবীর নানা দেশের বন্দরগঞ্জে চাই নিজ পণ্য বিকির বাজার। চাই অনগ্রসর, অশিক্ষিত দেশে দেশে শাসন ও শোষণ। তা-ই নিয়ে বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর মন কষাকষি। তখন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর নেতা ইংলণ্ড; সসাগরা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। ভারতের মতো কাঁচা মালের জোগানদার কৃষিপ্রধান বহু দেশ তার পদানত; শিল্প-বাণিজ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কাইজার-চালিত জার্মানীও এমন কিছু কম নয়। শিল্প-বাণিজ্যে সে-ও সেরা। পৃথিবীর হাটে-বাটে তারও আনাগোনা। কিন্তু কূটবুদ্ধি ও চালে বৃটেনের সঙ্গে এঁটে উঠে না। তা-ই তার ঈর্ষা ও ক্রোধ। একটা উপলক্ষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দাবাগ্নি। ওতে সারা য়ুরোপ জড়িত। এশিয়ায় রাজ্যলোভী জাপান সংশ্লিষ্ট; বৃটেনের অধীন ভারতও ধনজন দিয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সেবায় নিয়োজিত। যুদ্ধের শেষদিকে ইংরেজ-পৃষ্ঠপোষক আমেরিকার আবির্ভাব। এর পরবর্তী ইতিহাস সুবিদিত। জার্মানী পরাজিত ও খণ্ডিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের কষ্টের অবধি নেই। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। দেশে দেশে হাহাকার ও অভাব-অনটন। কাজেই যুদ্ধকে ধরাধাম হতে নির্বাসন দিতে হবে; তাকে করতে হবে গলিত নখদন্ত। তা-ই মার্কিন-রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের নেতৃত্বে রচিত হয় রাষ্ট্র সংঘের সনদ। উদ্দেশ্য: আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা। কিন্তু আমেরিকাই শেষে সরে দাঁড়ায়; য়ুরোপের ব্যাপারে নিজেকে সংশ্লিষ্ট রাখতে অনিচ্ছুক। 'মন্‌রো-নীতি'র * খোলসে করে

---

* **পাদটীকা** :—'মন্‌রো নীতি'র জনক জেম্‌স মন্‌রো। ১৮১৬—২৪ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট। লাতিন আমেরিকায় স্পেনের বিদ্রোহী উপনিবেশগুলোকে সায়েস্তা করার জন্য য়ুরোপীয় শক্তিবর্গ ব্যবস্থা করতে পারে—অথবা রাশিয়া উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত তীরবর্তী অঞ্চল দখল করে নিতে পারে—এমন একটা শঙ্কা জাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। কাজেই

আত্মগোপন। শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তার শক্তি হয় সংহত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী প্রথম ক'বছরে রাশিয়ার অভ্যুত্থান এক বিস্ময়কর ঘটনা। আদর্শবাদ হ'তে এ রাষ্ট্রের জন্ম। প্রথম হতেই গণতন্ত্রের প্রতি স্পর্দ্ধা। তার সমস্ত রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের বিরোধী সে। কাজেই একে সূতিকাগারে নাশের চেষ্টা কম হয়নি। কিন্তু সফল হয়নি গণতন্ত্রী রাষ্ট্রজোট। তবু চেষ্টার বিরাম ছিল না। এরি ভেতর পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ও উপনিবেশবাদের গলদ মাথা চাড়া দেয়। পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক মন্দায় গণতন্ত্রী দেশগুলো নিজেদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় বিপন্ন। মহাযুদ্ধের ঋণশোধে অসমর্থ বৃটেনকে বার্ষিক দেয় ঋণের বোঝা হতে আমেরিকা অব্যাহতি দেয়। কিন্তু ত্রাণের পথ সংকীর্ণ। ইতিমধ্যে ভার্সাই সন্ধি দ্বারা খণ্ডছিন্ন জার্মানী জাতীয় সমাজতন্ত্রী হিটলারের নেতৃত্বে জাতীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। একদিকে চলে তার জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের উদ্বোধন ও দ্রুত শিল্প সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি, অন্যদিকে চলে সমরসজ্জা। এভাবে শুধু নিজ পিতৃভূমির অখণ্ডতা সাধন ও পূর্বগৌরবই ফিরিয়ে আনা হয়নি, জার্মানী হয়ে পড়ে পৃথিবী বিশেষ করে ভোগী গণতন্ত্রী দেশগুলোর লক্ষ্য। যেহেতু জার্মানী তার প্রাক্তন উপনিবেশের

প্রেসিডেন্ট মন্‌রো কংগ্রেসের নিকট প্রেরিত বার্তায় ঘোষণা করেন যে পশ্চিম গোলার্ধে য়ুরোপীয় শক্তিদের আর উপনিবেশ স্থাপন চলবে না এবং তারা এখানকার স্বাধীন গবর্ণমেন্টগুলোর ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করতে পারবে না। পক্ষান্তরে য়ুরোপে Republicanism-এর আদর্শ প্রচার চেষ্টারও তিনি নিন্দা করেন। এর মূলনীতি হলো: দু'টো আমেরিকা মহাদেশের যেকোনও ব্যাপারে য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের হস্তক্ষেপ রোধ ও বিশ্বব্যাপারে নির্লিপ্ততা। পরে অবশ্য নানা অবস্থায় এ-নীতির সঙ্কোচ ও প্রসার ঘটে। তবে মোটামুটি ১৯১৪ সাল পর্যন্ত য়ুরোপের কোন ব্যাপারে নাসা গলায়নি আমেরিকা। সুদীর্ঘ এ সময়টা তার ব্যবসাবাণিজ্য ও শিল্পের অভ্যুন্নতির কাল।

ফেরৎ ও বাণিজ্যের ভাগীদার হতে চায়; চায় আত্ম-বিস্তার। বৃটেন আত্মতৃপ্ত। ভাবলো: কিছু ছেড়ে দিয়ে যদি বঞ্চিত জার্মানীর ক্ষুধা মেটানো যায়। কিন্তু চেম্বারলেন-দালাদিয়ের জুটি কুখ্যাত মিউনিক চুক্তি ভেট দিয়েও হিটলারকে খুশী করতে পারেন নি। তাঁদের ধারণা ছিল: জার্মানী তাদের দলে ভিড়বে; সোবিয়েতের বিরুদ্ধে সে হবে হাতিয়ার। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিলও তা-ই। কিন্তু নিজ স্বার্থোদ্ধারের ব্যাপারে যা'র সঙ্গে যতটুকু মিতালী প্রয়োজন, তার চেয়ে এক তিলও বেশি তা'কে দিয়ে হয়নি। প্রথম দিকে বৃটেন ও ফ্রান্সকে ধাপ্পা দিয়ে তাদেরই যোগসাজসে নিজের কাজ হাসিল করে নেয় সে। পূর্ব-য়ুরোপের পোল্যাণ্ড ও অস্ট্রিয়া-হাঙ্গারী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ গ্রাস করে; পরে সুযোগ বুঝে পশ্চিম দিকে নজর দেয়। কিন্তু পেছনে দুর্জয় শত্রু সোবিয়েৎ রাশিয়াকে বৈরী রাখা চলে না। তাই রিবেনট্রপ-মলোটভ চুক্তি। পশ্চিম রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগপর্ব।

এর পরের ঘটনাবলী ইতিহাসের ছাত্রমাত্রই জানেন। আরো জানেন, আমেরিকার ভূমিকার বিষয়। সময় ও সুযোগ বুঝে আমেরিকা 'মনরো নীতি' পরিহার করেছে, তা-ই বড়ো কথা নয়। বড়ো কথা, আমেরিকার সাবেক কৌশলের মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। তার আগের নীতি ছিলো,—চারদিকে আত্মরক্ষার প্রাচীর গড়ে তোলা। এখন সে-নীতি সেকেলে। নিজ গণ্ডীর বিস্তার ও আক্রমণাত্মক ব্যূহ রচনাই তার প্রতিরক্ষার সাম্প্রতিক কৌশল। এ-ব্যূহ জগৎজোড়া। যাকে বলে Global Strategy. তারই খণ্ড খণ্ড রূপ 'ন্যাটো', 'সিয়াটো' বা 'বোগদাদ চুক্তি'।

বলা নিষ্প্রয়োজন, যুদ্ধান্তে আমেরিকা ধন-জন ও শিল্প-সম্পদের দিক থেকে সবার চেয়ে সেরা রাষ্ট্রে পরিণত। যুদ্ধে বৃটেন, রাশিয়া ও জার্মানীর তুলনায় তার ক্ষয়ক্ষতি নেহাৎ তুচ্ছ। যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষস্থল হতে তার অবস্থিতি বহুদূরে, নাগালের বাইরে। তাই তা'র সামগ্রিক লোকসান কম; তা'র শ্রমশিল্প, জীবন যাত্রা

ও বৈষয়িক বিন্যাস অটুট। বরং যুদ্ধের রসদ ও যুদ্ধান্তে য়ুরোপের পণ্য-সম্ভারের জোগানদাররূপে সে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলোর মহাজন। কাজেই সকলে তার মুখাপেক্ষী। সে প্রকারান্তরে সকলের নেতা।

কিন্তু সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে ভারতের অস্তিত্ব সবেমাত্র ৮।৯ বছর। শিল্প, বাণিজ্য ও বিজ্ঞানে পৃথিবীর আর আর প্রগতিশীল দেশের তুলনায় তার স্থান বহু নীচে। তবু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় তা'র আন্তরিকতা ও আগ্রহ অসীম। অন্য বিভাগের কথা ছেড়ে দিয়ে বলা যায়, পরমাণু-শক্তির রহস্য সন্ধান ও উন্মোচনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বারটি জাতের মধ্যে ষষ্ঠ স্থানীয়। শিল্পায়নও চলেছে তার দ্রুততালে। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সূচনা করা হয়েছে নদীশাসন, কৃষি-উন্নয়ন, জল ও তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গুরুভার শিল্পের ভিত্তি স্থাপন। সঙ্গে করা হয়েছে ও হচ্ছে পল্লী-উন্নয়ন, জাতীয় সেবা সম্প্রসারণ পরিকল্পনা রূপায়ণ, জমিদারী ও মধ্যসত্ত্ব লোপের ব্যবস্থা। আবার সামাজিক আচারবিধি সংশোধনেরও চেষ্টা চলেছে অবিরাম। আইন প্রণয়ণ করে হিন্দু বিবাহ ও উত্তরাধিকার আইনের বেশ খানিকটা পরিবর্তন করা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা নিবারণ, হয়েছে সংবিধানে সংখ্যালঘু ও খণ্ডজাতিদের অধিকার, সংস্কৃতি, শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষার ব্যবস্থা, হয়েছে নরনারীর সমানাধিকারের স্বীকৃতি ও দেওয়া হয়েছে প্রাপ্ত-বয়স্কদের ভোটাধিকার। কাজেই ভারতবর্ষের বৈষয়িক প্রগতির সঙ্গে সমাজ প্রগতির ধারাও সমান্তরালে চলেছে। একদিকে নিজের ঘরোয়া গলদ দূর করা, বৈষয়িক শক্তি সংহত করা ও শ্রীবৃদ্ধির দিকে তার খরদৃষ্টি, অন্যদিকে নিপীড়িত মানবগোষ্ঠির প্রতি তার অপরিসীম দরদ ও ঔপনিবেশিক শাসনের ঘোর বিরোধিতা। তাই এশিয়া ও আফ্রিকার পীড়িত নরকুলে স্বাভাবিক নেতৃত্বের পদে সে বৃত।

কাজেই ভারতের ভূমিকা দ্বৈত। এক—নিজের ঘর গোছানো ও সামলানো ; দুই—ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়। কোন স্বাধীন দেশেরই এ কর্তব্য হতে রেহাই নেই। তবে এ ব্যাপারে নিজ নিজ

শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী প্রত্যেকের প্রভাব প্রতিপত্তির মাত্রা কমবেশী হয়ে থাকে। যেদেশ শিল্প বিজ্ঞানে যতো বেশি উন্নত, বিদেশে তার ততো বেশি খ্যাতি ও খাতির; অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা তার ততো বেশি। অবশ্য এসব রাষ্ট্রের মধ্যেও দুটো শ্রেণীভেদ রয়েছে; একটি স্বার্থপর, উগ্র ও আত্মসাৎকারী, অন্যটি প্রশান্ত ও কল্যাণধর্মী।

ভারত তার পরিবেশ ও ঐতিহ্য অনুযায়ী দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ১৯৪৯ সালে রচিত ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রীয় আদর্শে ভারত কল্যাণ রাষ্ট্ররূপে (Welfare State) ঘোষিত। সর্বজনের হিতে এর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড উৎসৃষ্ট। বিশ্বকল্যাণ যজ্ঞ তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। পৃথিবীর অনেক গণতন্ত্রী দেশের সংবিধানের সার সংগ্রহ করে এর শাসনতান্ত্রিক ভিৎ গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু এখানেও ক্ষান্তি নেই। সমাজবাদী আদর্শেরও স্বীকৃতি দিয়েছে সে। তার রাষ্ট্রিক আদর্শেরও হয়েছে রূপান্তরের সূচনা। ১৯৫৫ সালে ২১-২৩শে জানুয়ারী আবাদী (মাদ্রাজ) কংগ্রেসে সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজবিন্যাস রচনার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। ভারত-রাষ্ট্রও তার শিল্পসংগঠনে এই আদর্শের রূপকার। কিন্তু এটী সমাজবাদী নয়, সাম্যবাদীও নয়, আবার ঠিক গণতন্ত্রসম্মতও নয়। বরং একটি মধ্যপন্থা, আপোষরফা। এতে ভারতীয় মানসিকতার ছাপই স্পষ্টত প্রতিফলিত।

রাষ্ট্রনায়কগণ বহুবার বহুস্থানে সরবে মধ্যপন্থার গুণগান করেছেন। এমনকি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল কংগ্রেস ও গবর্ণমেণ্টের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়েও * এই মাঝপথে চলার প্রবৃত্তিই উচ্চকিত। তাঁরা

* পাদটীকা:—১৭ই জুন ('৫৬) নারোরায় (উত্তর প্রদেশ) অনুষ্ঠিত উত্তরাঞ্চল কংগ্রেসসেবী সম্মেলনে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে ক্ষমতাসীন দল ও দেশের দৈনন্দিন শাসন পরিচালনার মধ্যে কংগ্রেসসেবীদিগকে মধ্যপথে চলিতে হইবে। অর্থাৎ একদিকে বৃটেন এবং অন্যদিকে রাশিয়া ও চীনে অনুসৃত পন্থার মধ্যে সমতা বিধান করিতে হইবে। * * বৃটেনের মত দেশে

আরো বলেছেন, এবং সুযোগ এলেই বলে থাকেন যে, ভারত কারু পদাঙ্ক অনুসারী নয়, কারু পতাকাবাহীও নয়—দক্ষিণমার্গী নয়, বামাচারীও নয়। নিজের ঐতিহ্য, রুচি ও স্বার্থ অনুযায়ী তা'র পথ রচনা ও চলা। অন্যের ভালো আত্মসাৎ করা তার কাম্য। নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু গ্রহণ করা তার স্বভাবসিদ্ধ। কাজেই ঠিক সমাজতন্ত্রী নয়, সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ-বিন্যাসের সে পক্ষপাতী; আবার গণতন্ত্রেরও পূজারী সে। কোন ছকবাঁধা উপায় নয়, শানবাঁধানো রাজপথ নয়, কেতাবী তত্ত্ব তো নয়-ই। যে পথে গেলে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছান যাবে সেই পথ তাকে করে নিতে হবে। শুধু অপেক্ষা দিক নির্ণয়ের। এহেন অবস্থায় মত ও পথের বালাই তার একেবারে নেই, একথা বলা ভুল। দুটো প্রান্তের,—এদিক বা ওদিক—কোন দিকই নয়; রাস্তার এধার বা ওধার দিয়ে চলাফেরা নয়, উভয়ের মাঝপথে নিজের পায়ে চলার পথ করে নেয়া। এটাই তার নিজস্ব বা বিশিষ্ট রীতি। তবে ভারতের ধ্রুব লক্ষ্য: দ্রুত উন্নতি—জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পবাণিজ্য ও সামাজিক পুনর্বিন্যাসের সকল বিভাগেই। যারা বহু অগ্রগামী তাদের পিছু হতে ধরবার চেষ্টা; যারা মাত্র পূর্বগামী তাদের সমতালে চলা ও প্রয়োজন বোধ হলে আগু বাড়িয়ে যাওয়া। এতো ভারতের নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন। এদিক হতে পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণে তার উদ্যোগ। এ বিষয়ে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত যে অনুসারী ও তার অভিজ্ঞতা থেকে লাভবান হ'তে ইচ্ছুক। কিন্তু সমাজ-সংগঠন ও রাষ্ট্রিক আদর্শের অনুকারী নয়।

শাসনপরিচালকবর্গের সঙ্গে রক্ষণশীল বা শ্রমিকদলের তেমন কোন সম্বন্ধ থাকে না। পক্ষান্তরে রাশিয়া ও চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টিই সরকার। * * * যন্ত্রবিদ্যা ও বিজ্ঞানের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বে নানা পরিবর্তন ঘটিতেছে। উহা আদর্শবাদের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত। যেকোন রাজনৈতিক দলকে টিকিয়া থাকিতে হইলে পরিবর্তনকে মানিয়া নিজেকেও তদনুযায়ী রূপান্তরিত করিতে হইবে।

তার সমাজবিন্যাসের ভিত্তি সনাতন। তাকে একদম ঢেলে সাজা নয়, তার বৈপ্লবিক পরিবর্তন নয়। তার উদ্দেশ্য চূণকাম, সংস্কার বা শিল্প-বিপ্লবজাত সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে কিছুটা অদলবদল ঘটানো। তবে এখন সমাজপতিদের নির্দেশ নয়, ধর্মীয় অনুশাসনও নয়,—স্রেফ জনমতের কেন্দ্রীভূত শক্তিপীঠ আইনসভায় প্রণীত বিধান সমাজ তথা রাষ্ট্র-জীবনের নিয়ন্তা। এভাবে সনাতন সমাজব্যবস্থার রূপান্তর ঘটছে। এর প্রভাব অদৃশ্যসঞ্চারী। এতে করে বৃহত্তর সমাজ-বিপ্লবের পটভূমি রচিত হচ্ছে মাত্র।

ভারতীয় জীবনের সকল স্তরেই বর্তমানে এই সমতাবিধায়ক শক্তি ক্রিয়াশীল। শিল্পায়নও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বিষয়ে নীতি স্থির করা হয়েছে: ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদ বরবাদ করা হবে না; বরং বিদেশী পুঁজি বেশী পরিমাণে আমদানী করে দেশে আরো ধনাগমের পথ সুগম করতে হবে, পাঁচশালা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণে তার সদ্ব্যয় করতে হবে। কাজেই সরকারী ও বেসরকারী দুটো কর্মোদ্যোগের ধারা পাশাপাশি চলেছে। তবে সরকারী ক্ষেত্র আগে ছিল অপরিসর, এখন তুলনায় সুপরিসর। ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল গৃহীত সরকারী শিল্পনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবে মাত্র ৯টি শিল্প ও জাতীয় সংস্থা পরিচালনার ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও উদ্যোগ স্বীকৃতি লাভ করে। এরো প্রায় সাত বছর পর '৫৪ সালে সংসদে ভারতের সামাজিক ও বৈষয়িক আদর্শ রূপায়ণে সমাজতন্ত্রী ধাঁচের সমাজ সংগঠনের নীতি গৃহীত হয়। আবার ১৯৫৬ সালের ১লা মে সংসদে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে-সংশোধিত শিল্পনীতি ঘোষণা করেন, তা'তে নবাদর্শের ছাপ স্পষ্ট। * এ-নীতি একাধারে গণতন্ত্র ও সমাজ

---

* পাদটীকা:—ভারত সরকারের শিল্পনীতি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি নিম্নরূপ:—

"শিল্পক্ষেত্রে ভারত সরকার যে নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন, তাঁহাদের ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলের প্রস্তাবে তাহা ঘোষণা করা হইয়াছিল। যে অর্থনীতির ফলে শিল্পোৎপাদন অবিরাম বৃদ্ধি পাইবে তাহার উপর ও সম্পদের

তন্ত্রের সংমিশ্রণ। Mixed economy বা মিশ্র অর্থনীতিরই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ। এ-ব্যবস্থাপনার মূল কথা: বেসরকারী ও সরকারী কর্মোদ্যোগের ক্ষেত্র ও সীমানা চিহ্নিতকরণ। যেসব বেসরকারী এলাকায় সবকারী অধিকাব বিস্তৃত করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রেও পূর্বেব বেসবকাবী মালিকানার উচ্ছেদ ঘটানো হয়নি ও হবে না। আবার সবকারী ও বেসরকাবী সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতা নয়, সহযোগিতাব ওপরই দেয়া হয়েছে বেশি গুরুত্ব। এমনকি প্রয়োজন হলে বেসরকারী শিল্পে সরকার অর্থ সাহায্য পর্যন্ত করবেন।

ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও বৈষয়িক নীতির সংক্ষেপ আলোচনার নির্গলিতার্থ হলো: আধুনিক ভারতের কর্মকাণ্ড মুখ্যত সমন্বয়-ধর্মী। আমূল পবিবর্তন বা বৈপ্লবিকতা তাব স্বভাব বা মেজাজের ঠিক অনুকূল নয়। কাজেই বিপ্লব বা অভ্যুত্থানের রক্তগঙ্গা পথ তার নয়। যুগ-যুগান্তের অপ্রমত্ততা তার পাথেয়। কালের স্থূল হস্তাবলেপের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণা। বিবর্তনমূলক রচনাত্মক কর্মধারার সাগব-সঙ্গমে তাব যাত্রা।

সমবণ্টনের উপর উক্ত প্রস্তাবে বিশেষভাবে গুরুত্ব আবোপ করা হয়। প্রস্তাবে আরও উল্লেখ করা হয যে, শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সরকার ক্রমেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিবেন। প্রস্তাবে বলা হয় যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ এবং আণবিক শক্তি ও রেলওয়ে যানবাহন (এই সব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব থাকিবে) ছাড়াও ছয়টি মূল শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন নূতন সংস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে রাষ্ট্র সম্পূর্ণরূপে দায়ী থাকিবে। অবশ্য জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইলে ক্ষেত্রবিশেষে বেসরকারী প্রচেষ্টার সহায়তা গ্রহণ করা হইবে। বাকী শিল্পগুলি বেসরকারী উদ্যোগের নিকট উন্মুক্ত থাকিবে বটে, তবে সে সকল ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ক্রমশই বেশি করিয়া অংশ গ্রহণ করিবে।

এই শিল্পনীতি ঘোষণার পর আট বৎসর কাল অতিবাহিত হইয়াছে। এই আট বৎসরে ভারতে গুরুত্বপূর্ণ বহু পরিবর্তন ও উন্নয়ন ঘটিয়াছে। ভারতীয়

এদিক হতে বিচারে ভারতের স্বরাষ্ট্র নীতি একটা বিশিষ্ট রীতি ও নীতির অনুগামী। অনেক সহৃদয় সমালোচক যা'কে জাতীয় প্রতিভার ধারানুযায়ী বলে মনে করেন। আর ভারতের পররাষ্ট্র নীতিও একে বিন্দু করে কেন্দ্রায়িত। অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি পরস্পর-নির্ভর ও পরস্পর-সম্পৃক্ত। যেন বিহঙ্গের দুটো ডানা। একের বলে অন্যের বল, একের শক্তিক্ষয়ে অন্যের শক্তিনাশ। আবার ঘর হলো শক্তির মূলাধার। বাইরের বহুমুখী বিচিত্র কর্মধারা তারই বাহ্যিক প্রকাশ মাত্র! যদি ভারতের পররাষ্ট্র নীতির শতমুখী বিস্তার হয়ে থাকে, তার দিব্য শিখা বিশ্ব-গগন আলোকিত করার উপযোগিতা লাভ করে থাকে তবে স্বরাষ্ট্র-নীতির সফলতায় তা'র মূল উৎস নিহিত।

শত্রুমিত্র সকলের মতে এতো অল্প সময়ে ভারতের এহেন রূপান্তর ঘটিবার বা বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের চোখে মর্যাদা ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবার ইতিহাস বিস্ময়কর। যেহেতু, মাত্র বছর কয়েক আগেও তার স্বাধীন ও সার্বভৌম অস্তিত্ব ছিল না। ইতিহাস ও

সংবিধান কার্যকরী করা হইয়াছে। সংগঠিতভাবে পরিকল্পনার কার্য পরিচালিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদও শেষ হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনই রাষ্ট্রের সামাজিক ও বৈষয়িক নীতির লক্ষ্য হিসাবে সংসদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে, বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে শিল্পনীতি সম্পর্কে নূতন একটি ঘোষণার প্রয়োজন আজ দেখা দিয়াছে। সংবিধানের নীতি, সমাজতন্ত্রের আদর্শ ও গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এই নীতি নির্ধারিত করিতে হইবে।

ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের জন্য সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার, চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্ স্বাধানতা এবং ধর্মীয় বিশ্বাস ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা ও সমান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হইবে।

ভূগোলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের 'মধ্যমণি'-রূপে ছিল তা'র যা' কিছু পরিচয়। তবে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিধর সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রের শাসন ও শোষণকেন্দ্র। তার নাড়ীর যোগ দেশের মাটি ও মানুষের সঙ্গে নয়; বরং লণ্ডনের সঙ্গে ছিল তার গাঁটছড়া বাঁধা। বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতির স্বার্থবাহ মাত্র সে। কাজেই অনিবার্য যা' তা-ই হয়েছিল। কুশাসন ও শোষণে ভারতবাসীব মেরুদণ্ড গিয়েছিল বেঁকে, মনুষ্যত্ব হয়েছিল নাশ; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সম্পদ হয়েছিল নিঃশেষ। আত্মার বিনাশ ঘটেছিল, হয়েছিল মহতি বিনষ্টি।

এর পরের ঘটনাবলী সমকালীন ইতিহাস। তার পার্শ্বচরিত্র ভারতের আপামব জনসাধাবণ; তাব সাক্ষী বিশ্ববাসী। আজ যে ভারতের পবরাষ্ট্র নীতি কারু প্রশংসা, কারু প্রচ্ছন্ন নিন্দা, কারু সংশয় ও কারুর বিরূপতার হেতু হয়েছে, তার মূল ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপে নিহিত। কিন্তু পররাষ্ট্র নীতি 'অর্কিড' নয়; শূন্যে এর স্থিতি নয়। এর ফলশ্রুতি দীর্ঘকালীন ধারা-বাহিকতার পরিণাম, একটা পারম্পর্যযুক্ত ব্যাপাব। হঠকারিতা ও

সরকারেব রাষ্ট্রনীতি পবিচালন সম্পর্কিত নির্দেশাবলীতে বলা হইয়াছে যে, সরকার জনগণের মঙ্গল বিধানেব জন্য সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা কবিবেন। এজন্য এমন একটি সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে যেখানে জনসাধাবণ সামাজিক, বৈষয়িক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচাব লাভ কবিবে। অধিকন্তু নিম্নোক্ত বিষয়-গুলির প্রতি সরকারকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখিতে হইবে—(ক) দেশের প্রত্যেক নাগরিকের নারী পুরুষ সমভাবে—যথোপযুক্তভাবে জীবিকা অর্জনের অধিকার আছে; (খ) দেশের সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমনভাবে পরিচালিত করিতে হইবে যাহাতে সাধারণ লোকে যথাসম্ভব বেশী উপকৃত হয়; (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেন এমনভাবে পরিচালিত না হয় যাহার পরিণামে ধন সম্পদ কেন্দ্রীভূত হইয়া পড়িবে এবং উৎপাদনের উপায় গণস্বার্থ বিরোধী হইয়া উঠিবে; (ঘ) নারী ও পুরুষের ক্ষেত্রে একই ধরণের কাজের বেতন যেন একই

আকস্মিকতার অবকাশ এতে কম, এমনকি নেই বল্লেই চলে। দেশের জলবায়ু ও মাটির রসে নিষিক্ত এর মূল। তাতেই এর বিকাশ ও বৃদ্ধি। কাজেই কোন দেশেরই বৈদেশিক নীতি সে-দেশের ইতিহাস-বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। ভারতের বেলায়ও এ-সত্য সমান প্রযোজ্য। অথচ তার পর-শাসন ও স্ব-শাসনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ব্যবধান কত অল্প। এরি ভেতর তাকে ঘর গুছাতে হয়েছে, নিজের শাসন-ব্যবস্থা স্থিতিশীল করতে হয়েছে; আবার নতুন রাজনৈতিক দর্শন ও চিন্তাধারারও বিবর্তন হয়েছে তার। শোষিত ও দাস দেশগুলোর পক্ষে সে হয়ে উঠেছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ; কোন কোন ব্যাপারে তারা তা'র মুখাপেক্ষী। এ-ভাবেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে ভারতের একটা পূর্ণাঙ্গ ও বলিষ্ঠ পররাষ্ট্র নীতি। যেকোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষে যা' রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতিপথ বরাবর সর্পিল ও কুটিল। এখানে নানা পরস্পরবিরোধী স্বার্থের সংঘাত; নিরন্তর ভেদ-বিভেদের খেলা। বিরামহীন সমুদ্রমন্থন, অমৃতকুম্ভের সন্ধানে দেবাসুরের সংগ্রাম। তাই বাসুকীনাগ ক্লান্ত; উদ্গীরণ করে

প্রকার হয়; (ঙ) নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকবালিকাদের স্বাস্থ্য ও সামর্থের যেন অপব্যবহার না হয় এবং আর্থিক দুরবস্থার জন্য নাগরিকরা যেন এমন কিছু করিতে বাধ্য না হয় যাহা তাহাদের বয়স বা সামর্থের পরিপন্থী এবং (চ) শিশু ও যুবকদের যেন শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধোগতি হইতে রক্ষা করা হয়।

জাতীয় উদ্দেশ্যরূপে সমাজতন্ত্রী সমাজ সংগঠনের নীতি স্বীকৃতি লাভ করার সুপরিকল্পিত ও দ্রুত উন্নয়নের জন্য যাবতীয় মূল ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প অথবা জনসাধারণের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক সংস্থা রাষ্ট্রিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হওয়া দরকার। অন্যান্য যেসব শ্রমশিল্প অত্যাবশ্যক এবং বর্তমান অবস্থায় যাহাদের মূলধন একমাত্র রাষ্ট্রই সরবরাহ করিতে সক্ষম তাহাদেরও সরকারী কর্তৃত্বে আনা প্রয়োজন। সুতরাং ব্যাপকক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ শিল্পায়নের ব্যাপারে

কালকূট। তারি বিষের ধোঁয়ায় পৃথিবীর শ্বাসনালী রুদ্ধ। কাজেই প্রয়োজন একজন নীলকণ্ঠের, একজন বিষহরির। যিনি আকণ্ঠ বিষ পান করেও অমর। ভারতের ভূমিকা যেন কিছুটা এ-জাতেরই। উপমাটা হয়ত জুতসই নয়, হয়ত কা'রো কাছে আপত্তিকরও হতে পারে। তবু একটা বিষয়ে সকলে নিঃসংশয়ঃ পৃথিবীর দুটো শক্তিগোষ্ঠির মধ্যে মনকষাকষি ও ভুল বুঝাবুঝি দূর করার ব্যাপারে তার জুড়ি নেই। আবার উপকথার বাঁদরের পিঠা ভাগের নীতিতে তার আস্থা কম। অথবা প্যাঁচ কষে উভয়কে ঘায়েল করা ও তৃতীয় একটা শক্তিগোষ্ঠির উদ্ভব ঘটিয়ে তাদের নেতৃত্ব করাও তার মনোমত নয়। অথবা বিশ্ব ব্যাপারে নেতৃত্বের শূন্য আসন পূর্ণ করা তার কাজ নয়। তার কাজ হলো, সকলের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা ও অসদ্ভাব থাকলে তা' দূর করতে সহায়তা করা। তা'ও আবার যদি উভয়পক্ষ মধ্যস্থ মান্য করে। ফলত তার উচ্চাশা কম, দুরভিসন্ধি তো নেই-ই। বরং আছে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে স্থিতাবস্থা বা অন্য কথায় শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার সুবুদ্ধি। যা' তার পক্ষে হিতকর; যা' সদ্যোস্বাধীন দেশগুলোর

রাষ্ট্রকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। ইহা সত্ত্বেও কয়েকটি বিষয়ে সরকারী সামর্থেরও একটা সীমা আছে; এই হেতু বর্তমান পর্যায়ে আরও উন্নয়নের জন্য কতটা পর্যন্ত দায়িত্ব ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে এবং কোন্ কোন্ শিল্প পরিচালনা করিবে, সেসব বিষয় তাহার পক্ষে ব্যাখ্যা করা বিধেয়। পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সমস্যার যাবতীয় দিক বিবেচনা করত ভারত সরকার শ্রমশিল্পগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; ঐ গুলিতে সরকারী ভূমিকা কী হইবে, তাহাও এই সঙ্গে বিবেচনা করা হইয়াছে। কিন্তু মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্য সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন; আরও মনে রাখা দরকার, যে কোন শ্রেণীর শিল্প পরিচালনার ভার রাষ্ট্র গ্রহণ করিতে পারিবে।

এই সব মৌলিক ও সাধারণ নীতি পরবর্তী কালে আরও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সমাজতন্ত্রী সামাজিক সংগঠন ভারতের

স্বাধীনতা রক্ষার উপায়স্বরূপ; যা' তাদের বৈষয়িক ও সামাজিক অভ্যুন্নতির একমাত্র সোপান। কাজেই ভারতের পররাষ্ট্র নীতি মুখ্যত জাতীয়; তার নিজ কল্যাণ ও প্রগতির পরিপূরক। ইংরেজী পরিভাষায় একে বলা হয় Enlightened Self-interest.

যেকথা বলা হচ্ছিল। ভারতের পররাষ্ট্র নীতির বয়স তো সবে ৮।৯ বছর। একেবারে অপরিণতবুদ্ধি শিশু। অথচ হালচালে এরি ভেতর সে সাবালক। তবে নিছক স্বার্থবুদ্ধিতে চালিত সে নয়; হলে সাময়িক স্খলন ঘটা বিচিত্র ছিল না। কিন্তু হতে পারেনি, যেহেতু অতীতে রয়েছে একটা ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ ও বিচিত্র মনোময় ইতিহাস। তারি ধারাস্রোত—রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তির সাধনা ও জাতীয় নেতাদের শিক্ষার উত্তরাধিকার। এরি ওপর ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল বনিয়াদ সু-প্রতিষ্ঠ।

একটা কথা লক্ষ্য করার মতো। কেউ কেউ বলেন: যেহেতু ভারতের স্বাধীন সত্তা বহুকাল ছিল না এবং ছিল না বলেই,—ছিল না তার সত্যিকার জাতীয় বৈদেশিক নীতি,—সেহেতু নতুন দৃষ্টিকোণ হ'তে প্রতিটি বিষয় বিচার বিবেচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা

সামাজিক ও বৈষয়িক লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং অন্যান্য নীতির মতো শিল্প সংক্রান্ত নীতিও পূর্বোক্ত নীতি ও নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।

এই সব লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার ও শিল্পায়ন দ্রুততর করা, বিশেষ করিয়া গুরুভার শ্রমশিল্প ও যন্ত্রনির্মাণ শিল্প গড়িয়া তোলা, রাষ্ট্রিক উদ্যোগের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করা এবং বিশাল ও ক্রমবর্ধমান সমবায়মূলক প্রচেষ্টার এলাকা সংগঠন করা প্রয়োজন। লাভজনক কর্মসংস্থান, জীবন ধারণের মান এবং জনসাধারণের কাজের অবস্থার উন্নয়নকল্পে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য এই সব বিষয় বৈষয়িক ভিত্তি বলিয়া স্বীকৃত। অনুরূপ ভাবেই আয় ও ধনাগমের মধ্যে বৈষম্য দূর করা বিধেয় এবং বেসরকারী একচেটিয়া ব্যবসায় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাত্র জনকয়েকের হাতে বৈষয়িক ক্ষমতা সংহত হওয়া

করা আর মীমাংসায় পৌঁছা তার পক্ষে যত সহজ, অন্যের পক্ষে ততো নয়। কথাটা এক হিসেবে সত্যি। কারণ দেখা গিয়েছে, পৃথিবীর গতানুগতিকতায় সায় দেওয়া তাব পক্ষে সম্ভব হয়নি বা হয় না ; গড্ডালিকা প্রবাহের মতো শক্তিমানের নিকট নতি স্বীকার করেনি সে, বা শক্তিজোটেও ভিড়ে পড়েনি। ভিড়লে আপাত-লাভের সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। আবার সহজ-লাভের উন্মাদনায় বেচাল বা বেদিশা হবার শঙ্কাও তার কম ছিল না। অন্যান্যের ক্ষেত্রে এ জিনিসটাই বেশী করে নজরে পড়ে। নিজের জোরে নয়, খুঁটির জোরে তাদের নাচন-কোঁদন। এটা শক্তির লক্ষণ নয়, শক্তির মত্ততা। ভারত তা-ই প্রথম থেকেই জাতীয় ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করে সমুখপানে এগিয়ে যেতে সঙ্কল্পবদ্ধ।

যে-কোন রাষ্ট্রেরই বৈদেশিক নীতি তার বহুকালের সাধনালব্ধ ধন। ওটা প্রকারান্তরে তার ঘরোয়া নীতিরই Conditioned reflex বা মানসিক প্রতিফলন। ওতে ক্ষমতাসীন দলেব তো বটেই, বিরোধী পক্ষেরও কর্মনীতি স্ফুট। আমেরিকা ও বৃটেনে বা ফ্রান্সে যা'কে বলা হয় Bipartisan বা দ্বিপাক্ষিক নীতি। ঐ সব দেশে সরকার ও সরকার-বিরোধী উভয় পক্ষের মধ্যে বুঝা-পড়া করেই পররাষ্ট্র নীতির প্রয়োগরীতি স্থির করা হয়। এ-পদ্ধতি অবশ্য বহুদিনের অনুশীলনের পবিণতি। ভারতেও বিগত কিছুকাল

অনুযায়। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাষ্ট্র ক্রমশ বেশিমাত্রায় নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা ও পরিবহন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার ব্যাপারে সরাসরি দায়িত্ব লইবে। সরকারী উদ্যোগে ব্যবসায় পরিচালনার ভারও ক্রমশ বেশি করিয়া রাষ্ট্র গ্রহণ করিবে। আবার সুপরিকল্পিত জাতীয় উন্নয়নের এজেন্সিরূপে বর্তমান পট-ভূমিকায় বেসরকারী কর্মোদ্যোগও গড়িয়া উঠিতে ও সম্প্রসারিত হইতে পারিবে। যেথানে সম্ভব সেখানেই সমবায়মূলক নীতি প্রয়োগ করিতে হইবে। এবং বেসরকারী কর্মোদ্যোগের একটা বধমান অংশকে সমবায়মূলক ভিত্তিতে পরিচালিত করিতে হইবে।”

যাবৎ এদিকে একটা ঝোঁক দেখা দিয়েছে। কিন্তু অন্যান্য গণতন্ত্রী দেশে যেরূপ হয়ে থাকে, যেভাবে বৈঠক ও মন্ত্রণা মারফৎ বৃহত্তর প্রশ্ন ও বিশ্ব সমস্যা সম্পর্কে জাতীয় মনোভাব স্থির করা হয়, সেভাবে এখানে তেমন কিছু এখনো হচ্ছে না। তবে ভারতীয় সংসদে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে যে-সরকারী নীতির বিচার বিবেচনা ও সমালোচনা করা হয়ে থাকে, তাতেও প্রধান বিরোধী দলভুক্ত কম্যুনিষ্ট বা প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্যগণ মোটামুটি সায় দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরাও ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতির সারবত্তা ও যাথার্থ্য স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন।

কিন্তু কথাটা হলো: ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি অতীতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কিনা,—যেমন সম্পর্কহীন জার-আমলের রাশিয়ার সঙ্গে কম্যুনিষ্ট রাশিয়া। তবে তুলনাটা এক্ষেত্রে ঠিক লাগসই নয়। যেহেতু জার-শাসিত রাশিয়ার ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রিক সত্তা ছিল, কিন্তু ইংরেজ-শাসিত ভারতে ছিল তার একান্ত অভাব। যা' কিছু ছিল, তা'ও বৃটেনের শোষণ ও শাসনের তাগিদে। অথচ একটা জায়গায় ছিল উভয়ের মিল গভীর। সেটা হলো: উভয়েই শাসিত হতো সাম্রাজ্যিক ও উপনিবেশিক প্রয়োজনে। হলোই বা একজন শাসক দেশীয়, আর অন্য জন বিদেশী ও বি-জাতি। তাই উভয় দেশের সাধারণ মানুষ শোষিত, নিরন্ন ও বঞ্চিত। উভয় দেশ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পে অনুন্নত। কিন্তু বিপ্লবোত্তর রাশিয়া ও সদ্যোস্বাধীন ভারতের মধ্যে অমিলও দুরতিক্রম্য। কারণ, জার-আমলের কোন ধারারই উত্তর-সাধক নয় কম্যুনিষ্ট রাশিয়া। তার নিজস্ব দলীয় দর্শন, তত্ত্বরীতি, কর্মসূচী ও সংগ্রামের ঐতিহ্য একেবারে নতুন। অতীতের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ অতি ক্ষীণ, অথবা ছিল না বল্লেই চলে। কিন্তু ভারতের ব্যাপার একদম আলাদা। তার রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা হালের, একথা সত্য। আরো সত্য, গত দু'শো বছর—যেসময়টা বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের ক্রমোন্নতি ও

বিস্তারের স্বর্ণযুগ—ইংরেজ আমল ও তারো আগের একশো বছর ভারতের পক্ষে ঘোর দুর্দিন। ভারত এসময়টা অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণে ক্ষতবিক্ষত। কাজেই নিজ প্রতিভা ও প্রয়োজনে তা'র না-স্বরাষ্ট্র না-পররাষ্ট্র—কোন নীতিরই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেনি। এ হেন ব্যবস্থায় বিজয়ী দেশের পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গেই ছিল তার গাঁটছড়া বাঁধা। কিন্তু আবার তখন থেকেই ভারতীয় মুক্তি-পথিকগণ বন্ধনহীন ভারতের সোণালী স্বপ্নে বিভোর। আর ভাবী ভারত-রাষ্ট্রের একটা আবছা রূপও হয়েছিল তাঁদের মানসপটে চিত্রিত। এটা অবশ্য খণ্ডিত দৃষ্টি ও প্রয়াস। তবে কংগ্রেসী আন্দোলনের মাধ্যমে, এর প্রতিটি ধারা-পর্যায়ে দেশের মুক্তি-কামনা দানা বাঁধে, একটা বিশেষ রূপ নেয়। পরিণামে সর্বদলীয় মুক্তি আন্দোলনেব পীটভূমিতে পরিণত হয় কংগ্রেস। কাজেই কংগ্রেস হয়ে ওঠে দেশবাসীর আশাআকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও জাতির মুখপাত্র। প্রথমদিকে নরম ভাষায় আবেদন-নিবেদন করা ও দ্বিতীয় স্তরে নরমেগরমে প্রস্তাব গ্রহণ ছিল রীতি। তারপর বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন ও গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের মারফৎ দেশবাসীর তীব্র অসন্তোষ আত্মপ্রকাশ করে। এম্নি করে বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে বিভক্ত আন্দোলনে ইংরেজ শাসনের মূল ভিৎ শিথিল ও সবশেষে একেবাবে ভেঙ্গেচুরে ছত্রখান হয়ে যায়। এরি ভেতর জাতীয় নেতারা, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কর্মীর দল ইংবেজ-পরবর্তী অনাগত যুগের কল্পনা করেন, আর গড়ে তুলতে থাকেন ভাবী ভারত-রাষ্ট্রের বনিয়াদ। এমনকি প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ-দ্বেষী বিদেশী রাষ্ট্র, বিশেষ করে জার্মাণীর সহায়তায় ভারত উদ্ধারের একটা পরিকল্পনা রূপায়নের চেষ্টা করেছিলেন বিপ্লবী নেতারা। ফরাসী ও রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে এ উদ্দেশ্যে যোগাযোগও ঘটিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু নানা কারণে সফল হননি। না হলেও জাতীয় জীবনে একদা এর প্রভাব বেশ অনুভূত হয়।

এটা বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকের কথা। এর পর তৃতীয় দশকে গান্ধী-প্রভাবিত জাতীয় কংগ্রেসের নব কলেবরে আবির্ভাব। তখন মুক্তি আন্দোলনের নতুন পর্যায় শুরু, নতুন জীবনদর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার হয়েছে সবে উদ্ভব। এতে জাতীয় চিত্ত মথিত, উদ্বোধিত। অন্যদিকে সারা পৃথিবীতে আর্থিক অনটন ও মন্দার রাজত্ব। নূতন ভাব-বিপর্যয় ও রাজনৈতিক আলোড়নের ঢেউ ভারতের তটেও পড়ছিল আছড়ে। কাজেই ভেতর ও বাইরের ভাঙাগড়ার এ-খেলায় জাতীয় নেতারা শুধু আত্মশক্তিকেই নয়, বহির্ভারতীয় শক্তিকেও কাজে লাগাতে তৎপর। এদিকে মুখ্যত উদ্যোগী তরুণদল। তখন তাদের নেতৃস্থানীয় শ্রীজওহরলাল নেহরু ও শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।

কিন্তু নেহরু ও সুভাষের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও দৃষ্টি-ভঙ্গির মধ্যে প্রভেদ মৌলিক। নেহরু গান্ধিজীর রাজনৈতিক দর্শনে প্রভাবিত ও তাঁরই নির্দেশে কমবেশি চালিত। পক্ষান্তরে গান্ধী প্রভাবমুক্ত সুভাষ ভিন্ন পথের পথিক; নিজের স্বতন্ত্র পথ-রচনায় ব্যগ্র; রাজনীতিতে শঠে শাঠ্যং নীতিতে বিশ্বাসী। কাজেই নেহরু গান্ধিবাদের ধারক ও বাহক; তারই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। অন্যদিকে সুভাষ হলেন বিপ্লব পথানুসারী। এভাবেই কংগ্রেসে পাশাপাশি বয়ে চলে দুটো স্বতন্ত্র চিন্তা ও কার্যধারা। কিন্তু কিছুটা অবস্থা বৈগুণ্যে ও কিছুটা প্রভাবশালী নেতৃত্বের বিরোধিতায় যে-পরিমাণে সুভাষের প্রভাব হ্রাস পেতে থাকে, সে-পরিমাণে জওহরলালের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। নেহরুই হয়ে উঠেন কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতির রূপকার ও ভাষ্যকার। গান্ধিবাদী দর্শনে এ রীতির মূল প্রোথিত। এর সার: শুধু সিদ্ধিই নয়, উপায়ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। আরম্ভ ও শেষ উভয়কেই বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ হ'তে হবে। তবেই তো সিদ্ধিলাভ কাঙ্ক্ষণীয় ও বরণীয়।

একে ধ্রুবতারা করেই কংগ্রেসের রথ চলেছে—কখনো মন্থর, কখনো দ্রুতগতিতে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারও এসেছে সাময়িক শ্রান্তি, সাময়িক সন্দেহ। তবে তা' স্থায়ী হয়নি। স্থায়ী হয়নি তার ভ্রান্তিবিলাস। একবার ভাঙার ও পরক্ষণেই গড়বার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় মেতে উঠেছে সে। অবশ্য এটাও তার পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাবার সু-পরিকল্পিত প্রয়াস। এরূপ একটা সময় '৩০ হতে '৩৬ সাল। এসময়েই পর পর আইন অমান্য আন্দোলন, শাসন সংস্কারের আলোচনার্থ আহূত লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকেব অনুষ্ঠান ও ভারত শাসন আইন প্রবর্তনে শাসকগণের উদ্যোগ। আবার সমসাময়িক য়ুরোপের ইতিহাসেও সঙ্কট আসন্ন। স্পেনে ফ্রাঙ্কো, ইতালীতে মুসোলিনী ও জার্মাণীতে হিটলারের অভ্যুদয়ে সবাই তটস্থ। তিনজনই একই পথের পথিক। তিনজনই ডিক্টেটর, একনায়কতন্ত্রী। আত্মপ্রসারই তাঁদেব কামনা। গণতন্ত্রের সমাধিভূমিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠা তাদের লক্ষ্য। তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথ দুটো যথা (১) সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও ফ্রান্সের এশিয়া-আফ্রিকার জমিদারীতে ভাগীদার হওয়া ও (২) তাবৎ স্বাধীন অথচ দুর্বল দেশগুলোকে গ্রাস করা। কাজেই সুবিধা অনুযায়ী ব্যবস্থা। একদিকে স্পেনে ঘরোয়া বিবাদ উপলক্ষ করে চলছিলো ফ্যাসিস্ত, গণতন্ত্রী ও কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বেসরকারীভাবে শক্তি পরীক্ষা তথা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মহড়া, অন্যদিকে জার্মানীর মনস্তুষ্টির জন্য বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক জার্মাণীকে মধ্য য়ুরোপের শক্তিহীন দেশগুলোকে ভেটদান। আবার 'দুচে' চাল চালছিলেন আফ্রিকায়। ইথিওপিয়ার ওপর চলছিল তাঁর বর্বর আক্রমণ—বিমানহানা ও বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগে ইথিওপিয়াবাসীরা মুমূর্ষু। তখনো রাষ্ট্রসঙ্ঘ বেঁচে। এ সত্ত্বেও এ ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ যোগসাজসে জগদ্বাসী হতভম্ব।

কিন্তু কংগ্রেস নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্ত বিষয় বিচার করে

আতংকিত হলো। ঘরে শত্রু ইংরেজ, বাইরে স্বাধীন বিশ্বের শত্রু ইংরেজ। এর মূল সাম্রাজ্যবাদে, এর বিষ উপনিবেশবাদে। কাজেই নিজকে ও বিশ্বকে বাঁচতে ও নিরাপদ হতে হলে প্রথম প্রয়োজন দুইয়ের মূলোচ্ছেদ। নইলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। কাজেই নিরুপায় হলেও কংগ্রেস ইথিওপিয়ার বিপদে সমবেদনা জানালো, যুদ্ধায়োজন ও যুদ্ধের বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিলো সবাইকে। শুধু তা-ই নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামীদের দেওয়া হলো সহযোগিতার আশ্বাস। এ ঘটনা ১৯৩৬ সালের। কংগ্রেসের সভাপতি তখন শ্রীজওহরলাল নেহরু।

প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক: কংগ্রেস আগে কেন বিশ্বব্যাপারে নজর দেয়নি। এর সোজা জবাব এই: আগে একাগ্রভাবে দৃষ্টি দেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না। যেহেতু তার সঙ্ঘশক্তি ও দেশবাসীর সচেতনতার ছিল কিছুটা অভাব। আর নিজের ঘরে যার আগুন, বাইরের আগুন নেভাবার সময় ও সামর্থ্য তার কোথায়! কাজেই বিশ্বজগতের দিকে তার গবাক্ষ ছিল রুদ্ধ।

তবে যখনই বুঝা গেলো, ভারতীয় সমস্যা বৃহত্তর বিশ্ব সমস্যারই অঙ্গ, এ-প্রশ্নের মীমাংসার সঙ্গে ভারতের মুক্তি আন্দোলনও অঙ্গাঙ্গী সম্পৃক্ত তখন থেকে কংগ্রেসও বিশ্ব ব্যাপারে সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠে। একদিকে পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ায় ভারতস্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও খোদ ইংরেজ সরকারের কার্যাবলী, আর অন্যদিকে সমগ্র জগতের ওপর প্রভাব বিস্তার হতে পারে এমন সব বিষয়ে স্বভাবতই তার আগ্রহ বাড়তে থাকে। এ পরিবেশেই ১৯৩৭ সালে ফৈজপুর কংগ্রেসের (২৭শে ডিসেম্বর; সভাপতি শ্রীনেহরু) অধিবেশন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে ব্রিটিশ উপনিবেশ সাংহাই-এ 'শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার' অভিযানে ভারতীয় সেনা পাঠানোয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তার বিরোধিতা করা হলো। আবার মূল চীনে জাপ ফ্যাসিস্ত আক্রমণে

উদ্বেগ প্রকাশ করা হলো, প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্যে দু’ দু’বার হলো দিন ধার্য। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়ঃ বিশ্ব-ব্যাপারে ভারতের নতুন পথ-রচনার প্রয়াস। অযথা আক্রান্ত, নির্যাতিত ও দলিতের প্রতি তার সমবেদনা; লোভী, হিংস্র ও শক্তি মাতালদের প্রতি তার সুগভীর ঘৃণা। শুধু কথার কথা নয়। কাজেও এর পরিচয়। আক্রান্ত জাতির সমব্যথীরূপে আক্রমণকারী জাতির প্রস্তুত পণ্য বর্জনের জন্যও ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানানো হয়। কাজেই এ হলো বৈদেশিক ব্যাপারে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সূচনা। কিন্তু এ-নীতি নিষ্ক্রিয় নয়, বরং সক্রিয় ও বেগবান। পরাধীন ভারতের প্রভুশক্তির বিরুদ্ধেই শুধু নয়, পৃথিবীর যেকোন স্থানের সাম্রাজ্যলোভী শক্তির প্রতিও এ এক উদ্ধত চ্যালেঞ্জ।

১৯৩৮ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারী কংগ্রেসের হরিপুরী অধিবেশন নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এ বছর আসন্ন ঝড়ের সঙ্কেতে বিশ্বাকাশ থমথমে; বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় সকলে ভীত ত্রস্ত। কিন্তু চারদিকে দুর্লক্ষণ দেখেও কংগ্রেস অটল; নিজস্ব ভিত্তিভূমিতে তার অবিচল প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীব্যাপী রণদামামার তালেও নিজ কর্তব্যচ্যুত হলো না। বহির্ভারতে ভারতীয়দের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ হতে বিরত হলো না সে; করলো চীনে জাপানী আক্রমণের নিন্দা ও সংগে সংগে ভারতে জাপানী পণ্য বর্জনের আহ্বান, আর আক্রান্ত ও হতমান চীনাদের প্রতি সমব্যথা প্রকাশ। এতো বাইরের ব্যাপার,—যার সংগে ভারতবাসীর প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই। কিন্তু ভারতের প্রভুশক্তি ইংরেজেরও নিস্তার নেই। যেহেতু রাষ্ট্রসংঘের প্রতিভূরূপে সে প্যালেষ্টাইন শাসনের ভারপ্রাপ্ত এবং এ ক্ষমতাবলে প্যালেষ্টাইনকে ভাগবাঁটোয়ারার সিদ্ধান্ত করে, সেহেতু সে-ও অনুরূপ নিন্দার্হ। আবার প্যালেষ্টাইনে তথাকথিত ‘শান্তি ও শৃঙ্খলা’ রক্ষার অজুহাতে সে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলো,

তার বিরুদ্ধেও জানানো হলো ঘোর প্রতিবাদ। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে ভেদনীতি প্রয়োগের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে কংগ্রেসের দেরি হয়নি। দেরি হয়নি বুঝতে এ কূট-কৌশলের সম্ভাব্য পরিণতি। তাই আরবদের জাতীয় সংগ্রামের প্রতি সে গভীর সহানুভূতি দেখালো। আবার সর্বব্যাপী এক পটভূমিকায় আসন্ন যুদ্ধের ঘটঘটায় করা হলো গভীর উদ্বেগ প্রকাশ, করা হলো ভারত কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী যুদ্ধের আয়োজন ও যোগদানের তীব্র বিরোধিতা। শুধু নির্জলা ও ভালোমানুষী কতকগুলো হৃদয়াবেগের অভিব্যক্তিই নয়, দৃপ্ত ভঙ্গিতে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে যুদ্ধে জড়ানো হলে সর্বোপায়ে ও সর্বশক্তি দিয়ে তার প্রতিরোধ করা হবে।

'Foreign Policy and war danger' শীর্ষক প্রস্তাবের মুখবন্ধে যা বলা হয়, তা একাধিক কারণে উল্লেখযোগ্য যথা :—The people of India desire to live in peace & friendship with their neighbours and with all other countries and for this purpose wish to remove all causes of conflict between them. Striving for their own freedom and independence as a nation, they desire to respect the freedom of others, and to build up their strength on the basis of international cooperation and goodwill. Such cooperation must be founded on a world order and a Free India will gladly associate itself with such order, and stand for disarmament and collective security. But world cooperation is impossible of achievement so long as the roots of internal conflict remained and one nation dominates over another and imperialism holds sway. In order

therefore to establish world peace on an enduring basis, imperialism & exploitation of one people by another must end.

During the past few years there has been a rapid and deplorable deterioration in international relations. Fascist aggression has increased and unabashed defiance of international obligation has become the avowed policy of Fascist powers. British policy inspite of its evasions & indecision, has consistently, supported the Fascist powers in Germany, Spain & the Far East and must therefore largely shoulder the responsibility for the progressive deterioration of world situation. That policy still seeks an arrangement with Nazi Germany & has developed closer relations with Spain. It is helping in the draft to imperialist world war.

India can be no party to such an imperialist war and will not permit her manpower and resources to be exploited in the interests of British Imperialism. Nor can India join any war without the express consent of her people. Congress, therefore, entirely disapproves of war preparations being made in India and largescale manouevres and air-raid precautions by which it has been sought to spread an atmosphere of approaching war in India. In the event of an attempt being made to involve India in a war, this will be resisted.

অর্থাৎ 'ভারতবাসী তাদের প্রতিবেশী ও সকল দেশের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতে ইচ্ছুক। এই উদ্দেশ্যে তাদের ভেতর যেসব বিরোধের হেতু আছে, তা' দূর করার অভিলাষী। জাতি হিসাবে নিজেদের স্বাধীনতালাভে ভারতবর্ষ সচেষ্ট ; এহেতু অন্যের স্বাধীনতার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার ভিত্তিতে নিজেদের শক্তি সংহত করতে সে চায়। তবে এজাতীয় সহযোগিতা অবশ্যই বিশ্বভিত্তিক হতে হবে। স্বাধীন ভারত সানন্দে এরূপ ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করবে আর নিরস্ত্রীকরণ ও সমষ্টিগত নিরাপত্তার পোষকতা করবে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিরোধের মূল যতদিন থাকবে, যতদিন একজাতি অন্যের ওপর আধিপত্য করবে ও সাম্রাজ্যবাদ অক্ষুন্ন থাকবে ততদিন বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার আদর্শ রূপায়িত করা অসম্ভব। কাজেই স্থায়ী ভিত্তিতে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সাম্রাজ্যবাদ ও একজাতি কর্তৃক অন্য জাতির শোষণের অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে।

গত কয়েক বছর যাবৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দ্রুত ও শোচনীয় অবনতি ঘটছে। ফ্যাসিস্ত শক্তি কর্তৃক পররাজ্য আক্রমণের গতিবেগ বাড়ছে, আর আন্তর্জাতিক দায় নির্লজ্জভাবে উপেক্ষা করা ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গের ঘোষিত নীতিতে পরিণত হয়েছে। ‍‍‍ টেনের নীতি লক্ষ্যহীন : এড়িয়ে যাবার কৌশলও ওতে রয়েছে। এসত্ত্বেও সে জার্মানী, স্পেন ও দূর প্রাচ্যের ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গকে বরাবর সমর্থন করেছে। কাজেই বিশ্ব পরিস্থিতির ক্রমাবনতির জন্য বহু পরিমাণে সে দায়ী। এখনো সে নাৎসী জার্মানীর সংগে একটা বুঝাপড়ায় তৎপর, আর স্পেনের সঙ্গে গূঢ় সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এ ব্যবস্থা সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বসমরে সেনা সংগ্রহের সহায়ক।

ভারত কিন্তু এজাতের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অংশীদার হতে পারে না ; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থোদ্ধারে তার নিজস্ব সম্পদ ও জনবল কাজে লাগাতেও সে অনুমতি দিতে পারে না। ভারতীয় জনগণের

সুস্পষ্ট ইচ্ছা ছাড়া ভারত কোনো যুদ্ধে যোগ দিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় ভারতে যে যুদ্ধায়োজন, সামরিক ও বিমান আক্রমণের সতর্কতাসূচক মহড়া চলছে, ভারতবাসী তার ঘোর বিরোধী। ভারতের দিকে ক্রমসম্প্রসারণশীল যুদ্ধের আবহাওয়া বিস্তার করাই এর উদ্দেশ্য। কোনো যুদ্ধে ভারতকে জড়িয়ে ফেলার কোন চেষ্টা করা হলে ভারত প্রাণপণে তার প্রতিরোধ করবে।'

এরপর কংগ্রেসের ৫২তম অধিবেশন হলো ত্রিপুরীতে। কালটা হলো ১৯৩৯ সালের ১০ই থেকে ১২ই মার্চ। সভাপতি শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। কংগ্রেসের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করলেন শ্রীনেহরু। চীন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করলেন; বৃটেন ও ফ্রান্স চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করায় করলেন রোষমিশ্রিত ঘৃণা প্রকাশ। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন তিনি, ব্রিটিশ নীতি থেকে ভারতকে অবশ্যই বিযুক্ত করতে হবে, আর বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধাদের সাথে করতে হবে নিজেদের যোগ সাধন। এভাবেই বিশ্ব-নাট্যে ভারত করবে বিশিষ্ট ভূমিকার অভিনয়। আবার চীনে পাশ্চাত্য ফ্যাসিস্ত শক্তির পূর্বদেশীয় দোসর জাপানের গর্হিত কার্যকলাপও সমভাবে নিন্দার্হ। কাজেই চীনের প্রতি মৌখিক সমবেদনা প্রকাশই যথেষ্ট নয়। পরাধীন ভারতের সমব্যথার নিদর্শন হিসাবে চীনে বিপন্নদের জন্য মেডিক্যাল মিশন পাঠাবার প্রস্তাব করলেন তিনি। তারপর বৈদেশিক নীতি প্রস্তাবটি যথারীতি পেশ করা হলো। ওতে বলা হয়েছে: The Congress records its entire disapproval of British foreign policy culminating in the Munich pact, the Anglo-Italian Agreement and the recognition of Rebel Spain. This policy has been one of deliberate betrayal of Democracy, repeated breach of pledges, the ending of the system of collective security and cooperation with

Govts, which are avowed enemies of Democracy and Freedom. As a result of this policy, the world is being reduced to a state of international anarchy where brutal violence triumphs and flourishes unchecked and in the name of peace stupendous preparations are being made for the most terrible of wars. International morality has sunk so low in Central and South-west Europe that the world has witnessed with horror the organised terrorism of the Nazi Govt. against people of Jewish race and the continuous bombing from the air by rebel forces of cities and civilian inhabitants and helpless refugees.

The Congress dissociates entirely from the British foreign policy which has consistently aided the Fascist powers and helped in the destruction of democratic countries. The congress is opposed to Imperialism and Fascism alike and is convinced that world people and progress required the ending of both of these. In the opinion of the Congress, it is urgently necessary for India to direct her own foreign policy as an independent nation, thereby keeping aloof from both Imperialism and Fascism and pursuing her path of peace & freedom.

অর্থাৎ, 'কংগ্রেস বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতি একদম সমর্থন করে না। ম্যুনিক চুক্তি, ইঙ্গ-ইতালীয় চুক্তি ও বিদ্রোহী স্পেনের স্বীকৃতিতে এর চূড়ান্ত পরিণতি ঘটেছে। বৃটিশ নীতি স্বেচ্ছায় গণতন্ত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, সমষ্টি

নিরাপত্তার অবসান ঘটিয়েছে এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার ঘোর শত্রুদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে। এ-নীতির ফলে সমগ্র পৃথিবী আন্তর্জাতিক অরাজকতা ক্ষেত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। এহেন অবস্থায় নির্মম পাশবিকতাই জয়ী হচ্ছে, আর অবাধে তার বিস্তার ঘটছে। বিভিন্ন জাতির ভাগ্যও নির্ধারিত হচ্ছে এভাবে। শান্তির নামে ভয়ঙ্করতম যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বিপুল আয়োজন চলেছে। মধ্য ও দক্ষিণ-পশ্চিম য়ুরোপে আন্তর্জাতিক নীতি এতটা নিম্নগামী হয়েছে যে নাৎসী গবর্ণমেণ্টের সংঘবদ্ধ সন্ত্রাসবাদ ইহুদি জাতির বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়েছে এবং বিদ্রোহী বাহিনী বিমান হতে বিভিন্ন নগর, অসামরিক অধিবাসী ও অসহায় উদ্বাস্তুদের ওপর বিরামহীন বোমা ফেলেছে। বিশ্ববাসী তাই সভয়ে প্রত্যক্ষ করেছে।

যে-বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতি সুসম্বদ্ধরূপে ফ্যাসিস্ত শক্তিবর্গকে সমর্থন করে বিভিন্ন গণতন্ত্রী দেশকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে সহায়তা করেছে, কংগ্রেস তা' থেকে নিজকে সম্পূর্ণ বি-যুক্ত করছে। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের সমভাবে বিরোধী। তা'র স্থির বিশ্বাস, বিশ্ববাসীর কল্যাণ ও প্রগতির জন্য এ উভয় বাদেরই অবসান ঘটানো দরকার।

কংগ্রেসের মতে স্বাধীন জাতিরূপে নিজস্ব পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করাই ভারতের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এভাবেই সে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদ হতে দূরে থেকে শান্তি ও স্বাধীনতার পথ অনুসরণ করতে পারবে।'

এর পরে বিহারের রামগড়ে কংগ্রেসের ৫৩তম অধিবেশন। সময় ১৯৪০ সালের ১৯শে হতে ২০শে মার্চ; সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।

স্বাম্বুবিক স্তর ছাড়িয়ে যুদ্ধ তখন স্বীয় রুদ্রমূর্তিতে প্রকট। সংকট ঘনীভূত। কর্তব্য স্থির করা একান্ত প্রয়োজন। যে-সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরোধিতা কংগ্রেসের মূল নীতির অঙ্গ,

ঘরেবাইরে তাদের সংঘবদ্ধ ও ফলপ্রসূ প্রতিরোধ না করলেই নয়। এতদিন দেশবাসীকে যে বিপদের সংকেত দেওয়া হচ্ছিল, সেই সংকট যখন দুয়ারে তখন তাকে কীভাবে রুখতে হবে ও দেশবাসীকে কীরূপ পথনির্দেশ দিতে হবে, তা-ই নিয়ে কংগ্রেস রচনা করলো 'ভারত ও যুদ্ধ সংকট' সম্পর্কিত মূল প্রস্তাব। এর উত্থাপক বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সমর্থক পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। প্রস্তাবে ভারতকে যুদ্ধে জড়াবার নিন্দা করে বিদেশে ভারতীয় সেনা পাঠানো ও ভারতীয় সম্পদ শোষণের তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। তা' ছাড়া, ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের আকাংখা প্রকাশ করে নিজ সংবিধান রচনার অধিকারও কংগ্রেস ঘোষণা করে।

এ কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ব্যাপার: কংগ্রেস সভাপতির অনুরোধে প্রতিনিধিদের উদ্দেশে গান্ধিজীর ভাষণ। 'উল্লেখযোগ্য' এ কারণে বলা হলো যে, এর বছর ছয়েক আগে থেকে নেতৃবৃন্দের সংগে কংগ্রেসের পরিচালনা ও সংগঠনগত বিষয়ে মতভেদের দরুণ গান্ধিজী এর বার্ষিক অধিবেশনে যথাযোগ্য অংশ গ্রহণ দূরের কথা, চার আনার সদস্যও ছিলেন না। অবশ্য প্রয়োজনমত নেতারা তাঁর সদুপদেশ লাভে বঞ্চিত হতেন না। তাই যখন নেতারা বুঝলেন,—সময় আগত, চূড়ান্ত আঘাত হানার সুযোগ উপস্থিত তখন তাঁর উপদেশ কামনা করলেন তাঁরা; যেহেতু ক্রান্তিকালে দ্বেষ ও কলুষহীন অন্তরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে যুঝবার মতো অমিত তেজের ধারক ও অহিংস সংগ্রামের নব নব কৌশল উদ্ভাবনায় সুদক্ষ তিনি। কাজেই সবচেয়ে ভয়াবহ যুদ্ধের বিরুদ্ধে যার একমাত্র হাতিয়ার অহিংসা, মৈত্রী ও প্রেম, সেই প্রেমাবতারের বাণীই পৃথিবীর সেই প্রদোষ আঁধারে প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। এ হেন অবস্থায় তাঁর কাছে মন্ত্রণা চাওয়া, উপদেশ যাচ্ঞা করা। হৃদয়ের অর্গল খুলে দিলেন তিনি; বক্তৃতার শেষে দিকে এক জায়গায় বললেন:

Anger is opposed to Satyagraha. We have no quarrel with the British people. We want to be their friends and retain their goodwill not on their domination, but on the basis of a free & equal India. As a free country India will bear no malice to anyone, nor attempt to enslave any people. We shall march with the rest of the world, just as we shall desire the rest of the would to march with us.

অর্থাৎ 'ক্রোধ সত্যাগ্রহের বিরোধী ধর্ম। ইংরেজের সংগে আমাদের কোন বিবাদ নেই। আমরা তাদের মিত্রতাকামী। তাদেব শুভেচ্ছা আমবা বজায় বাখতে চাই। তবে তাদের প্রভুত্ব নয়, স্বাধীন ও সমমর্যাদাশীল ভারত হবে এর মিলনভূমি। স্বাধীন দেশরূপে কারো প্রতি ভারতের দ্বেষ থাকবে না, কোনো জাতিকে বশ করার চেষ্টাও করবে না সে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংগে সমতালে চলবো আমরা। তেমনি অন্যান্য দেশ আমাদের সাথে সমানে এগিয়ে চলুক, এও আমরা কামনা করবো।'

মাত্র এ ক'টি কথার ভেতরই ভাবী ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় সূত্রাকারে নিহিত। এর পরবর্তী ৬।৭ বছর মাত্র ভারতের পরবশ্যতার মেয়াদ। তার ভেতর অবস্থাবিপাকে কংগ্রেসের কোন বার্ষিক অধিবেশন হয়নি। তবে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব গৃহীত হয় '৪২ সালের আগস্ট মাসে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির বিশেষ অধিবেশনে।

আশ্চর্য ব্যাপার, যে-প্রস্তাবে ভাগ্যবিধাতার হাতে ভারতবাসীকে সঁপে দিয়ে ইংরেজকে বিদায় নিতে বলা হয়েছিল, তার ভাষাবিন্যাস অতি সংযত ; ক্রোধ, দ্বেষ ও ঘৃণাবর্জিত। অথচ তখনকার পরিস্থিতি যেমনি জটিল, তেমনি ঘোরালো। যুদ্ধের দীর্ঘায়ত ছায়া ভারত-মুখী। জাপানী লোলুপতার নখদন্ত এদেশকে লক্ষ্য করে উদ্যত। সাজ সাজ

রব চারদিকে। দেশবাসী শংকিত ভয়ার্ত। অনাগত প্রতিপক্ষকে বঞ্চনার জন্যে তখন চালু 'পোড়া মাটি'র নীতি। সমুদ্রের উপকূল ভাগ জনশূন্য; অগ্রবর্তী সম্ভাব্য যুদ্ধের এলাকা হতে লোকজন অপসৃত। পশ্চাদ্বর্তী সহর ও বন্দরে গড়খাই ও 'বিফল প্রাচীরের' (Baffle wall) ছড়াছড়ি। বিমান আক্রমণের মহড়া ও সংকেত প্রতি রাতে। এ-বিপদেও বেহুঁস সাম্রাজ্যবাদী শাসক। তার ঔপনিবেশিক স্বার্থের 'বুলডজারে' দেশবাসীর পাঁজর ভেঙ্গেচুরে গুড়িয়ে যাচ্ছে। যাক্,—তবু দেশশাসনে ভারতবাসীকে দোসর করা চলে না। তা-ই চাল নেই, কাপড় নেই; বাজার থেকে সব উধাও। প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুর অভাব। ফাটকা ও মুনাফাবাজদের রাজত্ব। জিনিসপত্রের দর চড়তির দিকে। ভাত কাপড়ের কৃত্রিম অভাবে দেশবাসী পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে। বাড়ন্ত দরের সঙ্গে তাল রেখে আয় নেই সাধারণের। কিন্তু যুদ্ধের দৌলতে বাজারে বাড়তি টাকা অঢেল; দেশে ফাঁপাই মুদ্রার জোয়ার। কাজেই জনতার হাহাকার, অনশন ও অর্ধাশন। মন্বন্তরের পায়ের শব্দ ক্রমশ অস্পষ্ট হতে স্পষ্টতর। তারই বিভীষিকায় সারাদেশ থরহরি কম্পমান।

এহেন পটভূমিকায় '৪২ সালের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এলাহাবাদ বৈঠক। এতে গান্ধিজী অনুপস্থিত; কংগ্রেসের চার আনার সদস্যও নন তিনি। কিন্তু জাতি, কংগ্রেস ও ইংরেজের বিপদে আবার তিনিই আগুয়ান। তাঁরই রচিত 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের খসড়া এতে আলোচিত হলো। তাঁর মূল বক্তব্য নিম্নরূপ যথা (ক) বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কাছে ভারত-ত্যাগের দাবী; (খ) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের দরুণ ভারত যুদ্ধ এলাকায় পারণত; (গ) ভারতের স্বাধীনতার জন্য কোন দেশের সাহায্যের প্রয়োজন নেই; (ঘ) ভারতের সঙ্গে কোন দেশের বৈরিতা নেই; (ঙ) জাপান ভারত আক্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিরোধ নীতি

অবলম্বন করা হবে; (চ) অসহযোগিতার ধারা-পর্যায় নির্ণয় ও (ছ) বিদেশী সেনা ভারতের স্বাধীনতার বৃহত্তম অন্তরায়।

এর পর ৭ই আগষ্ট রাষ্ট্রীয় সমিতির বোম্বাই অধিবেশনে গান্ধিজী আসন্ন সংগ্রামের গুরুত্ব ও কংগ্রেসসেবীদের দায়িত্ব সম্পর্কে বল্লেন, "ইংরেজের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষভাব নিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করা হচ্ছে না, বন্ধুভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে তাদের কল্যাণের জন্য একাজ করা হচ্ছে। আমার জীবনে যখন বৃহত্তম সংগ্রাম আরম্ভে উদ্যত হয়েছি, তখনও আমার অন্তরে ইংরেজের প্রতি কোনরূপে দ্বেষ থাকতে পারে না। তারা বিপাকে পড়েছে। কাজেই তাদের ধাক্কা দোব, এ ধারণা কখনও আমার মনে উদয় হয়নি। ক্রোধের বশে তারা এমন সব কাজ করতে পারে যার ফলে আপনাদের মনে উত্তেজনা সঞ্চার হতে পারে। যা-ই হোক, হিংসাবৃত্তির প্রশ্রয় দেওয়া আর অহিংসাকে কলংকিত করা আপনাদের উচিত নয়। আপনারা জেনে রাখুন, এরূপ কিছু ঘটলে আমি যেখানেই থাকি না কেন, আপনারা আমাকে জীবিত দেখতে পাবেন না।"

মূল প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জওহরলাল। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, "এ-দেশের দুর্গতির জন্যে ইংরেজই দায়ী। বৃটিশ শাসনের অবসান না হলে এর শেষ হবে না। * * এশিয়া খণ্ডেই যুদ্ধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। শুধু ভারতের নয়, সমগ্র জগতের স্বাধীনতাই আমাদের আন্দোলনের লক্ষ্য।" যেমনি তাঁর, তেমনি প্রস্তাবের ভাষা যুক্তি ও তথ্যবহুল, ক্রোধ, হিংসা ও ঘৃণামুক্ত। অথচ তখনকার পরিবেশ ও সাধারণ রীতি অনুযায়ী ওসবে জাতি-বৈরিতা, ঘৃণা ও হিংসার ছড়াছড়ি থাকা বিচিত্র ছিল না। কিন্তু বদলে গান্ধি-নেতৃত্ব ও প্রভাবের নামাবলি ওর সর্বাঙ্গে। আবার প্রস্তাবটিতে একাধারে স্বদেশ ও বিদেশ—উভয়ের বিবেচ্য বিষয়বস্তু একসূত্রে গ্রথিত। যেহেতু বিশ্ব-পরিস্থিতির পটভূমিকায় এর যত কিছু গুরুত্ব ও মহিমা। এখানে বিশ্ব সংকটের সঙ্গে ভারতীয় সংকট

একাকার ও অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কিত। তা-ই প্রস্তাবের একস্থানে বলা হয়েছে, "বর্তমান ক্রান্তিকালে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি মুখ্যত ভারতের স্বাধীনতা ও ভারত-রক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু সমিতির অভিমত এই যে, জগতের ভবিষ্যৎ শান্তি, নিরাপত্তা ও সুবিন্যস্ত উন্নতির জন্য বিশ্বের স্বাধীন জাতিগুলোর মৈত্রীবন্ধন একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া অন্য কোন ভিত্তিতে আধুনিক জগতের নানা সমস্যার নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এহেন বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠিত হলে —যাদের নিয়ে সঙ্ঘ গঠন করা হবে—সেসব জাতির স্বাধীনতা নিরাপদ হবে। আক্রমণ প্রতিরোধ, এক জাতি কর্তৃক অন্যের শোষণ, সংখ্যালঘু সংরক্ষণ, অনগ্রসর এলাকা ও অনুন্নত অধিবাসীদের উন্নতি-বিধান, আর সর্বসাধারণের কল্যাণে জগতের যাবতীয় সম্পদ বিনিয়োগকল্পে সঙ্ঘগঠন ইত্যাদি এজাতীয় বিশ্বরাষ্ট্র গঠন দ্বারা সুনিশ্চিত হবে। এরূপ সঙ্ঘ গঠনের ফলে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রে নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব হবে। তখন আর জলস্থল ও নৌবাহিনীর দরকার হবে না। তখন বিশ্বরাষ্ট্র রক্ষি-বাহিনী জগতের শান্তিরক্ষা ও প্রতিরক্ষায় সক্ষম হবে। ওরূপ সঙ্ঘে স্বাধীন ভারত সানন্দে যোগ দেবে এবং আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে সমমর্যাদার ভিত্তিতে অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।"

আগস্ট আন্দোলন ও তার পরের অধ্যায় এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। কোন্ পরিবেশে ইংরেজ ভারত ছেড়ে চলে গিয়েছে, তা'র আলোচনাও এখানে নিষ্প্রয়োজন। আসল কথা, ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির মূল বনিয়াদ গড়ার পশ্চাদ্বর্তী ইতিহাস ও ঐতিহ্য শুধু সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

বলা বাহুল্য, দেশ স্বাধীন হবার পর মাত্র ৯।১০ বছরে ভারত যে-বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলেছে, তা'র বিবর্তনকাল মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত যথা (১) '৪৬ সালে ভারত বিভাগ হতে '৫০ সালের কোরিয়া যুদ্ধ; (২) '৫০ সাল হতে '৫৪ সালের

প্রথম ভাগে ইন্দো-চীনের সঙ্কট কাল ও (৩) '৫৫ সালের এপ্রিলের বান্দুং মহাসম্মেলন হতে পরবর্তী অধ্যায়। প্রথম পর্যায়টি ভারতের ঘর গুছাবার, শক্তি সংহত করার ও বৈষয়িক বনিয়াদ দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যয়িত হয়। এসময় ঘরোয়া সমস্যায় ভারত বিব্রত। বিভাগজাত উদ্বাস্তু সমাগম ও প্রায় ৫০ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্বাসনকল্পে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়, অনাবৃষ্টি, বন্যা, শস্যহানি, দুর্ভিক্ষ, হায়দরাবাদ সমস্যা ও তেলেঙ্গানায় কৃষক বিদ্রোহ, সৈন্যবাহিনী ও শাসন পরিচালনার পুনর্বিন্যাস, ভারতের সামন্ত-রাজাদের গোপন চক্রান্ত ও ছ'শতাধিক দেশীয় রাজ্যের ভারতভুক্তি এবং সর্বোপরি পাকিস্থান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ ও তজ্জাত নানা আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টির ফলে নতুন কংগ্রেসী সরকার বিশেষ বিপন্ন বোধ করেন। এমনকি সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীলতা ও বর্ণগত গোড়ামির তাণ্ডবও প্রথমদিকে মাথা চাড়া দেয়। তারই বলি গান্ধিজী। কিন্তু একদিকে স্বর্গত বল্লভভাই পটেলের দৃঢ়তা, বিচক্ষণতা, শাসন পরিচালনায় কুশলতা, অন্যদিকে পণ্ডিত নেহরুর আদর্শনিষ্ঠা, সময়োপযোগী বাস্তববোধ ও কূটকৌশল প্রয়োগে দক্ষতা হেতু অগ্নিপরীক্ষায় উৎরে গিয়েছিল ভারত। শুধু প্রথম বড় বাধা ডিঙানোই নয়। ভারতের বৈষয়িক নীতিরও গোড়া পত্তন এ-সময়। মিশ্র অর্থনীতি বা mixed economy নামে তখন এর পরিচয়। দক্ষিণ বা বাম—কোনদিকেই নয়; জাতীয়তাবাদ ও সমাজবাদের একটি তাত্ত্বিক মিশ্রণ। অর্থাৎ নিজ প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা একদিকে, আর বৈষয়িক প্রগতিশীলতা অন্যদিকে—এদুয়ের জন্যে দেশী শিল্পপতি, আর বিদেশী অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করতে হয় তাকে। বিপর্যয়ের টাল সামলে যায় এভাবেই। আবার ভারতীয় জনসাধারণ ও নেতাদের নতুন পথের সন্ধান করতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে এর ফল শুভ হয়নি। কারণ রাষ্ট্রনীতি বা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শুভাশুভ ও সদসদের

স্থান কম। এখানে আশু চাহিদা মেটাবার প্রয়োজন যাকে দিয়ে যত বেশি, তার আদর ততো। সুবিধাবাদ ও লাভ লোকসানের খতিয়ান এর মূল কথা। কিন্তু ভারতীয় নেতারা যে উচ্চাদর্শ হতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিচার করতে উদ্যত, তা'র কার্যকারিতা অল্প ও ক্ষেত্র সীমিত। কাজেই প্রথমদিকে—না সদলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, না সোবিয়েৎ জোট—কারো মন পায়নি সে। '৪৭ সালের প্রারম্ভে দিল্লীতে এশিয়া সম্মেলনের অনুষ্ঠান এদের বিরূপতার আশু কারণ। যদিও দৃশ্যত বেসরকারী, তবু উভয় জোটের সংশয় জাগল, ভারতের নেতৃত্বে তৃতীয় একটি শক্তিগোষ্ঠি গঠনের সূচনা হয়ত হলো। তাই রাষ্ট্রপুঞ্জের দরবারে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ভারতের নালিশে কান দেয় না ইঙ্গ-মার্কিণ জোট; বরং উল্টে ভারতের মূল উদ্দেশ্য বানচাল করে দেয় তারা। নানা কারসাজি ও ছলছুতায় এর নিষ্পত্তিতে বিলম্ব ঘটায়; এমনকি হানাদার পাকিস্থানকে পর্যন্ত ভারতের সমমর্যাদা দেয়। ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রান্তকারীরা কার্যত কাশ্মীর সমস্যাকে ভারতের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করে। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত-বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। এ নিয়ে দেশেও একদল সরকার-বিরোধী নেহরু-নীতির সমালোচনায় হন পঞ্চমুখ। কিন্তু ঘাবড়াননি ভারত সরকার। '৪৮ সালের ৮ই মার্চ পণ্ডিত নেহরু সংসদে ঘোষণ করেন—"A straight-forward, an independent policy is the best. * * * It may be that we have to choose what might be a lesser evil in a certain set of circumstances."

অর্থাৎ সুনীতিসম্পন্ন ও অন্যনিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিই সর্বোত্তম। * * * হয়ত একটি বিশেষ অবস্থাধীনে অপেক্ষাকৃত কম মন্দকেই বেছে নিতে হবে।" কাজেই ভারতের লক্ষ্য না হলেও উদ্দেশ্য স্থির হয়ে গিয়েছিল। সুনীতি ও সুবিধাবাদ—এ'দুয়ের মধ্যে সুনীতিকেই সে বেছে নেয়।

কিন্তু আদর্শবাদই শুধু নয়, ভারতীয় নেতাগণ বাস্তবনিষ্ঠও বটেন। আমেরিকা বিরূপ; কিন্তু যুদ্ধোত্তর জগতে সে-ছোট বড় উন্নতঅনুন্নত সকল দেশের পাওনাদার ও জোগানদার। কাজেই ভারতের অনটনে সাহায্য যদি কাউকে দিয়ে হয়, সে আমেরিকা। যদি তার উন্নয়ন পরিকল্পনার সহায়ক কেউ হয়, সে মার্কিণ জাতি। কিন্তু কোন কিছু পাবার আগে তাদের অজ্ঞতা-প্রসূত ভ্রান্তি দূর করা প্রয়োজন। কাজেই মার্কিণ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৪৯ সালে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আমেরিকার আইন সভা, নানা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা দেন। তা'তে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির আদর্শ ও লক্ষ্য স্পষ্টতর হয়; ভারতের অনুসৃত নীতি সম্পর্কে যেসব ভুল বুঝাবুঝি ছিল, তা'ও অনেকটা দূর হয়। ১৭ই অক্টোবর ('৪৯) কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন উৎসবে তিনি বলেন—"বিশ্বে আমরা শান্তি চাই, শান্তিরক্ষা করতে চাই। কিন্তু এজন্যে আমরা কোন বৃহৎ শক্তি বা শক্তিগোষ্ঠির সঙ্গে হাত মিলাবো না। প্রত্যেকটি বিতর্কমূলক সমস্যা আমরা নিরপেক্ষভাবে বিচার ও স্বাধীনভাবে কাজ করবো। তবে ভারতীয় নীতি নিষ্ক্রিয় বা নিরপেক্ষ নয়। এ এক বলিষ্ঠ নীতি—প্রাণ-প্রাচুর্যে বেগবান। আমাদের মুক্তি সংগ্রাম ও মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা হতে এর উদ্ভব।" অন্যত্র তিনি বলেন—"অন্যের প্রতি প্রেম, আর অন্যের ভালবাসা লাভের আগ্রহ নিয়ে ভারত বিশ্ব-সভায় অবতীর্ণ। তবে একথা সত্য, বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী নিজ স্বার্থের দিক থেকে ভারতবর্ষকে নিজ পররাষ্ট্র নীতি স্থির করতে হয়েছে। কিন্তু নিজ আদর্শও ভোলে নাই সে। এক কথায়, জাতীয় আদর্শবাদ ও স্বার্থ—এ দুয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষার চেষ্টা করেছে ভারত। আমাদের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য নিম্নরূপ:—(ক) বিশ্বশান্তি রক্ষায় আমরা উন্মুখ; কিন্তু এজন্যে কোন বৃহৎ শক্তি বা শক্তি-গোষ্ঠির সঙ্গে আঁতাত নয়; (খ) পরাধীন জাতি ও জনসঙ্ঘের

মুক্তি-সাধনে সহায়তা করা হবে; (গ) জাতীয় ও ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে; (ঘ) জাতি ও বর্ণ বৈষম্যের লোপ করা হবে; (ঙ) বিশ্বের দুর্ভোগ-পীড়িত নরগোষ্ঠির অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, আধিব্যাধি ও অনটন দূর করার প্রয়াস করা হবে।" আবার ২৪শে অক্টোবর কানাডার রাজধানী অটোয়ায় সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীনেহরু যে বিবৃতি দেন, তা'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা'তে তিনি বলেন, "কোন পক্ষভুক্তি ভারতের নীতি নয়। বরং প্রত্যেক রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপন করা ও মৈত্রী বজায় রাখা আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তবে কোন কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ঘনিষ্টতর সম্পর্ক স্থাপন খুবই স্বাভাবিক। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নানা বিষয়ে আমরা পবামর্শ করে থাকি। কিন্তু আমাদের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে পরিচালিত হয়ে থাকে।" এ বক্তৃতা মুখ্যত রুশ সংবাদপত্রের সমালোচনার জবাব। ওতে অভিযোগ করা হয় যে শ্রীনেহরু ভারতকে নিশ্চিতরূপে মার্কিণ গোষ্ঠিভুক্ত করেছেন। এরো আগে ১৩ই অক্টোবর মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেটের যুক্ত অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতায় তিনি বলেন,—"যেখানে স্বাধীনতা বিপন্ন হবে, ন্যায়বিচার ক্ষুন্ন হবে, বা পররাজ্য আক্রমণ করা হবে, সেখানে আমরা নিশ্চয়ই নিরপেক্ষ থাকবো না,—থাকা সম্ভবও নয়। ফলত বিশ্বেব শান্তিরক্ষা ও মানব স্বাধীনতার সম্প্রসারণই আমাদের পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে শ্রীনেহরু আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারতের ভূমিকা সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা করেন, কার্যত তার বয়ান ১৯৪৬ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেছিলেন। তখন তিনি ভারতের অন্তবর্তী সরকারের মুখপাত্র। তাঁর তখনকার বক্তৃতায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় যথা (ক) গোষ্ঠি-নিরপেক্ষতা; (খ) দাস জাতিদের স্বাধীনতা সমর্থন

(গ) সমস্ত রাষ্ট্র, বিশেষ করে এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে মৈত্রী স্থাপন ও (ঘ) রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে সহযোগিতা। ১৯৪৯ সালের ১৫ই মে লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী যে-ঘোষণা করেছিলেন, তার সুরও মোটামুটি একই ধরণের। তিনি বলেছিলেন,—"শান্তি প্রতিষ্ঠাই ভারতের লক্ষ্য। বস্তুত সামগ্রিক শান্তি প্রতিষ্ঠাই সমষ্টিগত নিরাপত্তা বিধানের একমাত্র উপায়। * * আমরা চাই, এশিয়ায় যুদ্ধ বন্ধ হোক। বিশেষ করে বাইরের যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে যুদ্ধ চালাছে, তাদের কার্যকলাপ বন্ধ হওয়া দরকার।" বস্তুত তখনকার পরিবেশে ভারতের পক্ষে ভেতর ও বাইরে শান্তি বজায় থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় ছিল। একদিকে ইন্দোনেশীয়ায় ওলন্দাজ আধিপত্য স্থাপনের নতুন প্রয়াস, আর তাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির সমর্থন, সিঙ্গাপুর ও মালয়ে বৃটেনের অনাচার আর ইন্দোচীনে ফরাসীদের দাপাদাপি, অন্যদিকে কাশ্মীরের সুরঙ্গ পথে রাষ্ট্রপুঞ্জে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিনিধিদের নির্লজ্জ বেহায়াপনা ও ভারত-বিরোধী চক্রান্ত চলছিলো। আর চলছিলো খুঁটির জোরে পাকিস্থানী যুদ্ধের জিগীর। কাজেই এশিয়ায় নানা ছলছুতায় পুরাণো সাম্রাজ্যবাদ নতুন বেশে মাথা চাড়া দেবার সুযোগ নিচ্ছিল। এটা বেশ শংকার হেতু বই কি! কিন্তু যুদ্ধ বাঁধলে সমূহ বিপদ। বিপদ ভারতের, বিপদ এশিয়ার দাস জাতিদের। কাজেই বার বার ভারতের নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা, যুদ্ধ পরিহারের আকুল আহ্বান, এশিয়ার যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে এতো হুঁশিয়ারী।

এসত্ত্বেও যুদ্ধ এড়ানো যায়নি। বরং যুদ্ধ এসেছিলো এশিয়াতেই, এসেছিলো তার সর্বগ্রাসী রূপ নিয়ে। এ'তে উপলক্ষ কোরিয়া; কিন্তু আসল লক্ষ্য সোবিয়েৎ রাশিয়া ও রুশীয় আদর্শে নবগঠিত মহাচীন। কার্যত এখানে আদর্শের লড়াই আর সাম্যবাদ বনাম গণতন্ত্রের আত্মপ্রসার প্রয়াসের মধ্যে সংঘাত। আবার এখানে

রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্বেরও পরীক্ষা। তবে মতলবটা হলো, সাম্যবাদের সঙ্গে একটা হেস্তনেস্ত করা। কাজেই যুদ্ধান্তে যে সাজ সাজ রব তোলা হয়েছিলো, পর্যায়ক্রমে কখনো ঠাণ্ডা ও কখনো গরম লড়াই-এর বুলিতে আকাশ বাতাস উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, এসময়টা তারই চূড়ান্ত অধ্যায়।

মজা এই, দ্বিতীয় মহাসমরে নিজ নিজ স্বার্থের তাড়নায় কি গণতন্ত্রী, কি কম্যুনিষ্ট,—উভয় তরফই পররাজ্যগ্রাসী ও প্রসারকামী অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে জোট বাঁধে। তখন যেন সবাই একদিল, এক গাট্টা। কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে শুরু হয় রাজ্যভাগ ও প্রভাব-বিস্তারের এলাকা নিয়ে বিরোধ, বাঁধে উভয় দলের মধ্যে খিটিমিটি। পূর্ব এশিয়ার কোরিয়া ও ইন্দোচীন, পশ্চিম এশিয়ার তৈল প্রধান মুসলিম রাষ্ট্রগুলো, আর পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যাতায়াতের একমাত্র সংক্ষিপ্ত জলপথ মিশরীয় এলাকার সুয়েজখাল এবং য়ুরোপের খণ্ডিত জার্মানী হয়ে দাঁড়ায় ঝড়ের কেন্দ্র। মূলত লড়াইটা জমে কায়েমী স্বার্থ ও পুঁজিবাদ বনাম স্বাজাত্যবোধ ও নবাদর্শের মধ্যে। এদের মাঝামাঝি এশিয়া ও আফ্রিকার ঔপনিবেশিক ও আধা-ঔপনিবেশিক দেশগুলো। তারা তো পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী গুটি দুই বড়ো রাষ্ট্রের স্বার্থের বাহন। কাজেই যুদ্ধ শেষ হবার পর বছর না ঘুরতেই মিত্রপক্ষের মিত্রতার প্রাচীরে যখন ফাটল দেখা দেয়, তখন আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। বিপদের দিনে ভেদাভেদ থাকে না, স্বার্থবুদ্ধিও সাধারণ বিপদের ধাক্কায় পড়ে চাপা। কিন্তু বিপদ ফুরোলেই যতো বিপদ! তখন চলে নিজেদের মধ্যে খাওয়া-খাওয়ি। অথচ উলুখড়দের প্রাণান্ত।

স্বার্থবুদ্ধি যে কতটা প্রবল হ'তে পারে, ১৯৪৬ সালের মার্চে ফুলটনে (ইংলণ্ড) তখনকার ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিলের বক্তৃতায় তা'র প্রথম আভাস মিলে। এ বক্তৃতা সাম্যবাদ তথা সোবিয়েৎ রুশিয়ার বিরুদ্ধে জেহাদ সৃষ্টির অপ-প্রয়াস ; আর

এতেই ঠাণ্ডা লড়াই বা Cold war-এর সূচনা। এর পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তখনকার প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান তাঁ'র বিখ্যাত 'বিশ্বরক্ষা নীতি' ঘোষণা করেন। এতে করে জেগে ওঠে নতুন ভয়, নতুন শংকা। ভারতবর্ষ গণে প্রমাদ। বৃটিশ কমনওয়েলথে থাকা-না-থাকা সম্পর্কে যেটুকু সংশয়ও অবশিষ্ট ছিলো, এ'তে তার আর চিহ্নমাত্র থাকে না। বিশ্বব্যাপারে একবারে বি-যুক্ত না হয়ে পড়তে হয়, আর শক্তিমানের সহানুভূতি ও সহায়তা হতে বঞ্চিত না হতে হয়—কমনওয়েলথে থাকার এ-ই তার মুখ্য হেতু।

কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সূচনা ('৪৫, ২৪শে অক্টোবর) থেকেই মিত্রপক্ষীয় অংশীদাররা সবাই এর সদস্য। ১৪টি শাখা প্রশাখায় বিভক্ত এ-সংস্থা। তাদের মাধ্যমে শুরু করেন ঠাণ্ডা লড়াই উভয় পক্ষীয় সদস্যরা। একের বিরুদ্ধে অন্যের, একের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে চলে অন্তহীন দোষারোপ। বিশ্ব প্রতিষ্ঠানটি কার্যত পরিণত হয় গণতন্ত্রের নয়া নেতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যদিকে সাম্যবাদী জোটের মুখপাত্র সোবিয়েৎ রাশিয়ার মধ্যে আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচারের মঞ্চে। জমে ওঠে চাপান ও উতোরের পালা। কিন্তু বিপদ মাঝামাঝিদের, শক্তিহীনদের। দুই প্রবলের মধ্যে পড়ে চিড়েচ্যাপ্টা হবার উপক্রম। তাদের কথা শোনে কে, ব্যথাই বুঝে কে! কেউ কেউ বিভ্রান্ত; কেউ বা লোভে পড়ে ও লাভের আশায় ইঙ্গ-মার্কিন জোটে ভিড়ে পড়ে। কেউ সাহায্য পায় সর্তাধীনে। কাজেই তারা মার্কিনী পাছদোহার; তার ইঙ্গিতে উঠে বসে। বৃটেনের অবস্থা কিন্তু মজার। সে যুদ্ধে বিধ্বস্ত; অথচ নিজের পুনর্বাসনের জন্য সময় ও সামর্থ্য সঞ্চয়ের প্রয়োজন। তা-ই আমেরিকার মুখাপেক্ষী। কিন্তু তা'র নেতৃত্ব মান্‌তে মনে প্রাণে রাজি নয়। কাজেই ঠাণ্ডা লড়াই-এর সূচনাও করে, ইন্ধনও জোড়ায়। ইচ্ছাটা হলো,—যায় শত্রু পরে পরে। পক্ষান্তরে ফ্রান্স পঞ্চ প্রধানের (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, সোবিয়েৎ রাশিয়া

ও চিয়াং-চীন) অন্যতম হলেও ধনসম্পদ্ ও নিজ উপনিবেশ রক্ষার ব্যাপারে সর্বক্ষণ আমেরিকার সাহায্য প্রত্যাশী। অথচ নিজের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বৈষয়িক প্রাচুর্যহীনতায় বিপন্ন। কিন্তু গরীবের ওপর অত্যাচার ও অনাচার অনন্ত।

ভারতের তো উভয়সংকট। একাধারে নবজাগ্রত এশিয়ার মুখপাত্র, আবার সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদের শত্রু। এ দুয়ের প্রভাব প্রথমে এশিয়া ও পরে আফ্রিকা হতে উচ্ছেদের প্রয়াসী। তা-ই বৃটেন ও ফ্রান্সের গোসা। এশিয়া ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে তাদের উপনিবেশ। বহু গিয়েও যা' ছিল, তা'ও যাবার ভয়। মুখ বুঁজে থাকা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তাদের চেষ্টা : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধীদের নায়ক ভারতকে জব্দ করা ; তার শীল তারই নোড়া দিয়ে তা'র দাঁতের গোড়া ভাঙ্গা। কাশ্মীর-বিরোধে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তের গোড়া এখানে। আবার পাকিস্থানী জিগীরে এ অঞ্চলে যুদ্ধাতঙ্কের বিস্তার ঘটানোও তাদেরই অপকৌশলের অঙ্গ। '৫০ সালের প্রথম ভাগে পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধবার সম্ভাবনা একারণেই প্রবল হয়। শেষ পর্যন্ত পাক প্রধান মন্ত্রী মরহুম লিয়াকৎ আলী খাঁর শুভবুদ্ধি আর শ্রীনেহরুর দূরদর্শিতা ও বিজ্ঞতায় তা ঘটেনি। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির (১১ই এপ্রিল, '৫০) পটভূমি এই।

পাক-ভারত যুদ্ধ বাঁধলে তৃতীয় পক্ষের লাভ নিশ্চয় হতো। লাভ হতো কিছুটা পাক শাসকগোষ্ঠিরও। কিন্তু লাভ হতো না ভারতের। যেহেতু তার উন্নয়ন হতো বিঘ্নিত, শিল্পায়ন সঙ্কুচিত। তবে ভারতের রেহাই ছিল না। নিজ ঘরোয়া সমস্যায় বিব্রত পাকিস্থান ; এসত্ত্বেও কাশ্মীর সমস্যাকে জিইয়ে রেখে ভারতকে উত্যক্ত করতে থাকে। এ অসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই ভারতের যুদ্ধ বর্জন ঘোষণার প্রস্তাব। কিন্তু ২৯শে নবেম্বর ('৫০) পাকিস্থান একে নিষ্ফল বলে জানিয়ে দেয়। যুদ্ধাতঙ্ক সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

এহেন পরিবেশে কোরিয়া যুদ্ধের আরম্ভ। পাক-প্রতিবেশীর হুম্‌কি ও জিগীরে যুদ্ধাতঙ্ক সৃষ্টি, আবার সারা এশিয়া তথা বিশ্বে যুদ্ধের দাবাগ্নি বিস্তারের সম্ভাবনা। ঘরে ও বাইরে প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সংকট নিঃসন্দেহ। কিন্তু '৫০ সালের ২৫শে জুন যখন উত্তর কোরিয়া না বলেকয়ে হঠাৎ দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে বসলো, দক্ষিণ কোরিয়া হলো রাষ্ট্রপুঞ্জের সাহায্য-প্রত্যাশী, তখনই শুরু ভারত সরকারের ঘোষিত নীতির অগ্নিপরীক্ষা।

অবস্থা অনুযায়ী আক্রান্তকে সাহায্য দান একান্ত ও আশু কর্তব্য। তা-ই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিতে বিন্দুমাত্র দেরি হলো না রাষ্ট্রপুঞ্জের। কিন্তু ভারত কি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে? তা'র নীতি তো বিশ্ব-ব্যাপারে নিরপেক্ষতাশ্রয়ী। অথচ তা' নিষ্ক্রিয় নয়। বরং বেগবান ও গতিধর্মী। যেহেতু বিশ্ব একতারে বাঁধা বীণা যন্ত্রের মতো—কয়েকটি গোষ্ঠিতে আবদ্ধ; কাজেই স্থায়ী নিরপেক্ষতা ও নির্লিপ্ততা অসম্ভব। এরূপ অবস্থায় প্রতিটি বিষয়ের গুণাগুণ বিচার করে ব্যবস্থা অবলম্বন বাঞ্ছনীয়; উভয় শক্তি জোটের স্বার্থ-সীমানা ও প্রভাব-পরিধির বাইরে থাকা নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন। কিন্তু আগুণ ছোঁব, অথচ তা'র আঁচে ঝল্‌সে বা পুড়ে যাবো না, সীতার মতো অগ্নিশুদ্ধ হয়ে বেরুবো, তা' চলে না। না চল্‌লেও ভারতের পরীক্ষা সুকঠিন। তবে মাঝামাঝি একটা পথ আবিষ্কার করলো সে। দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য দিতে অঙ্গীকার করা হলো, কিন্তু সর্তাধীনে। বলা হলো: শুধু কোরিয়ার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে যুদ্ধ সীমিত রাখতে হবে; যুদ্ধ বাইরে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিলেই তা'র নৈতিক সমর্থন প্রত্যাহৃত হবে অথবা এর সঙ্গে অন্য প্রশ্ন জড়ান চলবে না। তা ছাড়া, কোরীয় প্রশ্নের মীমাংসা কোরিয়াবাসীরাই করবে। এটা হলো পররাষ্ট্র নীতিতে ভারতের নৈতিক শক্তির প্রয়োগ অথবা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কূটনীতির নয়,—সন্নীতির প্রথম আমদানী। গান্ধিজীর শিক্ষার সার্থক প্রয়োগ।

এক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকার অসঙ্গতি, অস্পষ্টতা বা স্ব-বিরোধিতা লক্ষণীয়। রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্য রাষ্ট্ররূপে উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সমর্থন করলো সে; কিন্তু সেখানে সেনা বা রসদ জোগান হলো না। হলো কিনা, শুশ্রূষাকারী দল পাঠানো। কিন্তু উভয় শক্তিগোষ্ঠির ভুল বুঝাবুঝি থেকে তার রেহাই নেই। একদল ভাবলো—যুদ্ধে না জড়াবার কথা মনের নয়, মুখের; অন্যদল ভাবলো—যুদ্ধ ঘোষণার প্রস্তাব সমর্থন করেও যুদ্ধের রসদ না পাঠানো প্রকারান্তরে দুষ্কর্মের প্রশ্রয় দান। আবার ভারতে সরকার-বিরোধীরা প্রকাশ্যে বলতে লাগলো—ভারত ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। তাই ৫০ সালের ১২ই অক্টোবর, ৬ই ও ৩১শে ডিসেম্বর সংসদে শ্রীনেহরু ভারতের নীতি ও মনোভাব নতুন করে ব্যাখ্যা করেন।

কোরিয়া যুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে ভারতের দ্বিধা ছিলো নিঃসন্দেহ। কিন্তু যুদ্ধ-বিস্তার রোধের ব্যাপারে তার সংশয়মাত্র ছিল না। তা-ই ৩৮° অক্ষরেখা ছাড়িয়ে যখন রাষ্ট্রপুঞ্জের অধীনস্থ ২২টি দেশের সেনাদল উত্তর কোরিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো, আর হলো চীনকে আক্রমণকারী রাষ্ট্ররূপে ঘোষণার সময় উপস্থিত, তখন ভারতের তরফ হতে করা হলো প্রবল বিরোধিতা। এ-নীতি নশ্চয়ই শক্তি-নিরপেক্ষ। ভারত খোলসা করেই বললো—এতে যুদ্ধের বিস্তার ঘটবে ও যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। চীন একে ভাল চোখে দেখবে না, নিজ নিরাপত্তার পক্ষে বিঘ্নকর মনে করবে। ১৬ই ডিসেম্বর ('৫০) শ্রীনেহরু সংসদে একথা ঘোষণাও করলেন। কিন্তু দুর্বলের ভালো কথায়ও সবল কান দেয় না। তা-ই ৩৮° অক্ষরেখা অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই চীন মরিয়া হয়ে করলো প্রতিরোধ, বরং উল্টে প্রচণ্ড বেগে করলো পিছু তাড়া। শুরু হলো আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণ, শুম্ভ ও নিশুম্ভের লড়াই। কাজেই ভারতের হুঁশিয়ারী নিরর্থক হয়নি; যেহেতু নবীন চীনের মনোভাব

তার অজ্ঞাত ছিলো না; তার তীব্র সম্ভ্রমবোধ সম্পর্কে সে ছিলো সচেতন। তবে তখনকার সংশয়িত পরিবেশে ভারত ও নবীন চীনের মধ্যে শুভেচ্ছা, প্রীতি ও বিশ্বাসের উন্মেষ ঘটানো এক অসাধ্য সাধন। তা-ই করেছিলেন সে সময়কার পিকিংস্থ ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সর্দার কে এম পানিকর।

কোরিয়া যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা যা'তে হয়, শ্রীনেহরু তখন প্রস্তাবও করেছিলেন; হয়েছিলেন মঁ স্ট্যালিন ও তখনকার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডীন অ্যাচেসনের দ্বারস্থ। তাঁ'র কথা ছিলো, নিরুপদ্রবে এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করতে হবে ও কম্যুনিষ্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সদস্যরূপে মেনে নিতে হবে। রাশিয়া এতে আপত্তি করেনি, করেছিলো আমেরিকা। বলেছিলো: বিষয় দুটো পরস্পর-নিরপেক্ষ। আক্রমণকারী উত্তর কোরিয়াকে ৩৮° অক্ষরেখার উত্তর দিকে হটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করাই প্রস্তাব সমর্থনকারী রাষ্ট্রের প্রথম করণীয় কাজ। বৃটেন এ-ব্যাপারে করলো মার্কিন অভিমতের প্রতিধ্বনি। কাজেই শ্রীনেহরুর শান্তি-স্থাপনের প্রথম চেষ্টা অঙ্কুরে নাশ হয়েছিল। কিন্তু এবার ভারতের বিরুদ্ধে সোবিয়েৎ মনো-রঞ্জনের অভিযোগ উঠ্‌লো। অর্থাৎ ভারতীয় বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে দক্ষিণ ও বাম থেকে আক্রমণ। তার নিরপেক্ষতার আদর্শ ও শান্তি-স্থাপন প্রয়াস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হলো। কাজেই ভ্রান্তি-নিরসনে শ্রীনেহরুর উদ্যম। নিরপেক্ষতার নতুন ব্যাখ্যা করলেন, তিনি বললেন, "If we say, we are permanently neutral, it has no meaning except permanent retirement from public affairs—in the national sense 'sanyas'—অর্থাৎ যদি বলি, আমরা সব সময়ের জন্য নিরপেক্ষ, তা'হলে জনসেবার ক্ষেত্র হ'তে একেবারে অবসর অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ ছাড়া এর ভিন্ন কোন অর্থ হয় না।"

আগেই বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় পররাষ্ট্র

নীতির প্রথম প্রয়োগকালে দ্বিধা ও ভ্রান্তির অবকাশ ছিলো প্রচুর। এবিষয়ে ১০ই অক্টোবর ('৫০) চীন কর্তৃক তিব্বত দখলের অভিযান আর একটি দৃষ্টান্ত। এ নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের মন কষাকষি কম হয়নি। কেননা, মূলত উভয়ের ভাবী রাষ্ট্রিক নিরাপত্তার সঙ্গে এ-বিষয়টি জড়িত। ভারত এ-সম্পর্কে কয়েকটি প্রতিবাদলিপিতে চীনকে জানিয়ে দেয়: কাজটা ভালো নয়, পথটাও বড়ো পিচ্ছিল রক্তাক্ত; বরং রফা করাই যেন ভালো। কিন্তু তুরুপ জবাব চীনের: তিব্বত চীনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ; এটা তা'র ঘরোয়া ব্যাপারও বটে; কাজেই ভারতের মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন; তা'ছাড়া চীনের পশ্চিম সীমানা সুরক্ষিত করা দরকার। অথচ কম্যুনিষ্ট চীনের অভ্যুদয়কালে তা'কে 'এশিয়ার নবজাগ্রত শক্তি' বলে অভিনন্দিত করার কসুর করেনি ভারত। অবশ্য বাস্তবকে মেনে নিতে ও নিজেকে সাম্‌লে নিতেও দেরি হয়নি তার। দেরি করেনি পক্ষাপক্ষের ভ্রান্তি-নিরসনে। কাজেই কোরিয়া সমস্যা মীমাংসাকালে চীনকে স্বীকৃতি ও মর্যাদা দেবার এমন প্রয়াস। এতে করে প্রথম দিকে চীনের, আর পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার আস্থা অর্জন করা তা'র পক্ষে সহজ হয়েছিল। তবে একথা সত্য, মধ্যস্থ বা রফাকারীরূপে তার ভূমিকা যেমন রাশিয়া, তেম্‌নি ইঙ্গ-মার্কিন জোটের প্রয়োজনেই স্বীকৃত। অবশ্য নিজের প্রয়োজনের নিরন্তর তাগিদই তাকে এ-ভূমিকায় অভিনয় করাতে বাধ্য করাচ্ছে। শ্রীনেহরু এবিষয়ে খুবই সজাগ। এসত্ত্বেও মাঝে মাঝে উভয় গোষ্ঠির স্বরূপ বিশ্লেষণেও কুণ্ঠিত হননি তিনি।* কাজেই উভয়েই

* **পাদটীকা**:—১৬ই অক্টোবর তিনি ('৫০) ভারতীয় সংসদে রাশিয়া সম্পর্কে বলেন, "Would Communism in its expansionist aspect, just as any other expansionist movement, is considered a danger to peace and freedom? It appears however, sometimes in the guise of a liberating movement."

বেজার, উভয়েরই গোসা। মোট কথা, কেউ তার প্রতি তুষ্ট নয়। কিন্তু 'বায়ুভূতো নিরাশ্রয়' অবস্থা রাষ্ট্রনীতিতে অচল। তা-ই অন্যের আস্থা লাভের, ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির স্বরূপ সকলের বোধগম্য করার প্রয়াস। ১৬ই অক্টোবর ('৫০) তারিখেই তিনি বললেন, "এ সমস্যার একটা সামরিক দিকও আছে। কিন্তু আমাদের বদ্ধমূল ধারণা, সাধারণের শুভেচ্ছা অর্জন ও বোধম্যতাই আসল সমস্যা। শুধু সামরিক বিষয়ের চিন্তা করলে সমগ্র সমস্যাই ভুল বুঝা হবে।"

সন্দেহ নেই, বিশ্বশান্তি ভারতের নিজ স্বার্থেই প্রয়োজন। এহেতু কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে শ্রীনেহরুর উদ্যোগেই কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতি পরিকল্পনার একটা খসড়া রচিত হয়; তা'তে স্বীকৃত হয় চীনের দাবী। এর পর ২৩শে জুন ('৫১ সাল) নিউ ইয়র্ক হতে বেতারযোগে রাষ্ট্রপুঞ্জে রুশ প্রতিনিধি ম' মালিক যুদ্ধবিরতি ও মীমাংসার প্রস্তাব করেন। রাষ্ট্র-পুঞ্জের অধীনস্থ ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষও একে গ্রহণ করেছিলেন নিজেদের তাগিদে। যেহেতু একথা বুঝতে তাদের দেরি হয়নি যে (১) উত্তর কোরিয়া চীন তথা রাশিয়ার সাহায্যপুষ্ট (২) কম্যুনিষ্ট বাহিনী রণদুর্মদ, সুকৌশলী ও অজেয় (৩) যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্ষতি কা'রো কম হবে না।* তা' ছাড়া, তাদের সামরিক বলের দম্ভও ধূলোয় লুটায়, শ্রেষ্ঠত্ববোধও হয় আহত। তা' ছাড়া, স্পেনের মতো কোরিয়াকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়াক্ষেত্রে পরিণত করার যে চেষ্টা হয়েছিলো, তা' অল্পেতেই হয় সংযত। এব্যাপারে ভারতের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। যেমন যুদ্ধের বিস্তার রোধে, তেমনি কোরিয়া কমিশনের সদস্যরূপেও ভারতীয় প্রতিনিধিদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

* পাদটীকা:—এক আমেরিকারই ১০৩৭১৮ জন হতাহত ও বন্দী হয় ('৫১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত)।

কোরিয়া যুদ্ধের একটা সুফল এই : এশিয়ার ব্যাপারে এশিয়ার রাষ্ট্রনায়ক শ্রীনেহরু ও চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই-এর প্রভাব ও প্রাধান্যের স্বীকৃতি। গত দু'শো বছরে এই প্রথমবার এশিয়ার ভালোমন্দে এশিয়াবাসীর কথার মূল্য দেয়া হয়। এসময়টা পাশ্চাত্যের কূটনৈতিকগণেরই এশিয়ার দণ্ডমুণ্ডের কর্তারূপে একচেটিয়া ভূমিকা ছিল। কিন্তু দু'জন প্রধান মন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব-প্রভাবে সেই ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটে। তাঁদের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের মহাপরাক্রান্ত মহল যে জোট বেঁধেছিল, তা' বিফল হয়ে যায়। ইতিহাসে এঘটনা অভাবনীয়।

নিজের সংহতি ও ঐক্যবিধান যতটা হবে বলে মনে করা হয়েছিল, '৫০ ও '৫১ সাল অবধি ভারতে ততটা হয়ে ওঠেনি। হয়নি কতকটা নিজ সামর্থ্যের অভাবে, কতকটা বাইরের চাপে। তাই কাশ্মীর ও উদ্বাস্তু সমস্যা আর বিদেশী ছিটমহল, বিশেষ করে পর্তুগীজ-গোয়া প্রভৃতির অস্তিত্ব—নিঃসন্দেহে তার পক্ষে পীড়াদায়ক। ফ্রান্স যেমন ভব্যসভ্য-ভাবে (কিছুটা অনাচারের পরখ পণ্ডিচেরীতে না হয়েছিল এমন নয়) ভারত ছেড়ে গিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুদে বোম্বেটে পর্তুগাল তা'র বিপরীত আচরণ করছে। অবশ্য তার জন্য দায়ী ভারতের ভালমানুষী অথবা তা'র রীতি-নীতি ও ঐতিহ্য। এর সুযোগ নিয়ে পর্তুগাল চালায় অসংখ্য অত্যাচার অনাচার, 'ন্যাটো'য় করে নালিশ। আবার যেহেতু পর্তুগাল 'ন্যাটো'র সদস্য, সেহেতু গোয়ার ব্যাপারে একদা এর হস্তক্ষেপের কথা পর্যন্ত উঠেছিল। এ উপলক্ষেই শ্রীনেহরুকে ২৭।৭।৫৫ সংসদে গোয়ার ব্যাপারে * 'মনরো নীতির' প্রয়োগ সম্পর্কে নতুন ভাষ্য রচনা

* পাদটীকা :—"In 1823 America enacted Monroe Doctrine.** According to it, any interference by any European country in either North or South America would be interference with the United States. In existing conditions any interference by any other power would also be an interference in the political system of India. That need not be called any particular doctrine. It is a recognition of facts."

[illegible] আধিপত্যের বল প্রয়োগে যা' সম্ভব, বা সীমাবদ্ধ আকারের লড়াই করে যা' আদায় করা যেতে পারে, এমন কিছু করতেও ভারত চায়না। যেহেতু ছোট লড়াইও বড় যুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি করে থাকে। অথচ অসংখ্য গোয়াবাসী ভারতীয় প্রজার মঙ্গলামঙ্গল এর সাথে সংশ্লিষ্ট। এটা অন্যের দৃষ্টিতে ভারতের আচরণে আর একটা অসঙ্গতি বই কিছু নয়।

'৫১-'৫৫ পর্যন্ত বান্দুং সম্মেলনের পূর্ববর্তী অধ্যায় ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বিবর্তন বা বিকাশ কাল। ইংরেজীতে যাকে বলে formative stage. এসময় ভারত আত্মস্থ; তার নীতি একটা সুনির্দিষ্ট রূপাশ্রিত। নিজ ভূমিকা, শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন সজাগ; সংশয় ও দ্বিধামুক্ত। নিজের মত ও পথের বিভ্রান্তি তা'র অপগত। উপনিবেশ ও পুঁজিবাদের বিরোধিতা তার নীতি; এশিয়া ও আফ্রিকার দুঃখী অগণ্য জনতার সে দৃষ্টান্তস্থল। কাজেই পরশাসিত ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলো যেমন তা'কে মান্য করে, যেমন তার মন্ত্রণা ও সাহায্যকামী, তেম্‌নি সে-ও তাদের বন্ধন-মুক্তির প্রয়াসকে জয়যুক্ত করতে তৎপর। এ তা'র নৈতিক আদর্শের জয়জয়কার। '৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কিত প্রস্তাবে এ-নীতি স্বীকৃত। ওর একাংশে বলা হয়—"বিদেশী পর-পদানত এশিয়ার অন্যান্য জাতির মুক্তির প্রতীক ও আবাহনী হলো ভারতের স্বাধীনতা। ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ ও ইরাক প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা কাম্য। এখন জাপানের অধীনস্থ দেশগুলোকে পরে কোন উপনিবেশিক শক্তিকে দান করা চলবে না।" তা-ই জাপানে মার্কিন সামরিক ঘাটি স্থাপনের পাকা-পাকি বন্দোবস্ত করে জাপানের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সন্ধিচুক্তি হয়, ভারতের পক্ষে শ্রীনেহরু তা'তে স্বাক্ষর করেন না। এর প্রথম হেতু নৈতিক, দ্বিতীয়টি এশিয়ায় মার্কিন সামরিক প্রভুত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার আশংকা।

এ-আশংকা ভারতের অমূলক নয়। পূর্ব এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া—এ দু'দিক হতে মার্কিন রণনীতির দু'বাহুর ক্রমিক চাপ ও রণনীতি-আশ্রিত কূটনীতির বিস্তার তার পক্ষে উদ্বেগের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। কাশ্মীর ও গোয়া তার জলজ্যান্ত দৃষ্টান্ত। ডালেস-কুন্‌হা যৌথ বিবৃতি* এর সর্বশেষ পরিণতি। ছলচাতুরী ও হুমকি দিয়ে ভারতকে ইঙ্গ-মার্কিন জোটে ভিড়ান অথবা তার গোষ্ঠি-নিরপেক্ষ স্বাধীন কর্মনীতি পরিহারে বাধ্য করাই এর আসল অভিসন্ধি।

কার্যত '৫০ সাল থেকেই পৃথিবীব্যাপী মার্কিন সামরিক জাল বিস্তারের কাজ শুরু হয়। ১৮ই মে অতলান্তিক চুক্তি স্বাক্ষরকারী ১২টি রাষ্ট্র স্থায়ী অতলান্তিক সামরিক সংস্থা গঠনের কথা ঘোষণা করে। এরি অন্য এক শাখা মধ্যপ্রাচ্য সামরিক সংস্থা (১০ই নভেম্বর, '৫১)। বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স ও তুরস্ক এর সদস্য। এতে মিশরকেও সাহায্যের প্রলোভন দেখিয়ে দলে ভিড়াবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সরাসরি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে। তা' ছাড়া, পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রকেও এতে জড়াবার চেষ্টা চলতে থাকে। রাশিয়ার পক্ষে এ-চেষ্টাকে সন্দেহ ও ভয়ের চোখে দেখা অস্বাভাবিক নয়। কাজেই ১লা নভেম্বর ('৫১) সংশ্লিষ্ট সকলকে হুঁশিয়াব করে বলে—কেউ ওতে যোগ দেবে তো অমিত্রোচিত, এমনকি বৈরিতামূলক কাজ বলে গণ্য হবে। আবার ৯ই নবেম্বর ('৫১) 'ন্যাটো'র নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানী সহ এক য়ুরোপীয় সৈনাবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত হয়। কাজেই রাশিয়াও য়ুরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায়

---

* পাদটীকা:—৩।১২।৫৫ তারিখে ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডালেস ও পর্তুগীজ পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কুনহা এক বিবৃতি প্রচার করেন। ওতে গোয়াকে পর্তুগালের মূল ভূখণ্ডের অন্তর্গত একটি প্রদেশ বলে বর্ণনা করা হয়। কাজেই বিবৃতিটি প্রকারান্তরে পর্তুগীজ উপনিবেশবাদের সমর্থন। তবে প্রয়োজন হলে মার্কিন সামরিক ঘাটিরূপে একে ব্যবহার করাই এর উদ্দেশ্য।

অবস্থাভেদে পাল্টা সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

এদিকে আণবিক কূটনীতির চালাচালিও শুরু হয় নানাভাবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ ভাগে মাত্র দু'টো আণবিক বোমায় ধ্বংস হয়ে যায় জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমা সহর; হিরোশিমায় ৬০ হাজার লোক হয় নিহত। অনেকে পঙ্গু ও বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। বহুর দেহমনে আণবিক রশ্মি বিচ্ছুরণজাত গুরুতর প্রতিক্রিয়া ইদানীং-ও প্রত্যক্ষ। অথচ প্রথম দিকে এগুলো ছিলো অজানা। এসত্ত্বেও নতুন অস্ত্রের কার্যকারিতা পরীক্ষায় ও একে পূর্ণাঙ্গ করে নির্মাণেব প্রতিযোগিতায় আমেরিকা ও রাশিয়া মেতে উঠে। উভয়ে শিল্প-প্রধান; উভয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক বিদ্যায় উন্নত। যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বৃটেন এক্ষেত্রে তাদের পশ্চাদ্‌গামী। তা' হলেও বর্তমানে আণবিক গবেষণায় প্রায় সমকক্ষ। কাজেই এ' তিনের পাল্লায় ও কল্যাণে অপবিমেয় শক্তিধব ও মারণক্ষম হাইড্রোজেন বোমা ও শেষ অবধি কোবাল্ট বোমার (?) উদ্ভব ঘটেছে। সাধারণ মানুষ আতংকিত ও ভয়ার্ত। পৃথিবীর পরমায়ু কি তবে শেষ হবার সময় আসন্ন? কিন্তু আণবিক অস্ত্রের হুমকি ও শক্তির দম্ভ প্রকাশও আমেরিকার কার্যোদ্ধারের সহায়ক নয়। কারণ, রাশিয়াও এবিষয়ে সমান পারঙ্গম। কিন্তু আণবিক চালে না হলেও কূটনীতির চালে রাশিয়ার সাময়িক পরাজয় ঘটে। স্টালিন-চালিত রাশিয়ার সঙ্গে মতান্তরে টিটো-শাসিত কম্যুনিষ্ট যুগোশ্লাভিয়ার মনান্তর হয়, বিচ্ছেদ ঘটে ('৪৮)। এ-সুযোগ নিতে দেরি করে না ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি। খাদ্য ও রসদ জুগিয়ে তাকে কমুনিষ্ট-জোট হতে বিচ্ছিন্ন করে যেলে। কাজেই যে ঠাণ্ডা লড়াই-এর সীমা ছিলো পূর্ব-এশিয়ার কোরিয়া, ফরমোজা ও ইন্দোচীন পর্যন্ত, তার ব্যাপ্তি ঘটে সারা পশ্চিম এশিয়া ও য়ুরোপে। আবার খণ্ডিত ও পুনরস্ত্রসজ্জিত জার্মানী বিরোধের মূল ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় ইরাণ, ইরাক, লেবানন, সৌদী আরব,

ইয়েমেন ও ইস্রায়েলকে কেন্দ্র করে তৈল রাজনীতি ঘোঁট পাকিয়ে ওঠে। এতে প্রত্যক্ষত ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির স্বার্থই বেশি। তাই তারা আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ভেদবিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে। ভারসাম্য রক্ষা করে অস্ত্র সরবরাহের নামে ইস্রায়েলের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখায়। নানা ছলে মিশর সহ বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র একদিকে ও অন্যদিকে ইস্রায়েলের মধ্যে সীমাবদ্ধ আকারে লড়াই-এ পরোক্ষে ইন্ধন জোগায়। উদ্দেশ্য ঃ উভয়কে কাবু করা ও সে-ফাঁকে নিজেদের তৈলের মুনাফা অবাধে লুটে নেওয়া।

রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক এ-সংঘাতের মধ্যেও কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় জনজাগরণ লক্ষণীয়। মিশরে খাল এলাকা থেকে ইংরেজ সেনাপসার। ও ইরাণে ডাঃ মোসাদেকের নেতৃত্বে তৈল রাষ্ট্রীকরণের আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত খাল এলাকার ইংরেজ সেনা স্থানান্তরের আন্দোলন সার্থক হলেও '৫৩ সালের আগস্টে ইঙ্গ-মার্কিন চক্রান্তে ডাঃ মোসাদেকের পতন ঘটে। এতে তৈল রাষ্ট্রীকরণের চেষ্টা বিফল হয়। ইরাণে পুনরায় ইঙ্গ-মার্কিন প্রভুত্ব কায়েম হয়।* এ ঘটনা ভারত তথা নবজাগ্রত এশিয়া-আফ্রিকার পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। যেহেতু ইরাণ তার বিপদাপদে ভারতের পরামর্শে লাভবানই শুধু হয়নি, ভারতের সঙ্গে সৌখ্য-সূত্রেও আবদ্ধ হয়েছিল। এ সখ্যতা এখনও আছে ; কিন্তু ডাঃ মোসাদেক চালিত ইরাণ ভারতের আদর্শ ও লক্ষ্য সিদ্ধির যেরূপ সহায়ক হতে পারতো, বর্তমান ইরাণ দ্বারা তা' সম্ভব নয়।

উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার আর এক থাবা বোগদাদ চুক্তি

* **পাদটীকা :**—১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে ইরাণ বোগদাদ চুক্তি সংস্থায় যোগ দেবার সিদ্ধান্ত করে। অথচ গত এক শতাব্দীরও বেশী সময় বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নিরপেক্ষ (buffer state) রাষ্ট্ররূপে ঐতিহাসিক ভূমিকা এর ছিল।

সংস্থা। তুরস্ক, ইরাণ, ইরাক, পাকিস্থান * ও বৃটেন এর সদস্য। এর জন্মকাল '৫৪ সাল। এ বছরই পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ও পাক-তুরস্ক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আবার '৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে ইরাক-তুরস্ক চুক্তি সম্পাদনের ফলে কার্যত আরব লীগের অস্তিত্ব লোপ পায়। পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক শক্তিরূপে লীগের যে-ভূমিকা ক্রমশ স্বীকৃতি পাচ্ছিল, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের চাপে তা' নষ্ট হয়ে যায়। আবার এপ্রিল মাসে বৃটেন ইরাক-তুরস্ক চুক্তিতে যোগ দেয়। এদিকে সামরিক জোটে যোগ দেবার সর্তাধীনে মিশরকে মার্কিন সমর-সম্ভার সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এ-ভাবেই চলে একদিকে অনগ্রসর পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে কুক্ষিগত ও তাদের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রতিবন্ধকতা করা এবং অন্যদিকে চলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে বজ্রবেষ্টনী রচনা। পরোক্ষে স্বাধীনচিত্ত ও শক্তি-নিরপেক্ষ এসব রাষ্ট্রেও যুদ্ধাতঙ্কের বিস্তার ঘটে ও ভারতীয় নীতির কল্যাণস্পর্শ হ'তে এরা বঞ্চিত হয়।

পূর্ব এশিয়াতেও '৫৪ সালের শেষদিকে (১-৯-৫৪) আমেরিকার উদ্যোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা গড়ে ওঠে। অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, তাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন ও পাকিস্থান এর সক্রিয় সদস্য। এরো আগে কোরিয়া যুদ্ধের পরই অষ্ট্রেলিয়া, নিজজিল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে গঠিত হয় 'আঞ্জাস' (Anzus) সংস্থা।

এ-সময়ই মার্কিন সাহায্য-পুষ্ট ফরমোজাকে নিয়ে আবার এ-অঞ্চলে যুদ্ধের পরিবেশ ঘনিয়ে ওঠে। কম্যুনিষ্ট চীন একে আক্রমণের আয়োজন করে; সীমাবদ্ধ আকারে লড়াইও চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বহু জল ঘোলা হবার পর বান্দুং সম্মেলনে চীনের প্রধান মন্ত্রী আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি রফা করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা

---

* **পাদটীকা**:—'৫৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর পাকিস্থান বোগদাদ চুক্তি সংস্থায় যোগ দেয়।

করেন। এতে শ্রীনেহরু প্রভাব প্রত্যক্ষ। এ-ঘোষণার পর পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধের জোয়ারে ভাটা পড়ে।

এ-সত্ত্বেও একটা বিষয় অনস্বীকার্য, ফরমোজা বা ইন্দোচীন অথবা পশ্চিম এশিয়া—যেখানেই যুদ্ধাতঙ্ক দূর করে শান্তির মঙ্গলময় পরিবেশ রচনার প্রয়োজন উপস্থিত হয়েছে ও পক্ষাপক্ষ সকলের নিকট হ'তে আহ্বান এসেছে, ভারত নিজস্ব রীতি ও যোগ্যতা অনুযায়ী কাউকে সাহায্য দিতে পশ্চাদ্‌পদ হয়নি। পক্ষান্তরে সামরিক সংস্থা বা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিজোটে যোগ দিতে বাধ্য করার জন্যে যেসব কৌশল তার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছিল, তা'র প্রতিরোধই করেনি শুধু: শান্তি এলাকা গঠন ও তা'র প্রসারও করেছে। আবার যখন ঠাণ্ডা ও গরম লড়াই-এর বিষবাষ্পে দিগাঙ্গন কলুষিত, তখন শান্তিবারি সিঞ্চনও করেছে সে। এ-সঙ্গে করেছে রাষ্ট্রপুঞ্জের নানা শাখা-সমিতিতে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা; করেছে অছিশাসিত এলাকায় স্বাধিকার প্রবর্তনের সূচনা; পদানত ও আশ্রিত দেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দানের ব্যবস্থা সমর্থন। এ-উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জে এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠি বলে পরিচিত—এশিয়া ও আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার কৃতিত্বও তা'র। আবার রাষ্ট্রপুঞ্জের মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকার ইতালীয় এলাকায় স্বাধীনতা লাভ, সোমালিল্যাণ্ড সম্পর্কিত সংশোধিত প্রস্তাব উত্থাপন এবং ইদানীংকালের গোল্ড কোস্ট, * মরক্কো ও তিউনিসিয়ার স্বাধীনতা অর্জনে তার ভূমিকা সর্বত্র স্বীকৃত। তা'ছাড়া, ফরাসী-শাসিত বিক্ষুব্ধ আলজেরিয়ার সঙ্কট-মোচনকল্পে তার পাঁচ দফা পরিকল্পনাও উল্লেখযোগ্য। এ-প্রসঙ্গে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার নিষ্পত্তি চেষ্টা ও উভয় শক্তিজোটের মধ্যে ভ্রান্তি নিরসনে তা'র উদ্যম কম উল্লেখযোগ্য নয়।

* পাদটীকা ঃ—'৫৭ সালের ৬ই মার্চ পূর্ণ স্বাধীন ঘোষিত হবে। এ হবে আফ্রিকার প্রথম স্বাধীন নিগ্রো রাষ্ট্র। এর স্বদেশী নাম ঘানা।

কাজেই তৃতীয় শক্তিজোট গঠন, নিজ প্রভুত্ব বিস্তার ও বিশ্ব-ব্যাপারে নেতৃত্ব করা সম্পর্কে তার ওপর যেসব অভিসন্ধি আরোপ করা হয়েছে তা' উদ্দেশ্যপ্রসূত ব্যাপার। সত্যোস্বাধীন সে। মর্মেমর্মে জানে— জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনই দাস জাতির ধর্ম ; সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদ তা'র পক্ষে বিষবৎ। এ-হেন অবস্থায় দ্বিমুখী তা'র অভিযান যথা— (১) সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদ বিরোধিতা ও অন্যের স্বাতন্ত্র্য অর্জনে সহায়তা ; (২) নিজ ঘরোয়া উন্নয়নকল্পে অন্যের ব্যাপারে অনধিকাব চর্চা না করা ; বরং উভয় পক্ষের ইচ্ছানুযায়ী বিরোধ মীমাংসায় সহায়তা করা এবং এজন্যে সর্বোপায়ে পৃথিবীতে নিরুপদ্রব পরিবেশ রচনা করা ও বজায় রাখা।

ভারতের বৈদেশিক নীতির যাথার্থ দ্বিতীয়বার যাচাই হয় ইন্দোচীন সঙ্কটের কষ্টিপাথরে। হো-চী মিনের নেতৃত্বে ইন্দোচীনেব জাতীয়তাবাদীরা যখন মার্কিন পৃষ্ঠ-পোষিত ফবাসী ঔপনিবেশিক শাসন বিপর্যস্ত করে ফেললো, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের 'মান-সম্মান' গেলো রসাতলে আর অধিবাসীদের রইলো না দুর্গতির সীমা, তখনকাব সে-সঙ্কট মোচনে ভারতের ভূমিকা স্মবণীয়। উভয় শক্তি-গোষ্টিব মধ্যে মধ্যস্থতার ব্যাপারে ও তাদের মধ্যে ভ্রান্ত ধাবণা দূব করতে যে-প্রয়াস সে করেছিল, তা' সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের স্বীকৃতি এই প্রথমবাব লাভ করে। অর্থাৎ বিগত বহু বছরের মধ্যে সেই প্রথম উভয় গোষ্ঠির মধ্যে তার ভূমিকার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। এ-উপলক্ষে জেনেভায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ('৫৪, এপ্রিল) তখনকার বৃটিশ পববাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ অ্যাণ্টনী ইডেন (এক্ষণে প্রধান মন্ত্রী) ও ভারতেব ভ্রাম্যমান বেসরকারী দূত শ্রীকৃষ্ণ মেননের চেষ্টায় একটা মীমাংসা সম্ভব হয়। শুধু তা-ই নয়। ভারতের উদ্যোগে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ-এন লাই-এর সে-বৈঠকে প্রথমবার যোগদান এবং সমস্যা মীমাংসায় সহায়তা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে এক প্রথম শ্রেণীর ঘটনা। তা' ছাড়া, ইন্দোচীনের সঙ্কট মোচনে সাহায্য করেই ক্ষান্ত থাকেনি

ভারত। ইন্দোচীন যুদ্ধবিরতি কমিশনের সভাপতির পদ গ্রহণ ও সরেজমিনে চুক্তি কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের গুরু দায়িত্বভার বহনও কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়। পূর্বে এসব ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গেরই ছিল একচেটিয়া অধিকার। ভারতের নেতৃত্বে সে-অধিকারও এশিয়াবাসীর লভ্য হওয়া বিশেষ গৌরবের বিষয়।

পূর্বে বলা হয়েছে, গোড়ার দিকে দু' শিবিরই ভারতের স্বাধীন ভূমিকাকে ভুল বুঝেছিল; ভুল বুঝেছিল তা'র অন্য-নিরপেক্ষ নীতিকে। কিন্তু পৃথিবীর ঘটনাপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্তনশীল, নিত্য সমুখপানে ধাবমান। এহেতু আন্তর্জাতিক হাওয়া বদলের পালায় উভয়ের চেতনা জাগে যে ভারতের শক্তি-নিরপেক্ষতা ও স্বতন্ত্র সত্তা সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে আশীর্বাদ-স্বরূপ। যেহেতু সকলের সঙ্গে সৌখ্যভাব বজায় থাকায় উভয় দলের বক্তব্য ও মনোভাব সহজে উপলব্ধি করা, আর উভয়ের মধ্যে মতবিরোধ ও ভ্রান্তি দূর করা তার পক্ষেই সহজে সম্ভব। তা' ছাড়া, কোন দলের কাছে তার বাধ্য-বাধকতা নেই, কারো সম্পর্কে নেই পূর্ব-ধারণা, নেই তার স্বার্থ-বুদ্ধি। কাজেই বিরোধী জোটদ্বয়কে একমাত্র সে-ই পরস্পরের নিকটবর্তী করবার যোগ্য পাত্র। অবশ্য এ-তাগিদটা ভারতের নিজেরও। এখানে তার ভাবী মঙ্গলামঙ্গলের প্রশ্ন জড়িত। তা'র উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড রূপায়নে যে জগদ্বাসী সকলেরই শুভেচ্ছা প্রয়োজন।

শুভেচ্ছা লাভের এ-প্রয়াস তা'র সার্থক হয়েছে। ঘনকৃষ্ণ মেঘের আস্তরণ হয়েছে ভেদ: বাধার প্রাচীর বিদীর্ণ। '৫৩ সালে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতিরূপে শ্রীনেহরুর ভাষণেও বলিষ্ঠ আশাবাদিতার সুর স্পষ্টতর। তিনি বলেন, "সকল দেশের সঙ্গে হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন ও অন্যের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা না করাই আমাদের বৈদেশিক নীতি। বিশ্বে তিক্ততা ও পারস্পরিক সন্দেহ যথেষ্ট বর্তমান; আর যে-কোন পক্ষের উদ্যোগকে সংশয়ের চোখে দেখা হয়ে থাকে। এ-হেন অবস্থায় এরূপ নীতি অক্ষুন্ন রাখা কদাপি

সোজা কাজ নয়। এ-সত্ত্বেও আমি বলতে আনন্দবোধ করছি যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক মধুর।"

কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ও কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠির মধ্যে পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তারের পরিধিক্ষেত্র নিয়েই শুধু হাঙ্গামা নয়। বর্ণবৈষম্যও বিশ্ব-শান্তির হন্তারক। এমনকি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো শ্বেতাঙ্গ-শাসিত দেশে বর্ণবৈষম্যের উৎকট অভিযানে (Apartheid) তথাকার কৃষ্ণাঙ্গ ও এশিয়াবাসী, বিশেষ করে ভারতীয়দের প্রাণ ওষ্ঠাগত। তাদের প্রতি অমনুষ্যোচিত ব্যবহারে, তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় হতে ও ভোটাধিকারে বঞ্চিত করার অভিসন্ধিতে, বাসগৃহ হতে বিতাড়নের উদ্দেশ্যে বর্ণ অনুযায়ী অঞ্চল বিভাগ আইন প্রণয়নে ও শ্বেতাঙ্গের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অন্ধ অহমিকায় এক দুঃসহ অবস্থার উদ্ভব ঘটে। এ-নিয়ে এক সময় ব্যাপার খুবই ঘোরালো হয়ে দাঁড়ায়; বিষয়টির সুমীমাংসার জন্যে বিশ্বসভায় পর্যন্ত বহুদিন ধরে নানা বিতর্ক চলেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মানবতা-বিরোধী একাজের নিন্দা করে প্রস্তাবও গৃহীত হয়; মানবিক অধিকার নাশের এ-ঘৃণ্য চক্রান্ত সভ্য সমাজের পক্ষে কলংককর অধ্যায় বলেও হয় কীর্তিত। এমনকি এ-ব্যবস্থা যে পরিণামে বিশ্বশান্তি-নাশক এমন আশংকাও প্রকাশ পায়। বস্তুত বেশ কিছু কাল এ-নিয়ে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধিক্কৃত হওয়া সত্ত্বেও দঃ আফ্রিকা নির্লজ্জ; নীতি তার বদল হয় নি। বরং অহংকারে বিশ্বের জনমত তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেয়,—বলে ঘরোয়া ব্যাপার, অন্যের মাথা ঘামানো কেন। শুধু তা-ই নয়। বিশ্বসভার অধিবেশনও কিছুকাল বর্জন করে। ভারতের পক্ষে উত্তেজনার হেতু যথেষ্ট; ক্ষুব্ধ সে, অথচ নিরুপায়। বিদেশ-বিভুঁই-এ নিজ বংশোদ্ভবদের স্বাধিকার রক্ষায় অক্ষম। তা-ই অ-বলের বল অসহযোগ; আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদ। কিন্তু সমস্যার মীমাংসা নয় এ, বরং উত্তেজনা বাড়াবার ও জীইয়ে রাখার সহায়ক। কাজেই বিশ্বসভার নির্দেশ—

রফার চেষ্টা করা হোক, আর একবার আপোষ-আলোচনার সুযোগ নেয়া হোক। ভারত শিরোধার্য করেছে এ অনুজ্ঞা ; রাখে রফার দুয়ার খোলা। যদি হৃদয়হীনেরও সুমতি হয়।

পৃথিবীময় এত সব ডামাডোল ও হট্টগোল। এরি ভেতর মানুষের শুভবুদ্ধির স্ফুরণ না ঘটেছে, এমন নয়। তা-ও ক্ষণিকের বিদ্যুৎ চমকের মতো। কিন্তু শক্তি-মাতালরা পৃথিবীবাসীকে হাঁফ ছাড়ার সময় দিতেও নারাজ। নিজের নাক কেটেও করে অন্যের যাত্রাভঙ্গ ; অন্যকে জব্দ করতে গিয়ে শক্তির দম্ভ প্রকাশে (Position of strength) কসুর করে না। তারি ভিত্তিতে রফা করবার কথাও চালাচালি করে। কিন্তু অন্য পক্ষের বল কম কিসে। কাজেই তারও সমতালে আস্ফালন। যেহেতু উভয়েই পরমাণু শক্তির অধিকারী—আণবিক মরণাস্ত্রে সজ্জিত। চালু হাতিয়ারের উন্নত সংস্করণ তৈরীতে তৎপর। অজস্র টাকাও ঢাল্‌ছে।* কিন্তু বিষে বিষক্ষয় হয় না,—similia similibus curantum নয়। অথচ নেপোয় মারে দৈ। উভয় দলের হাঁক-ডাকের মাঝে বৃটেনের সুবিধা সবচেয়ে বেশি। কারণ এটা ভাব স্থিতির সময়। আর যুদ্ধ যদি বাঁধে, তবে যায় শত্রু পরে পরে। ফিরে পাবে সে বিশ্বের, বিশেষ করে গণতন্ত্রী জগতের হারানো নেতৃত্ব। কিন্তু নির্জীব থাক্‌লে মার্কিনী পোষকতা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তা-ই কূটনীতির দাবা খেলায় সে আমেরিকার চালের ঘুটি। তা'র বাঁশীর পোঁ। কিন্তু '৫৩ সাল

---

* **পাদটীকা**—৯ই সেপ্টেম্বর ('৫৬) ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত এক সংবাদে প্রকাশ,—বিশ্বে যেসব রাষ্ট্র অস্ত্র নির্মাণ প্রতিযোগিতায় মত্ত, তা'রা বছরে মোট ৪৮,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় যতো টাকা খরচ হবে, (৪৮০০ কোটি টাকা) তার চেয়েও এ টাকার পরিমাণ দশগুণ বেশি। প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রধান হলো আমেরিকা ও রাশিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেট কর্তৃক নিযুক্ত সাব কমিটির রিপোর্টে উপরোক্ত তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে।

থেকে বৃটেনের বৈষয়িক অবস্থা প্রায় স্বাভাবিক, ঘর-গোছান অনেকটা শেষ। কাজেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার নিজের সুর ভাজার কাজ শুরু। তখন আমেরিকার পুরা সমর্থক আর নয়, বরং তা'র কাজের ভালোমন্দের সমালোচক। তা' ছাড়া, এহলো মার্কিন গাঁটছড়ামুক্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নীতি প্রতিষ্ঠার বা আত্ম-প্রতিষ্ঠার উত্তম তার। এহেন অবস্থায় তখনকার ইংরেজ প্রধান মন্ত্রী মিঃ উইনস্টন চার্চিল আমেরিকাকে বুঝাতে থাকেন যে রাশিয়ার সঙ্গে রফা করে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। কাজেই '৪৬ সালে যিনি স্নায়ু যুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই-এর জনক, '৫৩ সালে তিনি তার অবসানেও উদ্যোগী।

এ-সময় বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারতের ক্রমিক সম্ভ্রম ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের সম-সাময়িক কাল। তার নেতৃত্বে তখন এশিয়ার ছোট বড় রাষ্ট্রগুলো সঙ্ঘবদ্ধ ; এশিয়া গোষ্ঠির উদ্ভব সংশয়াতীত। তা'রি মাধ্যমে বিশ্ব ব্যাপারে স্পষ্টবাদীর ভূমিকায় তার অবতরণ। এ-পর্যায়ের চূড়ান্ত অধ্যায় '৫৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বান্দুং মহা-সম্মেলন—এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠি গঠন।

এপ্রসঙ্গে একটা বিষয় লক্ষ্য করার মতো। '৫২ সালে শ্রীনেহরু এশিয়ায় 'শান্তি এলাকা' গঠনের প্রথম আভাস দেন। কেউ কেউ তখন এর কার্যকারিতায় সংশয় প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু নেহরু-চৌ ঘোষণায় এর পথ হয় সুগম, ঠাণ্ডা হয় খানিকটা পৃথিবীর উত্তপ্ত মেজাজ। জাপান ও ফরমোজায় যুদ্ধঘাটি বজায় রেখে, পাকিস্থানের মারফৎ কাশ্মীরে, দঃ পূঃ এশিয়ায় যুদ্ধজোটের আড়ালে ও 'সিয়াটোর' গবাক্ষপথে সারা এশিয়ায় যুদ্ধবিস্তারে মার্কিনী অভিসন্ধি ও আয়োজনের বিরুদ্ধে এ এক উদ্যত চ্যালেঞ্জ। তা'ছাড়া শক্তিজোটের প্রতিযোগিতা ও সংঘাতের ভেতর দিয়ে তার নতুন পথ রচনা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রবল প্রলোভন সত্বেও ভারত যুদ্ধজালে জড়িয়ে পড়েনি। লোভে পড়েও লাভের

আশায় যেকোন দলভুক্ত হওয়া তার পক্ষে বিচিত্র ছিল না। কিন্তু প্রথম দিকে তার চেষ্টায় এশিয়ায় যুদ্ধ এলাকার বিস্তার রোধ হয়। পরে এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশকে এক ভাবনা ও লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ করে পৃথিবীর বৃহত্তর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে। অর্থাৎ ধাপে ধাপে তার অগ্রগতি একটি সু-বিন্যস্ত পরিকল্পনার অঙ্গ। রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতীয় প্রতিনিধির উদ্যোগে যে এশিয়া-আফ্রিকা গোষ্ঠি (গ্রুপ') গঠিত হয়, তাও এ প্রয়াসেরই যুক্তিসম্মত পরিণতি।

আবার প্রাচ্যেই শুধু নয়; ভারতের চেষ্টায় পাশ্চাত্যেও শান্তি এলাকার বিস্তার ঘটেছে। '৫৪ সালে ৮ সপ্তাহব্যাপী অচলাবস্থা অবসানের পর যে জেনেভা সম্মেলন (*) সফল হয় এবং যা'র ফলে হয় ইন্দোচীনের যুদ্ধ বন্ধ ও এশিয়ায় যুদ্ধ এলাকার প্রসার রোধ, তার মূলে ভারতের প্রেরণা সবচেয়ে বেশি। যেহেতু কলম্বো শক্তি সম্মেলনের বৈঠকেই (†) ভারত কর্তৃক উত্থাপিত ছ' দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ইন্দোচীন সমস্যা সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়। আবার '৫৫ সালের জুলাই-এ জেনেভায় চার রাষ্ট্রনায়কের বৈঠক অনুষ্ঠানও শ্রীনেহরুর রাশিয়া পরিদর্শনের ফল। এ-বৈঠক অবশ্য সফল হয়নি। না হলেও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পূর্ব য়ুরোপের 'লৌহ যবনিকা'র (Iron curtain countries) অন্তরালবর্তী বিভিন্ন কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র পরিদর্শনে পৃথিবীর ভাপ্‌সা আবহাওয়া দূর হয়। শুরু হয় যুদ্ধের আবহাওয়াজাত জমাট বরফ গলার কাজ। লাগে ঠাণ্ডার আমেজ। এ-প্রক্রিয়ার পরিণতি হলো রুশ প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও কম্যুনিষ্টদলের কর্মসচিব মঁশিয়ে খ্রুশ্চেভের '৫৫ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে ভারত, ব্রহ্ম ও আফগানিস্থান পরিদর্শন।

---

* পাদটীকাঃ—'৫৪ সালের মে'র শেষ সপ্তাহে শুরু হয়ে ১৮।৭।৫৪ তারিখে জেনেভা সম্মেলন শেষ হয়।

† '৫৪ সালের ২৮শে এপ্রিল থেকে ১লা মে পর্যন্ত দঃ পূঃ এশিয়া প্রধান মন্ত্রী বা কলম্বো শক্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়।

শুধু ইঙ্গ-মার্কিন ও কম্যুনিষ্ট জোটের মধ্যেই নয়, কম্যুনিষ্ট দলেও যে বিরোধ জন্মেছিল, তার বিষ নাশেও ভারতীয় প্রভাব পরোক্ষে ক্রিয়া করেছে। এখানে যুগোশ্লাভিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে মনান্তরের কথা বলা হচ্ছে। মঁ স্ট্যালিনের সংগে মার্শাল টিটোর বিচ্ছেদ ঘটায় যুগোশ্লাভিয়া ইঙ্গ-মার্কিন গোষ্ঠির আশ্রয় নেয়। রাশিয়ার ভয়ে তাদের যাবতীয় সাহায্য গ্রহণ করে। কিন্তু এ-বিচ্ছেদ ক্ষণস্থায়ী, মাত্র বছর সাতেকের। মঁ স্ট্যালিনের মৃত্যুর ('৫৩, ৫ই মার্চ) অল্পকাল পর * উভয় পক্ষের ভ্রান্তি নাশ হয়, রাশিয়ার সহাবস্থিতির সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয় যুগোশ্লোভিয়া। কাজেই রুশগোষ্ঠিতে ভাঙ্গন ধরাবার সাময়িক উল্লাসের যেজোয়ার গণতন্ত্রী জোটে দেখা দিয়েছিল, উভয়ের মিলনে তা'তে ভাটা পড়ে। এটা কম্যুনিষ্ট কূটনীতিব জয়। কিন্তু ভারতীয় নীতি ও আদর্শেরও পরোক্ষ জয় এ। কারণ সহাবস্থান ভিত্তিক পঞ্চশীলের সমর্থক রাশিয়াই † এবার যুগোশ্লাভিয়ার সন্দেহ

---

* পাদটীকা:—'৫৫ সালের ২রা জুন রাশিয়া ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে পুনর্মিলন ঘটে।

† সোবিয়েৎ রাশিয়াই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রথম সহাবস্থান তত্ত্বের প্রচাবক। ১৯২০ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী 'নিউ ইয়র্ক ইভিনিং জার্নালে'ব প্রতিনিধির প্রশ্নোত্তরে মহামতি লেলিন বলেছিলেন, "এশিয়ায় আমাদের অভিপ্রায় কি? ঠিক য়ুরোপ যা' তা-ই। সকল জাতির সাধারণ লোক, আর শ্রমিক ও কিষাণদের সঙ্গে শান্তিতে পাশাপাশি বসবাস করা।" ১৯২৭ সালে রাশিয়া পরিদর্শনকারী প্রথম মার্কিন শ্রমিক প্রতিনিধি দলকে মঁ স্ট্যালিন বলেছিলেন—"পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী এ দুটি বিরোধী সমাজ-ব্যবস্থার অস্তিত্ব সত্বেও পারস্পরিক চুক্তি সম্ভব। * * আমরা শান্তিকামী। বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরে প্রস্তুত।" '৪৮ সালেব ১৭ই মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিঃ ওয়ালেসের এক চিঠির জবাবে তিনি বলেন, "সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বিশ্বাস করে, বৈষয়িক বিন্যাস ও আদর্শগত পার্থক্য সত্বেও এ দু'ব্যবস্থার সহাবস্থান আর আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে তা'র নির্বিবাদে সমাধান সম্ভব তো বটেই, বিশ্ব শান্তির পক্ষেও তা' একান্ত দরকার।"

ভঞ্জনে উদ্যোগী। তবু যুগোশ্লাভিয়াও রাশিয়ার সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরা নিঃসন্দেহ হতে ভারতের সাহায্য লাভ করে। '৫৫ সালের জানুয়ারীতে মার্শাল টিটোর ভারত ভ্রমণ এ-প্রসঙ্গে ধর্তব্য। তবে বলা বাহুল্য, উভয় দেশের ঘরোয়া অবস্থাই পুনর্মিলনের পথ প্রশস্ত করেছিল।

জানা কথা, '৫৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চ প্রধান—আমেরিকা, বৃটেন, সোবিয়েৎ রাশিয়া ও ফ্রান্সই করেছে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু পর বছর ঘটে এ-অবস্থার মৌলিক রূপান্তর। বিশ্ব রাজনীতিতে হয় ইঙ্গ-মার্কিন প্রভাবের ভারসাম্য নাশ। এর আসল হেতু: বিশ্ব রঙ্গালয়ে নির্ভীক ও অন্য-নিরপেক্ষ শক্তিরূপে ভারতের আবির্ভাব। যার ফলে নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার লক্ষণ হয় প্রত্যক্ষ, সূচনা হয় স্থিতি স্থাপকতার। তা' যুদ্ধের পক্ষে নয়, শান্তির অনুকূলে। তা-ই নয়া দিল্লী ও লণ্ডন, প্যারিস ও পিকিং, মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে পারা ওঠানামা করে, ক্রমপর্যায়ে দুলতে থাকে দোলকযন্ত্র।

এর আর একটা বড়ো কারণ: আণবিক যুগের অভ্যুদয়। সব রাষ্ট্রেই এ-বোধের উন্মেষ ঘটেছে যে এ-যুগে সামরিক বলের আস্ফালন আত্মহত্যার নামান্তর। '৫৫ সালের ৮ই আগস্ট জেনেভায় ভারতীয় বিজ্ঞানী ডাঃ ভাবার নেতৃত্বে বিশ্বের ৭৩টি দেশের শ্রেষ্ঠ আণবিক বিজ্ঞানী সম্মেলনে দীর্ঘস্থায়ী আলোচনার পর স্থির হয় যে, আণবিক যুদ্ধে বিশ্ববাসীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনাই বেশি। আচার্য আইনস্টাইনের শেষ ইচ্ছাপত্রেও ('৫৫ সালের ৯ই জুলাই) আণবিক অস্ত্রে মানব সমাজের বিলুপ্তির আশংকায় নিদারুণ অস্বস্তি ও বেদনা প্রকাশ করা হয়। এর-ই পথানুসারী জেনেভার চার প্রধানের বৈঠক। তবে মতানৈক্য সত্ত্বেও এ-বৈঠক যে বানচাল হয়ে যায়নি, তা'র প্রধান হেতু: আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার প্রলয়ঙ্কর ক্ষমতায় সমগ্র সৃষ্টিনাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে নবলব্ধ চেতনা।

উভয় শক্তি-গোষ্ঠির মধ্যে পারস্পরিক ভুল বুঝাবুঝি দূর করা

এবং অন্যের কাছে একের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপের সদ্ব্যাখ্যা করা, আবার এ-সঙ্গে নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে উভয়ের অপ-ধারণার অবসান ঘটানো—এতগুলো কাজ যুগপৎ ভারতকে কিছুকাল আগেও করতে হয়েছে। এবং তা-ও সুষ্ঠুভাবেই করেছে সে। এ-সবই শ্রীনেহরুর অবিশ্রান্ত বিশ্ব-ভ্রমণ, আর রাষ্ট্রপুঞ্জ ও ওয়াশিংটন-মস্কো লণ্ডন-পিকিং-এ ভারতীয় কূটনীতিবিদ্‌দের, কর্মদক্ষতার ফল। শেষোক্তদের মধ্যে পরলোকগত স্যার বি, এন, রাও, সর্দার কে, এম পানিকর, শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, শ্রীকে, পি, এস্‌, মেনন, শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন ও শ্রীভি, কে, কৃষ্ণ মেননের খ্যাতি সমধিক।

বিশ্ব-শান্তি রক্ষায় ভারতেব স্বার্থ বিশেষভাবে জড়িত। কিন্তু বড়ো বড়ো রাষ্ট্রগুলোরও তাগিদ এ-বিষয়ে এমন কিছু কম নয়। ভারত জানে, যুদ্ধ-বিগ্রহেব ফলে তার যাবতীয় পরিকল্পনা ও শিল্পায়ন একেবারে বানচাল না হলেও হবে বিঘ্নিত। যেহেতু শিল্পসমৃদ্ধির যে-সব উপকরণ ও মাল-মসলা উভয় জোটের কাছ থেকে পাবার কথা, তা'র সববরাহ হবে বন্ধ; আবার সঙ্ঘর্ষজাত কুফলভাগীও হতে হবে তাকে। ভারত যদি নিতান্ত যুদ্ধে জড়িয়ে নাও পড়ে তবু আণবিক ও হাইড্রোজেন- বোমার তেজস্ক্রিয় ভস্মরাশির সর্বগামিতা থেকে রেহাই নেই। তার ফলে তা'র খাদ্যদ্রব্য, দুধ, ফসল, শাক-সব্জী দূষিত ত' হবেই; আবার ব্যাপকভাবে ভারতবাসীর ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকবে। কাজেই আণবিক যুগের অন্তর্নিহিত জটিলতা ও পরিণাম সম্পর্কে যে-কয়টি রাষ্ট্র সচেতন, ভারত তাদেব মধ্যে অন্যতম প্রধান। এ-হেন অবস্থায় সর্বগ্রাসী ও সভ্যতানাশী মারণ-যন্ত্র থেকে দূরে থাকার প্রবৃত্তি তা'র পক্ষে থাকা খুবই স্বাভাবিক। এদিকে দৃষ্টি রেখেই ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির গতিপথ নিয়ন্ত্রিত।

অবশ্য পৃথিবীর বড়ো বড়ো রাষ্ট্রও নিজ নিজ ঘরোয়া দুর্বলতা ও ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ। কিন্তু রাজনীতিতে নগদ

পাওনাগণ্ডা বলে একটা কথা আছে। ভবিষ্যতের ভালোমন্দ এ-ক্ষেত্রে বড়ো নয়। তা-ই Practical Politician বা বাস্তবনিষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ অবস্থা অনুযায়ী নিজ নিজ দেশকে যুদ্ধ বা শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। কিন্তু যাঁরা রাজনীতির কলকাঠি নাড়েন, সেই মুনাকাবাজ বণিককুল ও শিল্পপতিরা বর্তমান যুগে যুদ্ধের আসল উস্কানিদাতা। কারণ যুদ্ধের সোজা পথে পণ্য বিক্রয় ও মুনাফা শিকার যত সহজ, অন্য কোন কিছুতে তত নয়। কিন্তু পৃথিবীর সাধারণ লোক শান্তিকামী ও যুদ্ধবিরোধী। কারণ, যুদ্ধের প্রথম বলিই তারা। অসংখ্যবার এ-স্বাদও তারা পেয়েছে।

পূর্বে বলা হয়েছে, রাষ্ট্র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোবিয়েৎ রাশিয়া সব চেয়ে শক্তিধর। তারা দু'টি বিরোধী শিবিরের মুখপাত্র। কিন্তু পরস্পর-ঈর্ষাকাতর ও সন্দেহপরায়ণ। এ-সত্ত্বেও নিজেদের অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কারো কম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বারুদখানা হতে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আমেরিকার যেটুকু মাত্রাতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস জন্মেছিল, কোরিয়ার নরবলি ও ইন্দোচীন যুদ্ধে ফরাসী সরকারকে প্রদত্ত অজস্র খয়রাতী সমরোপকরণ নাশে তা' চিড় খেয়েছে। কোরিয়া যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতিতে খাস মার্কিন মুল্লুকেই হাহাকার রব উঠেছিল, প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। আবার আমেরিকার যেসব মিত্র রাষ্ট্র আছে, তাদের মধ্যে প্রধানতম বৃটেন ও ফ্রান্সও তা'র গলগ্রহ ও সাহায্য-প্রত্যাশী। অন্যেরা তো নির্বির্য। কেউ কেউ পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনে ব্রতী। যে-পশ্চিম জার্মানীকে কেন্দ্র করে য়ুরোপে নতুন ঝড়ের কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ, তা'রও যুদ্ধ-বিগ্রহে নেহাৎ অরুচি। যেহেতু তা'র সমস্যা নতুন করে বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলা ও খণ্ডিত জার্মানীর পুনর্মিলন ঘটানো। কাজেই যুদ্ধজোট গঠন করে ও প্রতিরক্ষা ঘাটি দিয়ে রাশিয়াকে ঘিরে ফেলা হ'লেও অযথা যুদ্ধের খাতিরেই যুদ্ধ করা—তার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সব চেয়ে বড়ো কথা: আণবিক যুদ্ধের দণ্ডভীতি। এখন

আমেরিকা এর একমাত্র অধিকারী নয়।* রাশিয়াও তা'র সমকক্ষ এবং কা'রো কা'রো মতে তার চেয়েও বেশী শক্তিধর।

এক্ষেত্রে রাশিয়ার অবস্থার তুলনামূলক বিচার প্রয়োজন। রাশিয়া যুদ্ধ-বিধ্বস্ত। তার বিস্তৃত এলাকায় জার্মান ঈগলের থাবার ছাপ এখনো স্পষ্ট। ক্ষেত-খামার, বাড়ী-ঘর, শিল্প-কারখানা, সেতু, পথ-ঘাট কিছুই বাদ নেই। কাজেই তা'র সর্বাগ্রে প্রয়োজন পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন। আবার গোদের ওপরে বিষফোঁড়াও কম নয়। '২৯ সালে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় থেকে আজ পর্যন্ত রুশ জনসাধারণ সমানে জাতি ও দলের নামে কৃচ্ছ্র সাধনায় ব্রতী। তা-ই স্ট্যালিনোত্তর রাশিয়ার Consumer's economy বা ভোগ্য পণ্য উৎপাদনের দিকে বেশি ঝোঁক। যেহেতু ত্যাগ ও দুঃখবরণে অভ্যস্ত সাধারণও ভাল খাওয়া-পরা ও শান্তির প্রত্যাশী। রাশিয়ায় মালেনকভ-গবর্ণমেণ্টের চেষ্টাও সে-দিকেই নিবদ্ধ ছিলো বেশি। কিন্তু হলে কী হয়। নানা বিঘ্ন-বিপত্তিতে তাঁদের কৃষিনীতি পুরা কাজে পরিণত করা যায়নি; তা-ই তাঁ'রা পদত্যাগ করেন। তা-ও বছর দুই আগের ঘটনা।

যুদ্ধকালীন বৈষয়িক সংগঠন থেকে শান্তিকালীন অর্থনৈতিক বিন্যাসে রাশিয়ার ক্রমিক রূপান্তর এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এর একটি লক্ষণ হলো: বিশ্বের বাজারে রাশিয়ার কাঁচা মাল কেনা ও বদলে নিজ পণ্য বিকির অথবা পারস্পরিক মাল বিনিময়ের আগ্রহ। এতকাল ঘরোয়া চাহিদা পূরণ করা তা'র শিল্প সংগঠনের পক্ষে

* পাদটীকা:—যুদ্ধের সময় আণবিক গবেষণা প্রধানত আমেরিকায় পরিচালিত হতো। গোপনতা রক্ষার নামে এর ফলাফল বৃটেনকে প্রথম দিকে সবটা জানান হয়নি। তাই আমেরিকার চেয়ে বৃটেন আণবিক গবেষণায় বহু পেছনে ছিলো। কিন্তু এদানীং ইংরেজ বিজ্ঞানীদের সাধনাও জয়যুক্ত হয়েছে; হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে তাঁরাও সফল হয়েছেন।

সাধ্যাতিরিক্ত ছিল। কিন্তু যুদ্ধের এরূপ বিপুল অপচয় ও ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতার আগ্রহ রুশ মার্ক্সীয় অর্থনীতির নমনীয়তার পরিচায়ক। অধুনা রাশিয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে ঘরোয়া চাহিদার অতিরিক্ত পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে। উৎপাদনের এ-স্তর বজায় রাখতে ও ব্যবহারিক পণ্যের প্রসার ঘটাতে হলে যতো বেশি কাল শান্তি বজায় থাকে তা-ই তার পক্ষে লাভজনক। তা'র লক্ষ্যসিদ্ধির পরিপূরক। যেহেতু অনুন্নত ও অনগ্রসর দেশকে শিল্পোন্নত করার যাবতীয় উপকরণ দিয়ে সহায়তা করাই তার আসল কাজ। এতে করে সাহায্যপ্রাপ্ত দেশের শিল্প-বিপ্লব ঘটার সুযোগ বাড়বে ; আবার তা'র পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গি বদল করাও হবে সহজ। আর হবে বিভিন্ন অনুন্নত দেশে সাম্যবাদী বিপ্লব বা অভ্যুত্থান ঘটাবার পথ সুগম। কারণ প্রমাণিত হয়েছে যে, দূর-দূরান্তের নানা দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে অর্থ-সাহায্য বা পরামর্শ দিয়ে সাম্যবাদ গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। বরং তার চেয়ে সহজতর,—তার শিল্প-বিপ্লবে পোষকতা করা, তা'র বিশিষ্ট স্বভাব ও প্রতিভা অনুযায়ী তা'কে গড়ে তোলার অধিকার দেওয়া। তা'তে বিপ্লবের বনিয়াদ দৃঢ় হবে, নিজেদের ঝুঁকি কম্‌বে আর পাশ্চাত্ত্য দেশের সন্দেহও হবে নিরসন। তা' ছাড়া, একদ' রাষ্ট্রের সঙ্গে—হলোই বা তারা দুর্বল—মিত্রতা স্থাপিত হবে। বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের বিরোধিতার পট-ভূমিকায় তা'র পক্ষে কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন অত্যাবশ্যক। এদিক থেকে বিচার করেই চীনের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে তার প্রীতির সূত্রপাত। আবার অন্তর্বিরোধ ও শত্রুর প্রতিকূলতা থেকে আত্মরক্ষা করে রাশিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ; গড়ে উঠেছে দলিতের শেষ আশ্রয় ও দুনিয়ার প্রথম শ্রমিক রাষ্ট্ররূপ। কাজেই সংশয় ও অবিশ্বাস বজায় থাকলে, আর রণসম্ভার তৈয়ার বন্ধ না হ'লে তা'র মূল ভিৎ কাঁচা থেকে যেতে বাধ্য। এহেন অবস্থায় 'নিজে বাঁচো ও

অন্তকে বাঁচতে দাও' নীতির সার্থক প্রয়োগ, অথবা 'সহাবস্থান' রীতির হাতে-কলমে যাচাই করা দরকার। অন্যথা আণবিক যুগে নেহরু-কথিত 'সহাবস্থান বা সহ-নাশ' অনিবার্য।

উভয় রাষ্ট্রযুথের মধ্যে এ-চেতনাই ঠাণ্ডা লড়াই অবসানের প্রারম্ভিক পর্যায়। কিন্তু সন্দেহ ও অবিশ্বাস সহজে যায়না। বিশেষত যেখানে এর মূল গভীরে। কাজেই পারস্পরিক অভিসন্ধি ও দোষারোপ। গণতন্ত্রী দলের বক্তব্য : রাশিয়া ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা বাইরের জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। বিশ্বের আলোহাওয়ার প্রবেশ সেখানে নেই ; বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ ; কোন স্বাধীন মতবাদ প্রচার দণ্ডনীয় ; ধর্মীয় মতবাদ অচল। ব্যক্তিসত্তা নিশ্চিহ্ন, রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে সবাই বলি। একনায়কেব অনাচাব ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপব্যবহারে সবাই অতিষ্ঠ। চলাবলা করার কা'রো কোন স্বাতন্ত্র্য নেই। সমাজ, রাষ্ট্র ও জীবন সম্পর্কে ধারণা ছকবাঁধা, ছাঁচে ঢালা ; ওপরের জনকয়েকের মাত্র স্বাধীনতা,—তাও অনাচার ও অনাসৃষ্টির। অন্য সবাই গড্ডালিকা প্রবাহ। কাজেই regimentation, রাষ্ট্রিক উদ্যোগে সবার নিয়ন্ত্রণ, কণ্ঠরোধ। আবার দুর্বলের রক্ষা নেই তা'র কাছে। সবলকেও ছেড়ে কথা কয়না সে। হয় সাম্যবাদ প্রচার করা, নয় ভিন্ন দেশের কম্যুনিষ্ট দলকে সাহায্য দিয়ে subversion বা ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত বা তা'তে উস্কানি দেয়া তার কাজ। গোপনে নাশকতা ছাড়াও তা'র দূব-বিস্তৃত এলাকায় চলেছে অসংখ্য অস্ত্রশালা নির্মাণ ও নতুন নতুন অস্ত্রের উদ্ভাবন, আর সাইবেরিয়ার জনশূন্য অঞ্চলে চলেছে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার মারণক্ষমতার পরীক্ষা। এ-প্রক্রিয়া শান্তির পোষক নয় আদৌ ; শান্তিরক্ষাও তার কাম্য নয়। কাজেই তা'র গালভরা বুলিতে বিশ্বাস নেই ; সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও পুঁজিবাদ তা'র কথার কথা। এহেন অবস্থায় নিজ সদুদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যকে নিঃসংশয় করতে হবে, নিজেকে আগে নিষ্কলুষ হতে হবে।

এজন্য তা'র যবনিকা উত্তোলন দরকার। দরকার বিশ্ববাসীকে তা'র প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে পরিচয়ের অবাধ সুযোগ দান। Iron curtain বা লৌহ যবনিকা উত্তোলনেই হবে জগতের সঙ্গে তার নতুন পরিচয়, নতুন মিলন শুরু। তবেই হ'বে বিশ্ব-দরবারে তা'র কথা গ্রাহ্য।

কিন্তু রাশিয়া সন্দিগ্ধ। তাবৎ গণতন্ত্রী জগৎ তার সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৈষয়িক বিন্যাসের ঘোর বিরোধী। বিপ্লবোত্তর কাল থেকে আজ পর্যন্তও এ স্বভাবের কোন নড়চড় হয়নি তা'র। বাইরের intervention ও ঘরের বিভীষণ; দুই-ই সমান তৎপর। প্রতি-বিপ্লবীরা সক্রিয় নাশকতায় রত। যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যা দু'কোটি। ক্ষতির পরিমাণও তার সবচেয়ে বেশি। তার পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন যেমন দরকার, তেম্‌নি দরকার ঘরের চাহিদা পূরণ, ভোগদ্রব্য উৎপাদন। আবার নিজ অভাব মিটিয়ে অভাবী ও অনুন্নত দেশগুলোকেও সাহায্য দেয়ার প্রয়োজন কম নয়। কারণ মিত্রহীন পৃথিবীতে মিত্রলাভের দরকার তারই সবচেয়ে বেশি—হোক না সেসব মিত্র আপাত-বলহীন ও কৃষিপ্রধান। কিন্তু তাদের শক্তি সঞ্চার করতে পারলে তারাই একদা তার বলভরসা হতে পারে। আবার ভিন্ন দেশে সাম্যবাদ রপ্তানীযোগ্য পণ্য নয়। নিজের তাগিদেই তা গড়ে ওঠে। আর শিল্প-প্রধান দেশেই এর প্রচার ও প্রসার বেশি। সবচেয়ে বড়ো কথা, অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের যে-অভিযোগ পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ অহরহ করে থাকে তার বিরুদ্ধে, তা' থেকেও মুক্তি পাবে সে। তা-ই আন্তর্জাতিক সাম্যবাদ প্রচারযন্ত্র 'কোমিনফর্ম' ভেঙ্গে দেয়া; তা-ই অনগ্রসর ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে শিল্পের উপকরণ ও সর্তহীন (without strings) বৈষয়িক ও কারিগরী সাহায্য দান। মার্কিনী সর্তসাপেক্ষ সাহায্য ব্যবস্থার সঙ্গে এর প্রভেদ মৌলিক। কিন্তু এতেই হবে তা'র অন্তরঙ্গ বান্ধব লাভ। তবেই একদিকে নয়া সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ হবে দুর্বল, আর অন্যদিকে হবে উপনিবেশবাদের বনিয়াদ

শিথিল। এদিকে লক্ষ্য রেখেই তা'র পূর্বের যত কিছু কঠোরতা কমাবার ব্যবস্থা, সামাজিক ও প্রশাসনিক সংগঠনের সামঞ্জস্য সাধন, ভোগ্যপণ্য উৎপাদনে শিল্পের, আর মানবকল্যাণে আণবিক শক্তির প্রয়োগ।

মঁ স্ট্যালিনের জীবদ্দশায় কিন্তু এত সব ঘটা সম্ভব হয়নি। যেহেতু তিনি ছিলেন একটা কালের প্রতিভূ—তার স্থিতি ও ক্রম-বিকাশ ধারার নিয়ামক। দেশ ও দশের স্বার্থে তিনি স্বদেশবাসীকে দুশ্চর কৃচ্ছ্রসাধনায় দীক্ষিত করেছিলেন। দীর্ঘকাল দুর্ভোগের পরও এ-ব্রতনিষ্ঠা রুশদের যায়নি সত্য। কিন্তু চার সীমানার ভেতর একটানা বহু দিন বদ্ধ থেকে একটু হাওয়া বদলের পক্ষপাতী তারা না হয়ে পড়ে, এমন নয়। তা'ছাড়া, দেশের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন শেষ না হলেও (শেষ হ'তে কতকাল লাগবে বলা কঠিন) রাশিয়া বর্তমানে বাইরের আঘাতকে ঠেকাবার মতো অপরিমেয় ঐহিক ও অপরাজেয় প্রাণশক্তির অধিকারী। তা-ই স্ট্যালিনের উত্তরাধিকারীরা যখন বছর তিন আগে শাসনভার পেলেন, তখন থেকেই তাঁদের চেষ্টা হলো নতুন অবস্থার সঙ্গে নিজেদের যথাসম্ভব খাপ খাইয়ে নেয়া। এজন্য প্রয়োজন খোলা মন, নয়া দৃষ্টিকোণ। তা-ই যেসব কার্যকলাপে জগদ্বাসীর সংশয়, তা' দূর করতে তাঁরা প্রথমে উদ্যোগী হন। স্ট্যালিন আমলের ঐতিহ্য বরবাদ ও অস্বীকার করার প্রবণতার উন্মেষও এ-মনোভাব থেকে। ব্যক্তিপূজার রীতি বর্জন ও নিন্দা, এবং তা'র বদলে সমষ্টি ও দলীয় নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা, ইতিহাস ও পুঁথিপুস্তকে স্বেচ্ছাকৃত ভুল সংশোধন, রাজনৈতিক খুনজখমের নিন্দা ও প্রয়োজন হলে খুনের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে (স্ট্যালিনের বিশ্বস্ত সহচর ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মঁ বেরিয়া) ধরাধাম হতে অপসারণ—এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আবার বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় নেতাদের সম্পর্কে কটুকাটব্য ও অপ-ভাষণ পরিহার (ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকার বিষয় এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য), অভিধান ও

বিশ্বকোষে এ সবার সংশোধন ও প্রয়োজন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বই বাজার থেকে প্রত্যাহার—এ-পদ্ধতির যুক্তিসম্মত পরিণতি। কাজেই পৃথিবীর ভিন্ন মতাবলম্বী বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সদ্ভাব সৃষ্টির দিক থেকে এ এক মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক প্রস্তুতি। এ উদ্যম নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সাধারণ লোকের পক্ষে শুভ। আরো শুভ হলো, জগদ্বাসীর দৃষ্টির সাম্‌নে তার সমগ্র জীবনযাত্রা পদ্ধতি মেলে ধরার আগ্রহ; তার সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও শিল্প সংগঠনের সঙ্গে সকলের পরিচয় লাভের সুযোগ করে দেবার স্পৃহা। আবার যে-গোপনতা সংশয়ের জনক, যা'র ফলে রাশিয়ার সামরিক আয়োজন সম্পর্কে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রযূথ অহেতুক সন্দেহাতুর, তারই রহস্যভেদের সুযোগ করে দিতে সোবিয়েৎ নেতারা উন্মুখ। কিন্তু এ-তথ্য ও সত্য, এমন একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননায়কের মাধ্যমে জানানো দরকার, যাঁর কথা সকলের গ্রাহ্য ও বিশ্বাস্য, যিনি উভয় শিবিরের কাছেই সমান প্রিয়। শ্রীনেহরু সেইরূপ একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ। কাজেই 'লৌহ-যবনিকা' উন্মোচনের দায়িত্বভার তাঁরই ওপর পড়ে। '৫৫ সালের জুন-এ তাঁর রাশিয়া ও পোল্যাণ্ড পরিদর্শন তা-ই আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পরবর্তীকালে বিশ্বের মেজাজের যে-মৌলিক রূপান্তর ঘটে, এ তা'রই উদ্যোগপর্ব।

আগেই বলা হয়েছে, ভারতের ভূমিকা অন্য-নিরপেক্ষ ও নির্ভীক। রাশিয়া তার অন্যতম মুখ্য হিতকামী রাষ্ট্র। কিন্তু এসত্ত্বেও তার কার্যকলাপ সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তা-ই '৫৫ সালের ডিসেম্বরে ভারতীয় প্রতিনিধি রাষ্ট্রপুঞ্জে রাশিয়া কর্তৃক হাইড্রোজেন বোমা বিদারণের নিন্দা করেন। কারণ, ভারতের মতে এর পরিণামফল মানবজাতির পক্ষে অকল্যাণকর, মারাত্মক। তা ছাড়া, ভারত নীতিগতভাবেও আণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধ করার পক্ষপাতী। অথচ ঠিক এ সময়েই রুশ প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ও কম্যুনিষ্ট দল-নায়ক ম'খ্রুশ্চেভ ভারত-ভ্রমণে রত ছিলেন। কিন্তু ভারতের সদুদ্দেশ্য

সম্পর্কে রাশিয়া নিঃসন্দেহ। কাজেই বাধ্যবাধকতাহীন রুশ-ভারত সাহায্য চুক্তিতে কোনরূপ অসুবিধা হয়নি।*

বলা বাহুল্য, এ-ব্যবস্থা পরমুখাপেক্ষিতা নয়। পরমুখাপেক্ষিতা যে-কোন দেশের পররাষ্ট্র নীতির সমূহ বিপদ। এতে করে সাহায্য-গ্রহীতার সাহায্যদাতার দলে ভিড়ে যাবার ও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা বর্তমান। তা-ই ভারত প্রথমাবধি সর্ত-নিরপেক্ষ সাহায্য চেয়েছে ও পেয়েছে। মার্কিন 'চার দফা ও পারস্পরিক সাহায্য কর্মসূচী' (Point Four & Mutual Aid Programme) অনুযায়ী সাহায্য লাভ, রাষ্ট্রপুঞ্জের মারফৎ বিভিন্ন দেশের (অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি) অকৃপণ দান এর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণকালে ('৫১ সালের জানুয়ারী থেকে '৫৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) তা'র বৈদেশিক সাহায্যলাভের মোট পরিমাণ ৩০৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। '৫৬ সালের আগস্ট-এ সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী আমেরিকার কাছ থেকে ১৭২ কোটি টাকা দামের শস্য ইত্যাদি লাভের ব্যবস্থা (মোট সাহায্য ২০৭ ক্রোটি টাকা) ভারত করেছে। এছাড়া, অযাচিত কারিগরী ও খয়রাতি খাদ্যশস্য সাহায্য লাভের পরিমাণ লেখাজোখা নেই। আবার গুরুভার ও মূল শিল্প প্রতিষ্ঠায় জার্মানী, বৃটেন, রাশিয়া ও আমেরিকার কাছে সমভাবে সাহায্য প্রত্যাশী। কাজেই সবার সাহায্যলাভ ও কা'রো ওপর চিরন্তন নির্ভরশীলতা নয়—শিল্পায়নের ক্ষেত্রেও ভারত এ-নীতির অনুসারী।†

---

* পাদটীকা:—এ চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া তিন বছরে ১০ লক্ষ টন ইস্পাত ভারতকে সরবরাহ করবে, আর ভারত ও রাশিযার মধ্যে সমমূল্যের পণ্য-বিনিময় হবে।

† উড়িষ্যার রাউরকেলার ইস্পাত কারখানা নির্মাণে জার্মানী, দুর্গাপুরে বৃটেন, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই-এ রাশিয়া ('৫৬-তে মোট সাহায্য ১৮০ কোটি টাকা) এবং জামসেদপুর টাটা কারখানার প্রসারে আমেরিকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারত চুক্তিবদ্ধ।

জেনেভায় চার রাষ্ট্রনায়কের বৈঠকের পর থেকে ভারতের একৈক লক্ষ্য : যেকোন উপায়ে শান্তি বজায় রাখা ও সহাবস্থান নীতিতে প্রাণ সঞ্চার করা। এর সামান্য ব্যতিক্রমও '৫৬ সালের অক্টোবর মাস অবধি কোথাও হয়নি। বরং নেহরুর 'নিষিদ্ধ দেশ'-দর্শনের ক্রম-পরিণতির ফলস্বরূপ একদিকে চলে শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রনায়কদের মিতালী, অন্যদিকে চলে ভারতের দিকে শান্তি-পথিকদের অবিশ্রাম ধারাস্রোত। দৃষ্টান্ত '৫৫ সালের নবেম্বর-ডিসেম্বরে রুশ প্রধান মন্ত্রী মঁ বুলগানিন ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সচিব মঁ খ্রুশ্চেভ এবং ডিসেম্বরে সৌদী আরবের রাজা সৌদের ভারত ভ্রমণ। এর পরও এসেছেন নেপালের রাজা, পঃ জার্মানীর ভাইস-চ্যান্সেলার ও আবিসিনিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসী।

কিন্তু এত ভালোও ভালো নয়। কম্যুনিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠতা বাড়লেও আমেরিকা একে সুনজরে দেখেনি। বরং ভারতের শক্তি-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে তার মনে সংশয় জাগে। সন্দেহ হয়, হয়তো কম্যুনিষ্ট জোটে ভিড়ে যাবার এ একটা ফন্দি। তাই ভারতকে দেয় মার্কিন সাহায্য কমিয়ে দেবার জন্যে আন্দোলন দানা বাঁধে আমেরিকায়। কিন্তু এ-ব্যবস্থা ভারতের স্বার্থের পোষক নয়, তার নীতি ও আদর্শেরও বিরোধী। এহেন অবস্থায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেঃ আইসেনহাওয়ারের আমন্ত্রণে জুন মাসে ('৫৬) শ্রীনেহরুর আমেরিকা যাত্রা। তবে রথ দেখা ও কলা বেচা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ লণ্ডনে এই উপলক্ষে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনেও যোগ দেওয়া। কিন্তু রথ দেখা বা প্রথম কাজটা সারা গেলেও কলাবেচা বা আমেরিকায় যাওয়া এ-যাত্রায় হয়ে উঠেনি। যেহেতু আইসেনহাওয়ার তখন হঠাৎ গুরুতর পীড়িত হয়ে পড়েন।

এসত্ত্বেও প্রধান মন্ত্রীর এবারকার য়ুরোপ ভ্রমণ তেমন অনুল্লেখ-যোগ্য ব্যাপার নয়। বরং কমনওয়েলথ সম্মেলন থেকে তাঁর সোজা পঃ জার্মানী গমন, সেখান থেকে যুগোশ্লাভিয়ার ব্রিয়নী এবং দেশে ফিরবার

পথে কায়রো অবস্থান—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা। আপাতত এতে তেমন কিছু ফল হয়নি মনে হলেও এসবার সামগ্রিক পরিণাম বহুদূরপ্রসারী।

পশ্চিম জার্মানীর কথাই প্রথমে ধরা যাক্। য়ুরোপের বারুদখানা এ'। 'ন্যাটো'র সামরিক পরিচালনায় একে পুনরায় অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করার যে-সিদ্ধান্ত পশ্চিমী শক্তিরা করেছে, তা'তে অন্যের মতো রাশিয়াও নির্ভয় হতে পারেনি। যেহেতু বিগত ৬০।৭০ বছরে ২।৩ বার জার্মানী প্রায় সারা য়ুরোপকে চষে ফেলেছে ; ধ্বংস, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর বীজ ছড়িয়েছে চারদিকে। আর সেজন্যে সবচেয়ে বেশি মূল্য দিতে হয়েছে রাশিয়াকেই। অথচ সে-কাল-সাপকেই দুধ দিয়ে পোষা। রাশিয়া চায়নি তাকে অস্ত্র দেয়া হোক, তা'র সাময়িকভাবে সুপ্ত জঙ্গী প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলা হোক, প্রাক্তন নাৎসী সেনাপতিদের জেল থেকে মুক্তি দিয়ে বা বিচারের প্রহসন করে ছেড়ে দিয়ে নতুন জার্মান বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হোক। বরং জার্মানীকে য়ুরোপের স্বার্থেই গলিতনখদন্ত করে রাখা ও শান্তি-যজ্ঞে বলি দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেন তাকে তাদের রুশবিরোধী আক্রমণের পুরোবর্তী ঘাটিতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর। এরি পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ব-জার্মানী কম্যুনিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষিত। পশ্চিমী প্রতিস্পর্ধার যোগ্য প্রত্যুত্তর।

আসলে পশ্চিম জার্মানী হতমান হলেও পশ্চিমী ইচ্ছানিচ্ছার বাহন হতে গররাজি। শুধু যতটুকু নিজের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই তাদের ইচ্ছার দাস। তার চেয়ে একবিন্দুও বেশি নয়। জার্মান নেতৃবৃন্দের অভিপ্রায় : মার্কিন সাহায্য নিয়ে আত্মনির্ভর হওয়া। কিন্তু আশু যুদ্ধবিগ্রহ বা যুদ্ধের পরিবেশ তার জাতীয় সত্তা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার অন্তরায়। কাজেই ভারতীয় 'পঞ্চশীল' ও সহাবস্থান নীতির প্রতি আস্থা। শ্রীনেহরুর পঃ জার্মানী ভ্রমণের সময় এবিষয়ে জার্মান নেতৃবৃন্দ মিত্রপক্ষের কাছে

নানা বাধ্যবাধকতার জন্যে যুক্ত ঘোষণা করতে পারেন নি। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাঁরা প্রকাশ্যে তাঁদের অভিমত প্রকাশ করেন। এতে যেমি হয়েছে ভারতীয় নীতিতে শক্তিসঞ্চার,—শান্তি-এলাকার প্রসার, আর যুদ্ধের তপ্ত মেজাজ শীতল, তেমনি হয়েছে ভারতের শিল্পোদ্যোগের সহায়ক। যেহেতু জার্মানীর অজেয় প্রাণশক্তি মাত্র বছর দশেকের ভেতর নিজের ধ্বংসাবশিষ্ট শিল্পসম্পদ নতুন করে গড়েই তুলেনি, ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠায়, বিশেষ করে উড়িষ্যার রাউরকেলায় ইস্পাত কারখানা নির্মাণে (দেমাগ কোং) সহযোগিতার হাতও বাড়িয়েছে। কাজেই ভারত ও জার্মানীর স্বার্থ পরস্পর-পরিপূরক।)

য়ুরোপে যুগোশ্লাভিয়ার ঐতিহাসিক ভূমিকার বিষয় আগেই আলোচনা করা হয়েছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই শুধু সে নয়, য়ুরোপে ভারতের কিছুটা প্রতিরূপও বটে। একদিকে তার দৃঢ়তায় রাশিয়ার আত্মপ্রসার লিপ্সা হয়েছে স্তব্ধ, অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিন স্পর্ধা সংযত। নিজের পুনর্গঠন ও শিল্পায়ন ছাড়াও যুদ্ধ ঠেকাবার সে এক অমোঘ শক্তি। তবে জানুয়ারীতে ('৫৬) মার্শাল টিটো ভারত ভ্রমণে এসে পঞ্চশীল-সমর্থক যুক্ত ঘোষণা করার সময় পৃথিবীতে যে-অবস্থা ছিল, জুন মাসে শ্রীনেহরুর ব্রিয়নী (যুগোশ্লাভিয়ার সামুদ্রিক স্বাস্থ্যাবাস) পরিদর্শনকালে পরিস্থিতি তার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র ধরণের; আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে তখন পটপরিবর্তনের সূচনা। ব্রিয়নী বৈঠকে তিনি ও মার্শাল টিটোই নন, বান্দুং দেশ মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসেরও ছিলেন উপস্থিত। তাঁদের যৌথ ঘোষণায় পৃথিবীতে শান্তিরক্ষার আগ্রহও যেমন ব্যক্ত হয়, তেমি হয় পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি। অর্থাৎ পঞ্চশীল বা বান্দুং ঘোষণার এ এক পুনরাবৃত্তি। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সহমর্মিতার নতুন আশ্বাস।

তবে ব্রিয়নী বৈঠকে কর্ণেল নাসেরের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যবোধক। যেহেতু ভৌগোলিক সংস্থান হেতু আন্তর্জাতিক

বাণিজ্য ও সমরনীতিতে মিশরের গুরুত্ব অনন্যসাধারণ। তা'র রাজ্য-সীমায় অবস্থিত সুয়েজ খাল পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে একমাত্র সংক্ষিপ্ত সংযোগপথ। এর ভেতর দিয়ে পণ্যবাহী যত সব বাণিজ্যপোতের আসা-যাওয়া; সেনা ও সমরোপকরণবাহী যত নৌবহরের আনাগোনা। ভারতের বৈষয়িক পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের পক্ষে তো সুয়েজ 'জীবন-সূত্র' (life-line) স্বরূপ। কাজেই সুয়েজখালের কর্তৃত্ব নিয়ে মিশর ও ইঙ্গ-ফরাসী তথা পাশ্চাত্ত্য শক্তিগুলোর মধ্যে বিবোধের ফলে ভারতের সমগ্র দ্বিতীয় পাঁচসালা পবিকল্পনা রূপায়ণ বিঘ্নিত হবার সম্ভাবনা। তা-ই জুলাই মাসে ('৫৬) মিশর কর্তৃক খাল রাষ্ট্রীকরণের ফলে ইঙ্গ-ফরাসী পক্ষ * সামরিক তোড়জোড় করায় তা'র দুশ্চিন্তার সীমা ছিল না। এহেতু আগষ্ট মাসে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত সুয়েজখাল বৈঠকে (ভারতসহ ২২টি রাষ্ট্র এতে আমন্ত্রিত) ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমেননেব যোগদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যাবতীয় চেষ্টাযত্ন সত্ত্বেও তাঁ'র আপোষ রফার পরিকল্পনা ওতে গৃহীত হয়নি—গৃহীত হয়নি মিশরের অধিরাজ ক্ষমতার স্বীকৃতির নীতি। বরং তথাকথিত খাল ব্যবহারকারী সমিতির স্বার্থরক্ষার অজুহাতে মিশরের ওপর ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন ইচ্ছা চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়। তবে ভারত বিফল হলেও সম্মেলনের ভেতর ও বাইরে তার অক্লান্ত চেষ্টায় যুদ্ধের আবহাওয়া

---

* **পাদটীকা** :- সুয়েজখালের ইজারাদার এক ফরাসী কোম্পানী। এর মেয়াদ একশ' বছর; শেষ হতে মাত্র বছর এগারো বাকী। কোম্পানীর শেয়ারের শতকরা ৬০ ভাগের মালিক ইংরেজ ও ৪০ ভাগ ফরাসী। এর আয় বিপুল; শান্তি ও যুদ্ধকালে এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব অসীম। কিন্তু খোদ খালটি মিশরে অবস্থিত। তা-ই এর সার্বভৌম কর্তৃক মিশরের। মিশর অসময়ে রাষ্ট্রীকরণ করায় কোম্পানীকে বাজার দরে খেসারত দিতে রাজি, আর আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচল নির্বিঘ্ন করতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

স্তিমিত হয়। তারপর সুয়েজ সম্পর্কিত দ্বিতীয় বৈঠকে তার অবশ্য আমন্ত্রণ হয়নি। তবে কায়রোয় প্রেসিডেন্ট নাসেরের সঙ্গে শ্রীমেননের ৬ দিন ব্যাপী যে-আলোচনা হয় তাতে একটি রফার সূত্র উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে মার্কিনী কৌশলে * লণ্ডন বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবটি প্রকারান্তরে যুদ্ধ পরিহারেরই সামিল। এ নিয়ে ইঙ্গ-ফরাসী মহলে ক্ষোভ ও ক্রোধের অন্ত ছিল না। থাক্‌লেও শেষ পর্যন্ত গত ২৬শে সেপ্টেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-ফরাসী প্রস্তাব আলোচনার জন্য গৃহীত হয়। গৃহীত হয় মিশরের প্রস্তাবও। এর ভবিষ্যৎ ফলাফল যা-ই হোক না কেন, ভারতের উদ্দেশ্যই যে এতে সিদ্ধ হয়েছে, তা'তে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় নেই ; অর্থাৎ শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ভারতের আপাত-সফলতা লক্ষণীয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর সবচেয়ে পরাক্রান্ত মহল একজোট হয়ে পশ্চিম এশিয়ায় একটি প্রলয় কাণ্ড ঘটাতে উঠেপড়ে লেগেছিলো। হয়ত এতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটা বিচিত্র ছিল না।

এখানে বলা দরকার, ভারত তা'র শান্তিরক্ষার চেষ্টায় মিত্রামিত্র ভেদ করে না। এহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া বা বৃটেনকেও

* **পাদটীকা**ঃ—প্রথম দিকে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিমী শক্তিদের আমেরিকা থেকে তৈল আমদানীর জন্যে ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দেওয়া হবে। এটা কার্যত ইঙ্গ-ফরাসী শক্তিকে নতুন করে আমেরিকার তাঁবেদার করা বই অন্য কিছু নয়। কিন্তু বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বল-প্রয়োগের পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি বিবেচনার জন্য উত্থাপনের ব্যবস্থা হয়। তা' ছাড়া, '৫৬ সালের নবেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়। কাজেই এদিকে এবং মার্কিন জনসাধারণের শান্তিকামী মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য রেখে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির নিয়ন্ত্রণ। এদিকে প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ২৭শে সেপ্টেম্বর সাংবাদিক বৈঠকে ঘোষণা করেন যে, সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে তিনি প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সংগে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

যেমন স্পষ্ট কথা বলতে তোয়াক্কা করে না, তেমনি করেনি মিত্র মিশরকেও। মিশরের খাল রাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির সমালোচনা করে শ্রীনেহরু একস্থানে বলেছেন যে, ভারতে রাষ্ট্রীকরণের ব্যাপারটি ভিন্ন পথে করা হতো। এর পর থেকে মিশর কথায় ও কাজে যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দেয়। ভারত যে মিশরের প্রকৃত হিতকামী বন্ধু, এ তারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সুয়েজখাল রাষ্ট্রীকরণে বৃটেন ও ফ্রান্সের এতো হৈ-হল্লার দরকার ছিল কি? যুদ্ধ বাধাবার মতো পরিবেশ সৃষ্টির উপযোগিতা সত্যিই কি ছিল? এর সদুত্তর পাওয়া ভার। তবে এ সবার পটভূমিকা নিশ্চয়ই একটা আছে। তা' হলো এই: দ্বিতীয় মহাসমরের পর পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো উপনিবেশিক শক্তিরূপে ইংরেজ ও ফরাসীদের গৌরবরবি অস্ত যাবার সূচনা হয়। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে নব জাতীয়তার বন্যার উপনিবেশবাদ প্রায় ভেসে যায়। ইংরেজ ও ফরাসীশক্তি পূর্ব এশিয়া হ'তে তা-ই সরে এসে আফ্রিকায় আশ্রয় নিয়েছে, ঘাটি বেঁধেছে; সেখানে করেছে যাবতীয় শক্তি সংহত। কিন্তু এদের পথের কাঁটা মিশর। আফ্রিকার তামাম উপনিবেশবাদবিরোধী মুক্তি আন্দোলনের মূলে রয়েছে তা'রই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ও সহযোগিতা। ফলে এ এলাকা থেকেও ইঙ্গ-ফরাসী স্বার্থের ক্রমিক উচ্ছেদ আসন্ন। কাজেই এহেন আস্ফালন।

অবশ্য মিশরের ঐতিহ্যও মূলত সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদ বিরোধী। আবার ভারতীয় আদর্শ ও কর্মনীতির সঙ্গে তা'র নিজস্ব নীতির সাযুজ্য বর্তমান। স্বার্থও বৃহত্তর ক্ষেত্রে উভয়ের প্রায় অভিন্ন। কাজেই এতো ঘনিষ্ঠতা ও সহযোগিতা।

তবে মধ্য প্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির শোষণ, কুশাসন ও ভেদনীতির প্রয়োগে মিশর উদ্বিগ্ন, বিরক্ত ও অতিষ্ঠ। কাজেই এদের শাসনের নৈতিক ভিৎ শিথিল

করায় তার যতকিছু উদ্যম; আবার সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকার জন্যে কম্যুনিষ্ট শিবিরের সঙ্গে '৫৫ সাল থেকে মিতালী ও চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র সম্ভার লাভ। এ-সুযোগে পশ্চিম এশিয়ার রাজনীতিতে শনিরূপে রুশ প্রভাব বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও ইয়েমেনের সঙ্গে তা'র হৃদ্যতা বৃদ্ধি এর প্রমাণ। তবে বৈষয়িক ও অন্যান্য ব্যাপারে নির্সর্ত সাহায্য দেবার প্রস্তাবই রাশিয়াকে এ-অঞ্চলে করেছে বরণীয়। শুধু তা-ই নয়। সাহায্য ও সম্পর্ক স্থাপনে শত্রু মিত্র ভেদাভেদ না করায় অবস্থার মৌলিক রূপান্তর না ঘটেছে এমন নয়। বোগদাদ, চুক্তিভুক্ত ইরাণ, ইরাক ও পাকিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনেও তা'র আগ্রহ কম নয়। এ মনোভাব আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার এক নূতন পর্যায়ের আরম্ভ বলে মনে করা যায়। যেহেতু আরব বা মুসলিম জগতকে পরস্পর-বিরোধী ও সংস্রবহীন শিবিরে পরিণত করার যে-চাল ইঙ্গ-মার্কিন তরফে অহরহ দেয়া হচ্ছিল, রাশিয়ার পাল্টা চালে তা' আপাতত ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ কূটনীতির দাবাখেলায় এ-অঞ্চলে একটী ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতি ভারতের কর্মনীতির পোষক। ভারতও যে নিজস্ব পদ্ধতিতে যথাসাধ্য একে কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করে তা' বলাই বাহুল্য।

কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার আসল গুরুত্ব যতটা বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক শোষণ, ততটা সামরিক নয়। তবে আধুনিক সমর-নীতি মূলত বাণিজ্যভিত্তিক; ভিন্ন কথায় এ দু'য়ের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। তা-ই এ অঞ্চলের রাজনীতি বাণিজ্যকে বিন্দু করে আবর্তিত হলেও এখানে সমর-নীতির এতো প্রাধান্য। ভূমধ্যসাগরের আগমনিগম পথ সম্পর্কে এতো সতর্কতা।

একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করার মতো। ভারত-সংলগ্ন পাকিস্থান হ'তে ভূমধ্যসাগরের পূর্ব ও দক্ষিণ তীরবর্তী একলাগোয়া

প্রায় সবক'টি দেশই মুসলমান-প্রধান। বিশেষ করে পূর্ব তীরের দেশগুলোর জঠরে 'কালো সোনা' বা পেট্রোলিয়ামের অপরিমেয় সম্পদ;—যে-তেলের ওপর নির্ভরশীল আধুনিক শ্রমশিল্প ও রণনীতি, সভ্যতার বনিয়াদ যার ওপর সু-প্রতিষ্ঠ। তা-ই তৈল সংগ্রহ ও নিষ্কাষণে এ-এলাকায় এমন কাড়াকাড়ি ও ভীড়; ইংরেজ, ফরাসী ও মার্কিনীদের প্রতিযোগিতা। তবে ইংরেজ এখানকার সাবেক ও বনিয়াদী তেলের ইজারাদার; মার্কিনীরা জুটেছে কিছুটা হালে। ইরাণ ও ইরাকে প্রথমোক্তের, আর সৌদী আরব ও অন্যত্র শেষোক্তের স্বার্থ বেশি। কাজেই তৈল-স্বার্থের বাহনরূপে সাম্রাজ্যিক স্বার্থ এদের জড়িত। কিন্তু পদে পদে বিপদ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এসব অনগ্রসর ও ভৌমতন্ত্রী দেশেও ঘটেছে গণজাগরণ; হয়েছে জাতীয়তাবোধের উদ্বোধন; হয়েছে আধুনিক শিক্ষিত এক নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব। তাবা শোষিত ও বঞ্চিত। তাদেব দেশ কার্যত লুণ্ঠিত। তাদের কাছে ধরা পড়েছে ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী স্বার্থ ও সম্পর্কের স্বরূপ। তাদের বুঝ্‌তে বাকি নেই,—প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইহুদি বাসভূমিরূপে প্যালেস্টাইনে ইস্রায়েল রাষ্ট্রেব পত্তন হলেও এখন তা' ইঙ্গ-মার্কিন-ফবাসী স্বার্থের প্রতিভূ ও সামবিক ঘাটিতে পরিণত। '৫১ সালেব পর প্রায় প্রতি ক্ষেত্রে আরব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণকাবীরূপে চিহ্নিত হলেও ইস্রায়েল পাশ্চাত্য জগতের পোষ্য। তাদের দেয়া হয়ে থাকে যত সব সামরিক জোগান—যা' প্রয়োগ করা হয় আরব জগতেরই বিরুদ্ধে। এতে আরববাসী মাত্রই ক্ষুব্ধ। তা-ই নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মিশর, সৌদী আরব, জর্ডান, লেবানন ও সিরিয়া পারস্পরিক সাহায্য চুক্তিতে আবদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় পশ্চিমী স্বার্থের মুখপাত্ররূপে বৃটেন এদের ভেতর ভাঙ্গন ধরাতে সচেষ্ট। জর্ডানকে বোগদাদ চুক্তি সংস্থায় ভিড়াবার জন্যে তা'র কারসাজির অন্ত ছিল না। ভরসা ছিল, এ-রাজ্যের রাজনীতিতে

বৃটেনের প্রভাব কাজ করবে। সেনাবাহিনীর ইংরেজ অধিনায়ক জেঃ গ্লাব (আরবী নাম গুলাব পাশা) ও তাঁ'র সহচররা একে ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রণ করবেন। কিন্তু মার্চে ('৫৬) সেখানে ইংরেজ-বিরোধী প্রবল গণবিক্ষোভ জেগে ওঠে। ইংরেজ সেনাপতিরা হন বিতাড়িত। পরে অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে বোগদাদ চুক্তি বিরোধীদের হয় জয়জয়কার। এভাবেই পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো থেকে বৃটেনের রাজনৈতিক ও বৈষয়িক প্রভুত্বনাশের সূচনা।

তবে এ-অঞ্চলে শোষকরূপে ইংরেজ ও মার্কিনের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্যে পরস্পরের প্রতিযোগী। প্রমাণ: '৩৯ সাল থেকে '৫৫ সালের ভেতর এ-এলাকায় মার্কিন তৈল-নিষ্কাষণের পরিমাণ ১৩ ভাগ থেকে বেড়ে ৬৫ ভাগে পরিণত হয়েছে। অন্য দিকে বৃটেনের অংশ কমে ৬০ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই তৈল-স্বার্থের খাতিরে আমেরিকা আরব রাষ্ট্র-গুলোকে চটাতে নারাজ। বোগদাদ চুক্তির জনক হয়েও বৃটেনকে সাম্‌নে ঠেলে দিয়ে নিজের নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান; আর আরব-ইস্রায়েল বিরোধ ও জর্ডান থেকে ইংরেজ শক্তি বিতাড়নে সে শুধুই মূক সাক্ষী।

পশ্চিম-এশিয়ায় ইস্রায়েল রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক ভূমিকা ও ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন শক্তির নিষ্ক্রিয়তা বা পরোক্ষ সমর্থনে যখন আরব জগৎ বিশেষত মিশর চেকোশ্লোভাকিয়ার কাছে অস্ত্র-প্রার্থী, ভারত তখন তাকে ছোটখাট উদ্বৃত্ত অস্ত্র সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এর উদ্দেশ্য—অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতা নয়। অথবা যুদ্ধ-বিগ্রহের পরিবেশ জীইয়ে রাখা নয়। সে সাধ্য ভারতের নেই, ইচ্ছা তো নেই-ই। বরং তা'র নীতিবিরুদ্ধ কাজ এ। তবে বান্দুং সম্মেলনে গৃহীত পারস্পরিক সাহায্যদান প্রস্তাব অনুযায়ী মিত্র-রাষ্ট্রের বিপদে এ শুধু শুভেচ্ছাসূচক সহানুভূতির নিদর্শন।

সবচেয়ে বড়ো কথা: মধ্যপ্রাচ্য বা পশ্চিম এশিয়ায় ভারতের আগ্রহ ও স্বার্থ অন্যত্র। সে চায় না তৈল-রাজনীতির আবর্তে

ঘুরপাক খেতে; তা'র ইচ্ছা নয়, সুয়েজ খালের জলে হাবুডুবু খাওয়া অথবা শক্তির দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়া। যেহেতু তা'র life-line বা জীবনসূত্র সুয়েজ খাল। তা'র আমদানী বাণিজ্যের ৭২ শতাংশ, আর রপ্তানী বাণিজ্যের ৬৭·শতাংশ এর ভেতর দিয়ে করে চলাচল। য়ুরোপ থেকে তা'র পুনর্গঠনের যাবতীয় মাল-মশলা ও উপকরণ আমদানীর সোজা পথ এ-ই। কাজেই এ যোগাযোগ পথ নিরাপদ রাখা বা রাখতে সহায়তা করাই তার মূল কাজ। নইলে তা'র দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনা গুরুতর বিঘ্নিত হবার আশংকা। আবার খালের পূবপারে বিভিন্ন আরব রাষ্ট্র। এসবে ঘোট পাকাচ্ছে তেলের রাজনীতি। চলেছে পশ্চিমী স্বার্থের নিরন্তর সংঘাত। কিন্তু সব ক'টি রাষ্ট্র মুসলিম হ'লেও এদের মধ্যে নেই একাত্মতা ও একতা, নেই Pan-Islamism বা অখণ্ড মুসলিম স্বার্থের অস্তিত্ব। পশ্চিমী রাষ্ট্রের কারসাজিতে এরা পরস্পর-বিভক্ত। আবার যে-সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদ ঐতিহাসিক কারণে পূর্ব এশিয়া থেকে বিলুপ্তপ্রায়, তা-ই এ এলাকায় 'Cooperative imperialism' * বা জোটবন্দী সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশে হাজির। দৃষ্টান্ত বোগদাদ চুক্তি; দৃষ্টান্ত সুয়েজ খাল পরিচালনার দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনায় ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন নেতৃত্বে পাকিস্থান সহ ১৮টি রাষ্ট্রের † অনধিকার চর্চার আব্দার।

---

* **পাদটীকা**ঃ—বিখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রনীতিবিদ্ লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড চলতি শতকের চতুর্থ দশকে এশিয়া ও আফ্রিকার কাঁচা মাল ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন এলাকা পশ্চিমী তাঁবে রাখার কৌশলরূপে এ নতুন শব্দটি চয়ন করেন।

† '৫৬ সালের আগস্টে অনুষ্ঠিত সুয়েজ সংক্রান্ত লণ্ডন সম্মেলনে ভারত সহ ২২টি রাষ্ট্র যোগ দেয়। তা'তে ভারত মিশরের সার্বভৌমত্ব রক্ষা ও আন্তর্জাতিক নৌ চলাচলের নিরাপত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পশ্চিমীদের বিরোধিতায় তা' বিফল হয়।

কাজেই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীরূপেই শুধু নয়, যুদ্ধনিরোধক ও ভারসাম্য স্থাপক রূপেও ভারতের ভূমিকার এ এক পরীক্ষাক্ষেত্র। তবে প্রয়োজন হলে অপ্রিয় সত্য কথা বলায়ও ত'ার কুণ্ঠা নাই, এমনকি মিশরের মতো মিত্রের বেলায়ও। শ্রীনেহরু কর্তৃক মিশরের খাল রাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা তা'র প্রমাণ। এর ফল অশুভ হয়নি; যেহেতু মিশর তার প্রথম দিক্‌কার ভাবোচ্ছ্বাস পরিহার করে কথা ও কাজে সংযত হয়; আর হয় বাস্তবনিষ্ঠ। কাজেই মিত্রকেও সু-পথে চালিত করা ভারতীয় নীতির মূল কথা।

বলা বাহুল্য, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে (কোন কোনটির সঙ্গে মতভেদ সত্ত্বেও) ভারতের প্রতিষ্ঠা অর্জনের কাজটি খুব সহজ হয়নি। এজন্যে তা'কে বহুকাল ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হয়েছে। দেশে বিরূপ সমালোচনাও এ নিয়ে কম হয়নি। এজন্য ভারতীয় নীতি অথবা ভারতের প্রচার বিমুখীনতাই শুধু দায়ী নয়। দায়ী বহু বিরোধী স্বার্থের সংঘাত ও বিভিন্নমুখী প্রভাব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এ এলাকায় পাকিস্থানের ভারত-বিরোধী অপ-প্রচার। কিন্তু দেরিতে হলেও পরিণামে সত্যনিষ্ঠার জয় হয়েছে। তা-ই পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্র ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এদের কাছে তা'র খ্যাতি ও খাতির এখন যথেষ্ট। একদিকে আফ্রিকার বিভিন্ন মুসলিম দেশের পাশ্চাত্ত্য-বিরোধী মুক্তি আন্দোলন সমর্থন ও স্বাধিকার লাভে সহায়তাদান, অন্যদিকে আরব-ইস্রায়েল বিরোধে আরবীয় দাবীর পোষকতা করায় ভারতীয় নীতি মুসলিম জগতে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠার অধিকারী। আবার ভারতের স্বরাষ্ট্র নীতি—তা'র ধর্ম-নিরপেক্ষতা, সংখ্যালঘু সংরক্ষণ ব্যবস্থা, শিল্পায়ন ও বৈষয়িক প্রগতির উদ্যম এদের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম উদ্রেক করেছে। সৌদী

আরবের * রাজা সৌদের ('৫৫ সালের ডিসেম্বর) ভারত ভ্রমণ আর স্বেচ্ছায় ভারতীয় নীতি ও কর্মোদ্যোগের অকুণ্ঠ প্রশংসা তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। তবে এসব বিদেশী-প্রভাবিত ও নিরুদ্যম দেশে নতুন কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে ঠাঁই করা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার, অথচ তা-ই করেছে ভারত। কূটনীতিক সম্পর্ক ও মাধ্যমের ওপর একান্ত নির্ভর না করেও সরাসরি রাষ্ট্র-নায়ক ভিত্তিতে যোগ স্থাপনের ব্যবস্থা এক্ষেত্রে আশাতীত সফল হয়েছে তা'র। গত জুন-জুলাই ('৫৬) মাসে লণ্ডন ও য়ুরোপ থেকে দেশে ফিরবার পথে লেবাননে শ্রীনেহরুর স্বল্পস্থায়ী অবস্থিতি, আর সৌদী আরবের রাজার আমন্ত্রণরক্ষায় সেপ্টেম্বরের ('৫৬) শেষ সপ্তাহে সৌদী আরব পরিদর্শন তা-ই ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের এক শ্রেষ্ঠ ধাপ, স্মরণীয় ঘটনা। এরই ফলশ্রুতি, পশ্চিম এশিয়ায় 'ইসলাম-হিতৈষী' রাষ্ট্ররূপে ভারতের সমাদর, নতুন পরিচিতি। এ হলো তা'র সন্নীতির জয়; তার মিত্রতার জয়যাত্রার সর্বশেষ পরিণতি।

কূটনীতির দাবাখেলার ব্যাপ্তি পৃথিবীময়। স্থান কাল পাত্রভেদে নিতুই নতুন, নিতুই পরিবর্তনশীল। খেলাও এর জমে এক একবার এক একরকম। যখন যেখানে বিরোধী স্বার্থের টানাপোড়েন যত বেশি প্রবল হয়, সেখানে সংঘাতও হয় তত তীব্র

* পাদটীকাঃ—আরব সভ্যতার জন্মভূমি ও ইসলামের লীলাক্ষেত্র এই সৌদী আরব। মুসলমান জগতের তীর্থস্থান মক্কা ও মদিনা এখানে অবস্থিত। এর আয়তন ১০ লক্ষ বর্গ মাইল; (প্রায় ভারতের সমান) অথচ জনসংখ্যা মাত্র ৬০ লক্ষ। কিন্তু আয় তুলনায় অপরিমিত—আরব-আমেরিকা তৈল কোম্পানীর (সংক্ষেপে আর্মাকো ARMACO) ইজারা থেকে তৈল উত্তোলনের রয়ালটি বাবদ বার্ষিক আয় ১০ কোটি পাউণ্ড বা ১৩৩ কোটি টাকা। এ টাকা ভারতের রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ। কিন্তু দেশটি খুবই অনগ্রসর। জেড্ডা ও দু' একটী সহর ছাড়া সবই গ্রামতুল্য। কৃষি নেই বল্লেই চলে। মরুভূমি ও বেদুইনের দেশ; অশিক্ষা ও কুসংস্কারে ভরা; প্রগতির চিহ্নহীন। কিন্তু এখানে মাটির নীচের 'কালো সোণা'র কৃপায় ও এখানকার প্রগতিশীল

ব্যাপক। কাঁচা মাল, তৈল বা রবার, উপনিবেশের মালিকানা ও শরিকানা অথবা প্রভাব-বিস্তারের এলাকা নিয়ে বাধে হৈহুজ্জত। শুরু হয় বাঘে-সিংহে লড়াই। এসবকে উপলক্ষ করেই চলে এক একটি যুদ্ধের পায়তারা; মহাযুদ্ধের ছায়া হয় দীর্ঘতর। যুদ্ধকে শেষ করার জন্যে নতুন যুদ্ধের আওয়াজ ওঠে। কিন্তু এর শেষ নেই, নেই এর সম্ভাবনার অন্ত। তা-ই এর বিরামহীন পদধ্বনি আর্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে শংকার বিষয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরেও তিন তিনবাব যুদ্ধযুদ্ধ খেলার মহড়া ভোল্‌বার নয়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিক বা তাঁদের যন্ত্রী বা চক্রান্তকারী দলের দুরাকাঙ্ক্ষার অনির্বাণ শিখায় সকলেই বলি। তা-ই জগৎজোড়া মার্কিন ডলারের অঢেল দানখয়রাৎ, কম্যুনিজম্‌কে ঠেকাবার নাম করে সারা পৃথিবীতে ছড়ানো ন'শো যুদ্ধঘাটিতে ১০ লক্ষ মার্কিন সেনা মোতায়েন। তবে রাশিয়াও এর বিরুদ্ধে উচিত পাল্টা ব্যবস্থা কবতে কসুব করেনি। কাজেই গণতন্ত্রী জোট ও কম্যুনিষ্টযূথের মধ্যে পড়ে জগদ্বাসীর নাভিশ্বাস হবার উপক্রম। কিন্তু সংঘাতের মাঝপথে সগর্বে দাঁড়িয়ে ভারতের নেতৃত্বে গুটিকয় জোটবিরোধী শান্তিবাদী রাষ্ট্র। সামরিক শক্তিরূপে এদের বলাবল নগণ্য। অথচ প্রচণ্ড নৈতিক শক্তির অধিকারী এরা। এরা যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিকামী। প্রথম চোটেই যে খাল

রাজার উদ্যমে সারা সৌদী আরবে পুনর্গঠন আরম্ভ হয়েছে। কায়রো ও বেইরুট থেকে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দ্রুত গড়ে উঠ্‌ছে। বিভিন্ন খণ্ডজাতিকে সংঘবদ্ধ করা হচ্ছে। তা-ই ভারতের পুনর্গঠন প্রয়াস ও প্রগতিশীল কর্মনীতির প্রতি তা'র শ্রদ্ধা ও মানসিক সংযোগ। আর বান্দুং ঘোষণায় সাম্রাজ্য ও উপনিবেশবাদ-বিরোধিতা ও পঞ্চশীলের প্রতি তার আকর্ষণ। সৌদী আরবের সামরিক গুরুত্বও অসাধারণ। এখানে আছে শক্তিশালী মার্কিণ সামরিক ঘাটি। কিন্তু কোনো জোটে সে নেই। পক্ষান্তরে বোগদাদ চুক্তি-বিরোধী, আবার ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের পোষক।

এলাকায় যুদ্ধ বাধেনি, তা'র কৃতিত্বের বেশির ভাগ প্রাপ্য আমেরিকার নিঃসন্দেহ। তথাপি রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরোধী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে রফার ভিত্তিরূপে যে-নীতি স্বীকৃত হয়, তাও ভারতের উদ্ভাবিত ৫ দফা সূত্রের অনুসারী।

কাজেই বহু গলদ থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতি এক্ষণে সু-প্রতিষ্ঠ। শত্রু-মিত্র সকলেরই সম্ভ্রম ও প্রীতির রসে সিক্ত। তা'র প্রতিষ্ঠা যে-কোন প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রের পক্ষেও রীতিমতো ঈর্ষার বিষয়। একদা সংশয়ীরা এর আখেরের ভাবনায় উদ্বিগ্ন ও নিরাশ হয়েছিলেন। আশু লাভের প্রত্যাশীরা তা'কে গণতন্ত্রী জোটে ভিড়ে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সাবধানীরা শিয়রে শমনরূপে করেছিলেন রাশিয়া ও চীনকে চিহ্নিত। কিন্তু তাঁদের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি। এত সব ডামাডোলের ভেতরও ভারত নিজস্ব পথ রচনা করে নিয়েছে; কিছু প্রভাবও বিস্তার না করেছে এমনও নয়। আবার কূটনীতির খেলায় মিত্রহীন হয়নি; বরং মিত্রলাভ হয়েছে বিস্তর। উভয় শিবিরেই তা'র স্বচ্ছন্দ অনায়াস আনাগোনা সমান।

তবে পথ তা'র সুগম ছিল না, এখনও নেই। মার্কিন যুদ্ধ-ঘাটিগুলো অক্টোপাসের মতো তা'র চারপাশে ছড়ানো; সাহায্য লাভের ব্যাপারেও নানা গড়িমসি ও ছলছুতা প্রত্যক্ষ। যে-বিশ্ব ব্যাঙ্ক যুগোশ্লাভিয়াকে ঋণ দিতে কসুর করেনি, সে-ই কিনা তোলে এতোদিন পর (অক্টোবর, '৫৬) ভারতের রাষ্ট্রাদর্শ ও শিল্পনীতি নিয়ে আজগুবি আপত্তি। অর্থাৎ হিতকামীর ছদ্মবেশে একেবারে গোড়া ধরে টান দেবার অপ-চেষ্টা। তবে পুরাণো এ-খেলায় ভারত অনভ্যস্ত নয়। তা-ই আত্মবিশ্বাস তা'র অটুট; ভাবীকালের ওপর নিশ্চিন্ত নির্ভরতা যথেষ্ট।

আর যা-ই হোক, নিজের শক্তি সম্পর্কে ভারতের কোন ভুল ধারণা নেই। নিজ সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। জানে, বৃহৎ

শক্তির তুলনায় তা'র সামরিক বল তুচ্ছ, বৈষয়িক সম্পদ নগণ্য, শিল্পসম্ভার অ-প্রতুল, কূটনৈতিক বিদ্যায় দক্ষতা নামমাত্র। কিন্তু অমিত নৈতিক বলের অধিকারী,—যা'র উৎস অপরাজেয় আত্মিক ও মানসিক তেজ। অস্ত্রের ঝনৎকার ও অর্থের অহমিকা এর তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। তা-ই এশিয়া ও আফ্রিকার দলিত জাতিগুলির স্বাভাবিক নায়করূপে তা'র ভূমিকার গুরুত্ব। আবার শান্তিবাদী ও আপোষকামীরূপে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তা'র আবির্ভাবের ফলে পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের পরিবর্তন লক্ষ্যণীয়। গণতন্ত্রের প্রতিনিধি আমেরিকা অথবা সাম্যবাদী জোটের প্রতিভূ রাশিয়া যদিচ পৃথিবীর সিন্ধুকের চাবি দখল করে বসে আছে, তথাপি ভারতও নিজ উপায়ে তা'কে খোলা বা বন্ধের কায়দা আয়ত্ত না করেছে এমনও নয়। তাই এখন পৃথিবীতে ভারসাম্য নষ্ট হবার উপক্রম হলে যেমন ওয়াশিংটন, তেমন মস্কো থেকেও সমানে তা'র ডাক আসে। দিল্লীর সলা-পরামর্শের প্রয়োজন এদেরও হয। যদিও দিল্লীর যুদ্ধ বন্ধ করার বা সংঘর্ষ এড়াবার ক্ষমতা নেই, যদিও যুদ্ধ লাগলে তা'র আঁচ তা'কেও ঝল্‌সাবে, হয়ত দগ্ধেও মারবে। কিন্তু এ থেকে দূরে থাক্‌বারই সযত্ন প্রয়াস তা'র ; যুদ্ধকে সীমিত করার, তা'র ঝাঁজকে নিস্তেজ ও শমিত করার আত্ম-আরোপিত দায়িত্ব তা'র। সে জানে, যুদ্ধের দাবাগ্নি নির্জিত ও পীড়িত মানবগোষ্ঠি বা পৃথিবীর কল্যাণের জন্য নয়। মুষ্টিমেয়ের স্বার্থোদ্ধারের পথ এ। কাজেই খণ্ডিত স্বার্থবোধ সংঘাতের হেতু। এহেতু বর্জনীয়। কিন্তু সামগ্রিক কল্যাণ তখনই সম্ভব যখন পৃথিবীময় শান্তি বিরাজ করবে ; পঞ্চশীলের আদর্শ কথায় ও কাজে পালিত হবে। শুধু নিজ স্বার্থবোধের তাগিদ এ নয়। বরং ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বর্তমান ভারত-রাষ্ট্রের শিক্ষাই এ-ই। যা' চিরাগত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী, যা' তা'রই রাষ্ট্রিক পরিণতি।

মিত্রতার জয়যাত্রা

১৯২৭ আর ১৯৫৫ সাল। দীর্ঘ ২৮ বছরের ব্যবধান। দুস্তর না হলেও দুরতিক্রম্য। কেননা মহাকালের শিলালেখতে তা'র স্থূল হস্তাবলেপের স্বাক্ষর বিস্তর। কতো না ভাঙাগড়া ও পতন-উত্থানের কলংকরেখা এতে আঁকা। কতো দুর্মতি ও দুরাশা, কতো জাতির জোয়ারভাঁটা, আর বিশ্ব মানচিত্রের হেরফেরের কাহিনীতে ভরা এ-সময়।

এ ধারাস্রোত কালানুক্রমিক, বিরামহীন। ধরা যাক, '২৭ সালের ইংরেজ-ভারত, আর '৫৫ সালের সার্বভৌম প্রজাতন্ত্রী ভারতের কথা। এ দু'য়ের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। প্রথম পর্বে জওহরলাল শাসকগোষ্ঠির অবাঞ্ছিত, শেষ পর্যায়ে ভাবত-ভাগ্য-বিধাতা। কাজেই এক সময় যাঁকে মুক্তিব দিশায় সোবিয়েৎ ভূমিতে যেতে হয়েছিল, যেতে হয়েছিল নতুন সমাজ দর্শনের খোঁজে, তাঁকেই আবার আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন কাণ্ডারীরূপে দ্বিতীয়-বার সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা-ভূমিতেই যেতে হয়। এ রূপ-বদল একেবারে মৌলিক। কিন্তু জীবনের প্রথম দিকে নেহরু ছিলেন এখনকার তুলনায় মতবাদের দিকে কিছুটা উগ্রতর—দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের দিকেই ছিল ঝোঁক কিছুটা বেশি। সে-হিসাবে ছিলেন নৈষ্ঠিক সমাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী। কিন্তু বয়োধর্ম ও গান্ধী-দর্শনের প্রভাব কালধর্মের ওপর নিঃসন্দেহে জয়ী হয়েছে। যেহেতু তিনি এখন সমাজতন্ত্রবাদী হলেও নির্বিরোধ বিবর্তনবাদী। অর্থাৎ আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা অবিচল থাকলেও পথ তাঁ'র ভিন্ন। তিনি এখন স্বতন্ত্র পুরুষ। রাশিয়ার কর্মনীতিও এখন সময়সময় তাঁ'র বিরূপ সমালোচনার বিষয়ীভূত। অথচ এক সময় তরুণ নেহরুর চোখে রাশিয়া ছিল অপার বিস্ময়,—তীর্থবিশেষ।

তখনকার আন্তর্জাতিক পটভূমি ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাশিয়া ছিল বৃটিশ সরকারের নিকট নিষিদ্ধ দেশ। তাকে জঘন্যরূপে শুধু নয়, তাকে ভয়াবহরূপে চিত্রিত করাও ছিল তার নীতির অঙ্গ। রুশ-ভল্লুকের থাবা ভারতের দিকে লক্ষ্য করেই সদা উদ্যত,—এরূপ একটা অমূলক ভয় ভারতবাসীর মনে বদ্ধমূল করে দেবার চেষ্টা ছিলো প্রচ্ছন্ন। অবশ্য এর পশ্চাদ্‌পট ইঙ্গ-সোবিয়েৎ বিরোধের ব্যাপকতর ক্ষেত্র। কিন্তু ভারত ও রাশিয়ার সাধারণ লোকের সঙ্গে এর সম্পর্ক কতটুকু? এবিষয়ে নেহরু ছিলেন অতিমাত্রায় সচেতন। তা-ই 'রুশ-জুজু'র ভীতি ছড়িয়ে দেবার বৃটিশ কারসাজিকে বিদ্রূপ তিনি করেছিলেন; করেছিলেন ভারত-রুশ সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য গড়ে তোলার পক্ষে মতপ্রকাশ। আরো বলেছিলেন যে সু-প্রতিবেশীরূপে বসবাস করা উভয় দেশবাসীর কর্তব্য; আর তাদের ভেতরকার বিরোধের ক্ষেত্র কমিয়ে আনা। অর্থাৎ ঘৃণা ও বিসম্বাদ নয়, নেতিবাচক দিক আদৌ নয়। প্রেম ও প্রীতি দিয়ে হৃদয় জয় করা,—মন দেয়া-নেয়া। মানুষে-মানুষে ও জাতিতে-জাতিতে মিলনের অকৃত্রিম ও প্রশস্ত ভিত্তি এ-ই। যা' গান্ধিজীর শিক্ষার গোড়ার কথা।

মূলত নেহরু-দৃষ্টিকোণের কোন বদল হয়নি কালের এ-দীর্ঘ ব্যবধানেও; শুধু রকমফের হয়েছে মাত্রার। তা-ই '৫৪ সালে যখন দ্বিতীয়বার সোবিয়েৎ ভূমি দেখার আমন্ত্রণ এলো রুশ সরকারের কাছ থেকে, তখন আন্তর্জাতিক পরিবেশ নানা দিক দিয়ে জটিল ও ঘোরালো। দুটো বিরোধী শিবিরের মধ্যে মন কষাকষি ও তিক্ততার চরম পর্যায়। ঠাণ্ডা লড়াই গরমে এবং গরম গোলা-গুলি ছোড়ায় পর্যবসিত হবার উপক্রম। কিন্তু নিজ নিজ সীমাবদ্ধতা ও আণবিক যুদ্ধের পরিণাম শংকায় কেউ এগোতে নারাজ। অথচ দু'পক্ষের ভেতর ভুল বুঝাবুঝির অবসান ঘটানো, প্রীতির সম্পর্ক নতুন করে স্থাপন করাও দরকার। কিন্তু উভয় দলকে নিকটতর করার

উপযোগী কে? এক আছে জোট-বিরোধী, স্পষ্টবাদী ও অন্য-নিরপেক্ষ ভারত। কিন্তু তা'র প্রতি মনে মনে প্রবল প্রতাপান্বিত মহল খুশী নয়; না হলেও নাচার। উভয়ের প্রয়োজনে তা'র সহযোগিতা ও সাহায্য দান। এখানেই তার ভূমিকার স্বীকৃতি ও গুরুত্ব। অথচ গণতন্ত্রী জোটের দাবী: রফার প্রারম্ভিক ধাপ হিসাবে রাশিয়াসহ পূর্ব য়ুরোপের লৌহ যবনিকার অন্তরালবর্তী (Iron Curtain Countries) দেশগুলোর * যবনিকা উত্তোলন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অর্থাৎ ফয়সালা করতে হলে তোমাদের পর্দা তোল, মনের দরজা খোল। এ-দাবী অন্যায্য নয়। রাশিয়াও এর যৌক্তিকতা যে প্রকারান্তরে মেনে না নেয় এমন নয়। কিন্তু অন্তরায় নিজ ঘরোয়া প্রশাসনিক ও দলীয় বিধিব্যবস্থা। সেই কঠোরতা শিথিল করে আর ঘরোয়া চাহিদা শান্তির তৃষ্ণা কিছুটা মিটিয়ে তবে নেহরুকে নিমন্ত্রণ। কিন্তু নানা বাধাবিপত্তি হেতু প্রায় এক বছর পর '৫৫ সালের জুন মাসে এ-আমন্ত্রণ রক্ষায় সোবিয়েৎ দেশে তাঁর যাত্রা।

বলা বাহুল্য, তাঁর আগেরকার ও এবারকার যাত্রার মধ্যে উদ্দেশ্যের পার্থক্য স্পষ্ট ও বিপুল। কিন্তু দু'য়ের অন্তর্নিহিত সুর

---

* পাদটীকা:—পূর্ব ও মধ্য য়ুরোপের পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব জার্মানী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, এবং আলবেনিয়া সাধারণত লৌহ যবনিকার অন্তরালবর্তী দেশ বা রুশ-তাঁবেদার দেশ বলে গণতন্ত্রী জোট কর্তৃক অভিহিত। এদের জনসংখ্যা ১০ কোটির মতো। গত মহাযুদ্ধে এসব দেশ মুখ্যত রুশ সাহায্যে নাৎসী কবল থেকে মুক্তি পায়। স্বাভাবিক ভাবেই যুদ্ধান্তে এসব দেশে কমবেশি রুশ সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও বৈষয়িক আদর্শ রূপায়িত করার চেষ্টা হয়। তা' ছাড়া এসব দেশে সাহায্যকারী শক্তিরূপে রুশ সেনা মোতায়েন। আবার '৫৩ সালে ওয়ারশ চুক্তির পর অনিবার্যরূপে রুশপ্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধির দিকে। এটা পশ্চিমী সমরসংস্থা (NATO) 'ন্যাটো'-বিরোধী ব্যবস্থার অঙ্গ। তা-ই প্রতিরক্ষার তাগিদে এসব দেশে পশ্চিমী প্রবেশ নিষিদ্ধ: কাজেই ঘোর রহস্যাবৃত বলে সংশয় ও সন্দেহ।

এক : প্রেম, প্রীতি ও সৌহার্দ্য। তখন ছিল নিজ তাগিদ : মুক্তিকামে সংগ্রামীরূপে তীর্থ দর্শনের অভিলাষ; সমাজতন্ত্রবাদের প্রথম প্রতিষ্ঠা ভূমি ও শিল্প-বিজ্ঞানের সামাজিক যৌথ প্রয়োগক্ষেত্র থেকে প্রেরণা-লাভের আকাঙ্ক্ষা। অন্যদিকে এবার তাগিদটা রাশিয়ার নিজের—আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমনে সাহায্য ও সহযোগিতা যাচ্ঞা। কিন্তু এবারও তীর্থযাত্রী রূপেই* তা'র 'নিষিদ্ধ দেশে' যাত্রা। যে পাঁচসালা পরিকল্পনা রূপায়ণের ওপর ভারতের গণতান্ত্রিক পরীক্ষার সাফল্য নির্ভরশীল, সে-পরিকল্পনা তো রাশিয়ার পাঁচসালা পরিকল্পনারই অনুসৃতি। তাঁ'র অভিজ্ঞতা থেকে ভারত শিক্ষা লাভে উৎসুক। তা'র শিক্ষা, শিল্পায়ন, কৃষি, সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাধনার চরমোৎকর্ষের ফল ভারতের জীবনযাত্রায় সার্থক প্রয়োগের প্রয়োজন বর্তমান কালে সবচেয়ে বেশি। কাজেই বিশ্ব রাজনীতির গহন বনে দিশাহারা বিশ্ববাসীকে পথের খোঁজ দেয়াই শুধু নয়, তিমির তীর্থভিসারীরূপে আর জাতীয় স্বার্থ-পূরণের সর্বোত্তম উপায় হিসেবেও এ-আমন্ত্রণ গ্রহণ ভারতের ভাবী কল্যাণ-সূচক।

'৫৫ সালের ৫ই জুন বেলা ৬টায় বোম্বাই থেকে বিমানযোগে শ্রীনেহরু মস্কো যাত্রা করেন। সঙ্গে কন্যা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাধারণ সচিব শ্রীএন আর পিলাই ও যুগ্ম সচিব আজিম হুসেন, আর একান্ত সচিব শ্রীএন কে শেষণ। বিমানে আরোহণের আগে উপস্থিত সাংবাদিকদের শ্রীনেহরু বললেন, "আমি ভারতীয় জনসাধারণের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী বয়ে নিয়ে চলেছি।" আগের দিন পুনার জাতীয় প্রতিরক্ষা শিক্ষালয়ের শিক্ষার্থীদের এক

---

* **পাদটীকা**:—৭ই জুন ('৫৫ সাল) শ্রীনেহরু মস্কো পৌছেন। বিমান-ঘাটিতে রাশিয়া পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে বিবৃত ক৻. তিনি বলেন, "আমি একজন তীর্থযাত্রী। স্বদেশের জন্য ঐশ্বর্য আর শান্তির সন্ধানে আমি এখানে এসেছি। আমার বহু-কাঙ্ক্ষিত বাসনা পূর্ণ হয়েছে।"

সভায় তিনি বলেন, "ভারতবাসীর শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার বাণী বহন করাই সোবিয়েৎ রাশিয়া তথা অন্যান্য দেশ পরিভ্রমণের আমার উদ্দেশ্য। মস্কো বা অন্য কোন রাষ্ট্রের রাজধানীতে কোনো বিশেষ কাজ নিয়ে আমি যাচ্ছি না বটে; কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য নিয়ে যাচ্ছি। তা' হচ্ছে রাশিয়া ও অন্যান্য দেশের নিকট ভারতের শান্তি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার বাণী নিয়ে যাওয়া। নয়াদিল্লী ত্যাগের পূর্বে রাষ্ট্রপতি আমাকে এ কথাটি বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন। ভারতের বাণী—সংগ্রামের বাণী নয়; তা শান্তি ও মৈত্রীর বাণী।" আবার ৫ই রাতে কায়রো পৌঁছে সাংবাদিকদের বলেন, "স্বাভাবিক ভাবেই রুশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বিশ্বশান্তি স্থাপনের বিষয় আলোচনা হবে। উত্তেজনা প্রশমনের কাজই হবে প্রথম। আমাদের কোন বিস্ময়কব কর্মপদ্ধতি নেই। তবে মনে হয়, ধীরে ধীবে উত্তেজনা কমে আস্‌লে কাজ সহজ হবে। আশার কথা, গত ২।৩ মাসে যুবোপ ও পূর্ব এশিয়ায় উত্তেজনার ভাব কিছুটা কমেছে।" তিনি আরও বলেন, "যেসব দেশে যাবো, সে সবের সাথে ভাবতের ভবিষ্যৎ বাণিজ্যিক ও বৈষয়িক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় আলোচনা করবো।" কাজেই মুখ্যত শান্তি স্থাপন ও গৌণত ভারতের মঙ্গলের পথ প্রশস্ত করাই তাঁ'র মস্কো অভিযানের উদ্দেশ্য।

তাঁ'র ভ্রমণসূচীর মেয়াদ মোট ৩৭ দিন। এর ভেতর ১৬ দিন খোদ রাশিয়ায়, ৩ দিন পোল্যাণ্ড ও ৭ দিন যুগোশ্লাভিয়ায়; আর ভ্যাটিক্যান, রোম, লণ্ডন ও কায়রোতে বাকি দিনগুলি অতি কর্মব্যস্ততার মধ্যে যাপন এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। এখানে বলা দরকার, যুদ্ধকালে মিত্র সংগ্রহে বৃটেনের তৎকালের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চার্চিল পৃথিবীর নানা দেশে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ছুটে বেড়িয়েছেন। তা-ই তিনি পৃথিবীর সর্বাধিক ভ্রমণকারী প্রধান মন্ত্রীরূপে স্বীকৃত। কিন্তু শান্তি দূতরূপে যিনি নতুন ও পুরাণো পৃথিবীর যে কোন দুর্গম

প্রান্তেও যেতে কুণ্ঠিত নন, তিনি শ্রীজওহরলাল নেহরু। এ বিষয়ে তিনি একক ও অদ্বিতীয়।

কায়রো থেকে রোম ও প্রাগ হয়ে ৭ই জুন তিনি মস্কো পৌঁছেন। পথিমধ্যে যে অভিনন্দন পান, তা' স্বতঃস্ফূর্ত হলেও অভাবনীয়। কিন্তু সবচেয়ে আশাতীত মস্কোর অভ্যর্থনা। এজন্যে অবশ্য পূর্বায়োজন ছিল যথেষ্ট। বেতার, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, প্রদর্শনী ও নানা জনসংযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে মান্য অতিথির সম্বর্ধনায় পথ করা হয় প্রশস্ত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৪ঠা জুন মস্কো বেতারের ভারত সম্পর্কিত প্রচারের কথা বলা যায়। এতে ঘোষণা করা হয়, "শ্রীনেহরু বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনীতিবিৎ। ** রুশ নাগরিকগণ তাঁর আগমণের দিন গুণছে। এর ফলে উভয় দেশের সাধারণের মধ্যে মৈত্রাবন্ধন দৃঢ়তর হবে। ** বহু শতাব্দীস্থায়ী প্রীতি ও সৌহার্দ্য, বৈষয়িক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে হবে মজবুত। এদিকে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সংযোগ বাড়ছে। ভারতীয় লেখক, শিল্পী ও চলচ্চিত্র তা-ই রুশদের এত প্রিয়।" এমনকি শ্রীনেহরুর মস্কো পৌঁছার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও মস্কো বেতারে তাঁ'র আসার কথা সকলকে মনে করিয়ে দেয়া হয়। আবার সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধে ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রগতির ধারা সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও করা হয়। এ সবার সামগ্রিক ফলস্বরূপ শ্রীনেহরুকে যেরূপ অশ্রুতপূর্ব অভ্যর্থনা করা হয়, তা' শুধুই নীরস কর্তব্য পালন বা বিদেশীকে ধোঁকা দেয়ার আয়োজন নয়; এতে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতা ও উদ্দীপনাও প্রত্যক্ষ। তা-ই ৭ই জুন যখন জনোৎসাহ চরমে পৌঁছে, তা'তে প্রাণের স্পর্শ ও সাড়া মিলে অপরিমেয়। সেদিন মস্কোর জনসাধারণের এতো দিনের অনুশীলিত শৃঙ্খলাবোধ ও সংযমের বাঁধ ভাঙ্গে। উদ্বেলিত জনসমুদ্র প্রধান মন্ত্রীকে সম্ভাষণ জানাতে পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করে যায় এগিয়ে। রুশ নেতৃবৃন্দ ও পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা অসহায়

দর্শকমাত্র। তা'ছাড়া বিমান বন্দর থেকে সহরগামী ৪ মাইল দীর্ঘ পথের দু'ধারে অপেক্ষমান আনন্দমুখর জনতার সে-কী চাঞ্চল্য! কেউ গায় নেহরু-প্রশস্তি, কেউ দেয় হাততালি; কেউ বা রুশ প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন সহ চলিষ্ণু খোলা গাড়ীতে প্রত্যভিবাদনরত নেহরুর ওপর করে পুষ্পবৃষ্টি। আবার সহরে প্রচণ্ড ভীড়; তারই ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে পথ করে ধীরে চলে অতিথির খোলা গাড়ী। তাঁকে ও কন্যা ইন্দিরাকে করা হয় প্রাণান্তকর সানুরাগ আপ্যায়ন। সারা পরিবেশ হয় নেহরুময়। এ এক অলৌকিক কাণ্ড বটে।

এমন দৃশ্য রাশিয়ায় বিরল, অভিজ্ঞতাও নতুন। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেসব কীর্তিমান রাষ্ট্রনায়ক রাশিয়া পরিদর্শনে গিয়েছেন, তাঁদের ভাগ্যেও জোটেনি এহেন রাজোচিত আদর আপ্যায়ন। যে-মহাচীন রাশিয়ার সর্বোত্তম মিত্র ও একই পথের পথিক, তা'র রাষ্ট্রপতি মাও সে-তুং অথবা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন লাই-ও এমন খাতির পাননি। কিন্তু নেহরুর বেলায় নানা জায়গায় ঘটেছে একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। এটা নিছক ব্যক্তিগত মহিমা ও কৃতিত্বের আকর্ষণ নয়ঃ অথবা রাষ্ট্রিক নির্দেশ-তাড়িত জনতার গড্ডলিকা প্রবাহও নয়; অথবা বিদেশী অতিথির প্রতি নিয়মমাফিক কর্তব্য পালন নয়। এর আসল হেতু অন্যত্র নিহিত। সত্য বটে রুশ জনসাধারণ একটা বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ ও কর্মধারার মধ্যে মানুষ; এও সত্য তারা বাঁধাধরা গণ্ডীর ভেতর চল্‌তে অভ্যস্ত। কিন্তু এসব সত্ত্বেও রক্তমাংসে গড়া সাধারণ মানুষ বই কিছু নয়। রাষ্ট্রিক কারণ-সম্ভূত বিদেশীদের প্রতি তাদেব যে সংশয়—যা' কর্তাব্যক্তি থেকে সকলের নীচের স্তর পর্যন্ত সংক্রামিত—তা' তাদের অন্তরের পরিচয় নয়, বাইরের খোলস মাত্র। অর্থাৎ একনায়কবাদী শাসনের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায়ও তা'রা যন্ত্রে পরিণত হয়নি। অন্তত নেহরু-সম্বর্ধনার উচ্ছলতা, আতিশয্য ও দিগ্বিদিগ্-

জ্ঞানশূন্যতায় তা' প্রত্যক্ষ। রুশরা যেই জেনেছে যে, এ-লোকটি (নেহরু) শান্তিপ্রিয় ও শান্তিকামী, তাদের হিতৈষী, তখনই ভিন্ন রাষ্ট্রীয় আদর্শ সত্ত্বেও ভারতীয় নেতাকে আপনার জন বলে চিন্‌তে ও মেনে নিতে তাদের দেরি হয়নি। তা'ছাড়া, অন্য দেশের মতো রুশ নরনারীও শান্তিপিপাসু ও যুদ্ধবিরোধী। কাজেই জোট ও যুদ্ধ-বিরোধী মুখপাত্রের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের জলতরঙ্গ। পরমাত্মীয় রূপে প্রীতি ও প্রেমের এমন মাখামাখি ও ছড়াছড়ি।

রাশিয়ায় নেহরুর মোট স্থিতিকাল ১৬ দিন—৭ই থেকে ২৩শে জুন অবধি। কিন্তু এর ভেতর মাত্র দশ দিন—১১ই থেকে ২১শে জুন—কন্যা ইন্দিরা সহ সদলে সোবিয়েতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের ঐতিহাসিক স্থান, শিক্ষাকেন্দ্র, বিজ্ঞান পরিষৎ, বিভিন্ন সংগঠনী পরিকল্পনা, সরকারী ও যৌথ খামার, কৃষিক্ষেত্র, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক নানা সংস্থা প্রত্যক্ষ করেন। তবে প্রধানত সকলের অগোচর ও অগম্য শিল্পাঞ্চল ও আণবিক গবেষণা কেন্দ্র দেখাই ছিলো তাঁর অন্যতম মুখ্য কাজ। এজন্যে য়ুরোপ ও এশিয়ায় বিস্তৃত এলাকায় ছড়ানো ১৬টি সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্রের * মধ্যে বেশির ভাগেই তাঁ'কে যেতে হয়। যে-রাশিয়ার পূব থেকে পশ্চিমে বিস্তার ৬ হাজার মাইলেরও বেশি, আর উত্তর দক্ষিণ বিস্তার ২৭ শ' মাইল (মোট এলাকা ৮৫,৯৭,০০০ বর্গ মাইল), তা'তে

---

* **পাদটীকা**:—'৫৬ সালের ১৬ই জুলাই কারেলো-ফিনিশ প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব লোপের সংবাদ ঘোষিত হয়েছে। হলেও রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্যতম স্বায়ত্তশাসনশীল 'ইউনিট' রূপে গণ্য হবে। সোবিয়েৎ ইউনিয়ন বর্তমানে মোট ১৫টি প্রজাতন্ত্র নিয়ে গঠিত; যথা (১) রাশিয়া (২) য়ুক্রেন (৩) বায়েলো-রাশিয়া (৪) উজবেকিস্থান (৫) কাজাকিস্থান (৬) জর্জিয়া (৭) আজেরবাইজান (৮) লিথুয়ানিয়া (৯) মোলদাভিয়া (১০) ল্যাটভিয়া (১১) কিরঘিজস্থান (১২) তাজিকস্থান (১৩) আর্মেনিয়া (১৪) তুর্কমেনিস্থান ও (১৫) এস্তোনিয়া।

বিমানে ১৩ হাজার কিলোমিটার, আর মোটরে সহস্রাধিক কিলোমিটার স্থান ঘুরে বেড়ান আদৌ সহজ নয়।

য়ুরোপের আধা ও এশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে রাশিয়ায় অবস্থিতি। তা'র মোট ভূক্ষিগত বিস্তার সারা পৃথিবীর এক-ষষ্ঠাংশ স্থান। আগেকার দিন হলে কথাই ছিল না, এখনকার মানদণ্ডের বিচারেও এরূপ দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য পরিক্রমায় নানা বিষয়ের খুটিনাটি বিচার ও খোঁজখবর এক দুরূহ কাজ। বিশেষ করে তাঁর বয়স যখন ৬৫ বছর। যে-বয়স বাণপ্রস্থের সময়। কিন্তু অফুরন্ত তাঁর প্রাণশক্তি, অপরিমেয় উদ্যম। যে রুশ-জাতি দৈহিক ক্ষমতায় অদ্বিতীয় ও শ্রমে অকাতর, তা'রাও তাঁর জীবনীশক্তির বিস্ময়কর প্রকাশ দেখে অবাক্ না হয়ে পারেনি। উরাল পর্বতে বেড়াবার সময় একদিনের কথা উল্লেখ করা যায়। কুরিণ বা কুর্যা (Kurya) সরকারী খামারে যাবার ধূলিধূসর ২ শ' কিলোমিটার পথ। এই দীর্ঘ পথ মোটরে অতিক্রম করা হলেও সবাই শ্রান্ত। অথচ ঠিক তার পরদিনই সকালে তিনি ম্যাগ্নিটোগোরস্ক-এর জগদ্বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা ও বিকালে স্ভের্দলোভস্কের দৃশ্য দেখে কাল কাটান।

মস্কোকে কেন্দ্র করে ১১ই জুন পরিক্রমার সূচনা। এর আগের ক'দিন মস্কোর স্তালিন বিমান কারখানা, কৃষি প্রদর্শনী, মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, ৫৪৫নং মাধ্যমিক শিক্ষালয়, মেট্রো, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি প্রদর্শনী ও লেনিন-স্তালিন স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি স্থান তিনি দেখেন। তারপর সোজা মস্কো থেকে বিমানে স্তালিনগ্রাদ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যেখানে হিটলারী বিজয়বাহিনী ও রণকৌশলের সমাধি ঘটেছিল। এখানকার দ্রষ্টব্য কলের লাঙ্গল (ট্রাক্টর) নির্মাণ কারখানা, নির্মীয়মান ভলগার জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (নিপার বাঁধের তিন গুণ) আর স্তালিন-জারিৎজিন প্রতিরক্ষা সংগ্রহশালা। ১২ই কৃষ্ণসাগরের উষ্ণ উপকূলবর্তী ক্রিমিয়ার প্রসিদ্ধ ইয়ালতা।

রুশরা একে বলে থাকে 'রাশিয়ার মণি'। এখানেই হয়েছিল যুদ্ধকালে তিন প্রধান রুজভেল্ট-স্তালিন-চার্চিল বৈঠক ও চুক্তি স্বাক্ষর। ইয়ালতার যুবশিবির ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যাবাস দেখবার মতো। এখান থেকে ১০০ মাইল দক্ষিণে য়ুক্রেনের রাজধানী সিম্ফারোপল। স্তালিনগ্রাদ ও ইয়ালতার মধ্যবর্তী স্থান। ১৩ই জুন কৃষ্ণসাগরের পূর্ব-উপকূলে রৌদ্রস্নাত জর্জিয়ার রাজধানী তিফলিস। এখানকার দর্শনীয় স্থান ককেশিয়া এলাকায় ১১ বছর আগে স্থাপিত লৌহনগরী রুস্তাভীর ইস্পাত কারখানা, আর দিগোমি-র আঙ্গুর উৎপাদনের সরকারী যৌথ খামার। রুস্তাভী নগর গড়ার কাহিনী বিস্ময়কর। আগে এখানে ছিলো গভীর বন। কিন্তু রুশদের অশ্রান্ত প্রয়াসে গড়ে উঠেছে এই আধুনিক নগর। এর বর্তমান বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০ লক্ষাধিক টন ইস্পাত; '৫৭ সালের ভেতর উৎপাদনের পরিমাণ হবে দ্বিগুণ।

এর পর ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু। ১৪ই জুন মধ্য এশিয়া। প্রথম সংযোগ কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্বদিগস্থ তুর্কমেনিস্থানের রাজধানী আস্‌খাবাদ; সেখান থেকে উজবেকিস্থানের রাজধানী সুপ্রাচীন তাসখন্দ। এ-রাজ্য আফগানিস্থান, মহাচীন ও ভারতের সংলগ্ন। শুধু পৃথিবীর সর্বোচ্চ মালভূমি পামির দ্বারা বিচ্ছিন্ন। তবে স্থল-পথেও এ বিচ্ছেদ এখন সাময়িক মাত্র; যেহেতু বিমান-গম্য।* ১৫ই জুন ২ শ' মাইল দূরে দ্বিতীয় বড়ো সহর সমরখন্দ। এ-নামের সঙ্গে ভারতবাসীর পরিচয় বহুদিনের। এ প্রাচীন সহর বহু স্মৃতি-জড়িত। ইতিহাসে নির্মম পুরুষ বলে কুখ্যাত তৈমুরলঙ্গের ছিল একদা রাজধানী। এখান থেকেই বহুবার ভারতের দিকে বহু অভিযান চালিত হয়, যা'র ফলে সোনার ভারত হয়েছিল লণ্ড-ভণ্ড শ্মশান। আবার একদা এখান থেকেই বিদ্বান ও পণ্ডিতগণ ভারত

* **পাদটীকা**:—সোবিয়েৎ এশিয়া থেকে ভারত-সীমান্তের দূরত্ব মাত্র ৯ মাইল। এর ভেতর চারমাইল আবার আফগানিস্থানের পার্বত্য এলাকা।

যাত্রাও করেছিলেন। এসত্ত্বেও সমরখন্দ মনোরম। এখানকার প্রাচীন কীর্তি—তৈমুরলঙ্গের স্মৃতি ও তাঁর পৌত্রের রাজপ্রাসাদ, আর বহু পুরাণো এক মানমন্দির বৈশিষ্ট্যময়। অন্যদিকে তাসখন্দ এলাকায় ইয়াং-ই-উল জেলায় স্তালিন যৌথ খামার ও উজবেক বিজ্ঞান পরিষৎ স্মরণীয় কীর্তি।

মধ্য এশিয়ায় উজবেকিস্থান, কাজাকস্থান, তাজিকিস্থান, কিরঘিজিয়া বা কিরঘিজিস্থান ও তুর্কমেনিস্থান উল্লেখযোগ্য সোবিয়েৎ প্রজাতন্ত্র। এসবের সাকুল্য আয়তন ৪ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল ও জনসংখ্যা মাত্র ১ কোটি ৭০ লক্ষ। এখানে এখনও বর্তমানের চেয়ে দশগুণ সোবিয়েৎ নাগরিকের বসবাসের সংস্থান হতে পারে। এসব এলাকা উষর ও স্বভাবতই পশ্চাদ্‌পদ ; রাশিয়ার বিশাল মরুপ্রান্তে অবস্থিত। একদা জার আমলে ছিলো নিতান্তই উপেক্ষিত ; কাজেই শিক্ষাদীক্ষা ও বিভবে হীন ; অধিবাসীরা দীনের চেয়ে দীন ও ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু কম্যুনিষ্ট শাসনে সেই এলাকা ও তাদের অধিবাসীদের যে-বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত পুনরুজ্জীবন হয়েছে, তা'র কাহিনী যুগপৎ বিস্ময় ও রোমাঞ্চকর।

প্রথমে উজবেকিস্থানের কথা ধরা যাক। এর অধিবাসীদের শতকরা ৮০ জন মুসলমান ; উর্দু জানে। আগে শতকরা ১ জনের অক্ষরজ্ঞান ছিলো ; এখন নিরক্ষর বলতে কেউ নেই। আফগানিস্থানের সীমান্তে অবস্থিত। আয়তন ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বর্গমাইল ; কিন্তু লোকসংখ্যা মাত্র ৬৫ লক্ষ। রাজধানী তাসখন্দ মধ্য এশিয়ার বৃহত্তম শহর ; ইতিহাসখ্যাত সমরখন্দ ও ইসলাম সংস্কৃতিকেন্দ্র বোখারা এর অন্তর্ভুক্ত। তূলা উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত। মধ্য এশিয়ার সব ক'টি প্রজাতন্ত্রে যে পরিমাণ তূলা জন্মে, এখানকার সাকুল্য পরিমাণ তাদের চেয়ে বেশি। আগে ছোটখাট তূলাপেঁজা কারখানা ছাড়া কোন শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না। এখন গড়ে উঠেছে কাপড় ও রেশমের কল, ফল সংরক্ষণ ও আঙ্গুরের মদ তৈরীর কারখানা।

তা'ছাড়া, জলসেচের জন্য খালখনন ও ফর্কছাদ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণে এখানে গুরু শ্রমশিল্পের হয়েছে পত্তন। গত ১৫ বছরে সহস্রাধিক ছোটবড় শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে, তেম্নি চলেছে নতুন শহর নির্মাণ, আর উষর অনাবাদী পতিত জমিতে চাষাবাদ। আবার এখানে উচ্চশিক্ষার অতি দ্রুত ব্যাপক প্রসার ঘটছে। ২টি বিশ্ববিদ্যালয় সহ ৩৬টি উচ্চ শিক্ষা পরিষৎ ও উজবেক বিজ্ঞান পরিষদের অধীনস্থ ৯৫টি বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা স্থাপন এক অভাবনীয় ঘটনা। এসব ছাড়া, সারারাজ্যে সাংস্কৃতিক উন্নয়নে সাড়ে তিন হাজার ক্লাব ও সংস্কৃতি সংঘ, আর প্রায় ২ হাজার গ্রন্থাগার রয়েছে। মোট ১৪৭টি সংবাদপত্র ও ১৫টি সাময়িক পত্রের প্রচারও উল্লেখযোগ্য। আগে উজবেক-নারীরা ছিলো দাসীবাঁদী, ক্রীতদাসীর সামিল। এখন সর্বত্র পুরুষের সহযোগী ও প্রতিযোগী; ১৮ হাজার শিক্ষিকা, চার হাজার ডাক্তার আর তিন হাজার নারী এঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রশিল্পী কর্মরত। অচলায়তনে বন্দী নারীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি, শিক্ষাসংস্কৃতির প্রসার ও শিল্পবিপ্লব—এ-ত্রিবেণী সঙ্গমে মধ্য এশিয়ার জাগরণ আজ সার্থক।

কাজাকস্থান মরুময়, জন-পরিত্যক্ত বন্ধ্যা উষর এলাকা। আয়তনে সোবিয়েৎ ইউনিয়নে দ্বিতীয়, আর সম্মিলিত ইতালী ও ফ্রান্সের চেয়েও বড়ো। আগে ছিল যারপরনাই অভাবী ও নিরক্ষর; দৈন্যের ছাপ সর্বাঙ্গে। লোকসংখ্যা ৬২॥ লক্ষের মতো। বিপ্লবের আগে জনসমষ্টি ছিলো যাযাবর পশুপালক; প্রকৃতির নির্মম খেয়ালখুশীর ওপর একান্ত নির্ভরশীল, তাই ক্ষয়িষ্ণু উচ্ছিন্নপ্রায়। এখন বিজ্ঞানের মায়াবী স্পর্শে এ-অঞ্চল সম্পন্ন। জল ও জনশূন্য স্তেপ তৃণাঞ্চলে গড়ে উঠেছে যৌথ খামার ও পশুপাখী পালনক্ষেত্র; দেশময় শিক্ষা ও সংস্কৃতি সদন। তূলা, বীট ও তৈল কারখানা, সোনা, তামা, সীসা ও কয়লা (রাশিয়ায় ৩য় স্থান) প্রভৃতি আবিষ্কার ও সদ্ব্যবহারে হয়েছে শিল্প-সমৃদ্ধ। জনহীন প্রান্তরে পত্তন হয়েছে শিল্পনগর কারাগণ্ডার। লৌহ

ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠা, আর জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহে সমগ্র কাজাকস্থান প্রাণচঞ্চল। এসত্বেও এখানকার প্রাচীন ধারাবাহী সংস্কৃতি, ভাষা ও চালচলনের প্রচলনে জাতীয় ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। কাজাকী কবি, গায়ক, শিল্পী, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, যাত্রা ও থিয়েটার আজ সারা রাশিয়ায় খ্যাত। এখানকার বিজ্ঞান পরিষৎ ও বিজ্ঞানীদের খ্যাতিও কম নয়। এর রাজধানী আলমা-আটা; সোবিয়েৎ রাশিয়ার সংস্কৃতিকেন্দ্র। অধিবাসী-সংখ্যা মাত্র আড়াই লাখ হলেও ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩টি কলেজ, ১৫টি কারিগরী বিদ্যালয়, সংগ্রহশালা, চিত্রশালা, থিয়েটার ও চলচ্চিত্রে সমৃদ্ধ।

এখানে প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। জার শাসনে বহু খণ্ড জাতি বা জাত্যাংশ বা নামগোত্রহীন গোষ্ঠির বিনাশের সম্ভাবনা প্রবল হয়েছিল। এসব ক্ষয়িষ্ণু ও অর্ধ-বিস্মৃত যাযাবরদের একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি, ভাষা, বর্ণমালা, শিক্ষা ও ঐতিহ্য ছিল। নিজেদের অস্তিত্বলোপের আশংকার সঙ্গে এসবের নাশও ছিলো অবধারিত। কম্যুনিষ্ট আমলে এদের বৈষয়িক পুনর্বাসনই শুধু ঘটানো হয়নি, সুস্থ জীবনযাত্রার অপরিহার্য অঙ্গরূপে তাদের বিশিষ্ট প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ভাষাও পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে; করা হয়েছে নিরবয়ব বর্ণমালাকে লিখিত ভাষায় রূপান্তরিত। এরূপ রূপায়িত বর্ণমালার মোট সংখ্যা ৪০টি। আবার অনুন্নত ও অনগ্রসর এলাকায় জনকীর্তি ও সভ্যতার নিদর্শনগুলোও যেমন সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে, তেমনি হচ্ছে শিল্প, বিজ্ঞান ও সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনের একটা সামগ্রিক চেষ্টা। অথচ রাশিয়ায় regimentation বা এক ছাঁচে ঢালাইএর প্রবৃত্তি রাজনীতিক্ষেত্রে থাকলেও সামাজিক অভ্যুন্নতি ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারায় প্রত্যেকের গোষ্ঠি বা জাতিগত প্রতিভা ও ঐতিহ্যকেই সর্বাংশে স্বীকৃতি ও প্রাধান্য দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এটা সোবিয়েতের সংবিধানেই স্বীকৃত। আবার রাশিয়ায় ভাষাগত

সংখ্যালঘু সমস্যা মিটাবার চেষ্টাও আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণযোগ্য। রাশিয়ার ১৬টি প্রজাতন্ত্রে (এখন ১৫টি) যেসব ভাষাগত সংখ্যালঘু এলাকা আছে, তাদের অভাব অভিযোগ সংখ্যাগুরুর চাপে তলিয়ে যাতে না যায় এমন সাংবিধানিক রক্ষাকবচ রয়েছে। এরা প্রতিটি ইউনিয়ন রিপাব্লিকে আত্মকর্তৃত্বশীল। এদের বলা হয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারপ্রাপ্ত (Autonomous) প্রজাতন্ত্র। '৫১ সালে এদের মোট সংখ্যা ছিল ১৬টি। এরা প্রত্যেকে সুপ্রীম সোবিয়েতের উর্ধতন পরিষদে ১১ জন করে প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকারী। এতেও সমস্যা একেবারে মিটেনি। কাজেই ভাষার দিক দিয়ে বেশি নয় অথচ যাদের দাবী উপেক্ষনীয়ও নয়, তাদের নিয়ে ইউনিয়ন রিপাব্লিকেই গঠন করা হয়েছে স্বাধিকারপ্রাপ্ত অঞ্চল (Autonomous region). '৫১ সালে এসবের মোট সংখ্যা ছিল ৯টি। এদের প্রতিটি সুপ্রীম সোবিয়েতের উর্ধতন পরিষদে ৫ জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। এদের প্রত্যেকের লোকসংখ্যা এক থেকে আড়াই লাখ। এসব ব্যবস্থার পরও বহু বিশিষ্ট স্বভাবের ক্ষুদ্র পৃথকভাষী জন-সমষ্টির জন্য জাতীয় এলাকা (National Area) গঠন করা হয়েছে। সুপ্রীম সোবিয়েতের উর্ধতন পরিষদে বা Soviet of Nationalties-এ এদের প্রত্যেকে এ. জন করে প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। বলা-বাহুল্য, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোকে নিজেদের মতামত প্রকাশের সুযোগ দেবার জন্যেই এ-ব্যবস্থা। '৫৪ সালে এদের সদস্যসংখ্যা ছিলো ৬৩১ জন। পক্ষান্তরে নিম্ন পরিষদ বা Soviet of the union-এর সদস্যসংখ্যা ৭০০ জন। তবে উভয় পরিষদের ক্ষমতাই সমান। এতে করে সংখ্যালঘু সমস্যারই সুমীমাংসা হয়নি, শাসকশ্রেণীও সংখ্যালঘুদের আস্থা ও আনুগত্য পেয়েছেন। এ-ব্যবস্থা রাশিয়ার সংহতি ও কল্যাণের সর্বোত্তম পোষক। আর পৃথিবীর সকল কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে বিশেষ শিক্ষনীয়।

পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক্। কী করে রাশিয়ার অনাবাদী বিস্তীর্ণ এলাকাকে অতি অল্প সময়ে কর্ষণযোগ্য করা হয়েছে ও তাতে আশাতীত ফসল ফলান হয়েছে, তা' দেখবার জন্যে ১৬ই জুন সদলে শ্রীনেহরু তাসখন্দ থেকে বিমানে চীনের সিংকিয়াং প্রদেশের উত্তরবর্তী আলতাই এলাকায় অবস্থিত রুবৎসোভস্ক শহরে পৌঁছেন। পথে কাজাকস্থানের রাজধানী আলমা-আটা।

রুবৎসোভস্ক সহর গড়ে ওঠার কাহিনীও আশ্চর্যজনক। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এটা ছিলো তুর্কেস্থান-সাইবেরিয়ান রেলপথের ধারে ছোট একটা স্টেশনমাত্র। অথচ জার্মান গ্রাস থেকে রেহাই পাবার জন্যে য়ুক্রেনের খারখভ সহরের বিখ্যাত ট্রাক্টর কারখানাটিকে আস্ত অক্ষত অবস্থায় স্থানান্তর করার পর এটা একটা শিল্প নগবে পরিণত হয়। একে ভিত্তি করেই পরে এখানে আলতাই ট্রাক্টর কারখানা, কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা ও ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা গড়ে উঠেছে। এখন এখানকার জনসংখ্যা এক লাখ; আর দুটো কারিগরী বিদ্যালয়, একটা শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ, একটি-এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, থিয়েটার, কয়েকটি সিনেমা প্রভৃতিও স্থাপিত হয়েছে।

রুবৎসোভস্ক শহরে পৌঁছেই সোবিয়েতের অনাবাদী জমি চাষ পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ করার জন্যে শ্রীনেহরু আগ্রহ প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গেই দু' ঘণ্টায় তাঁকে মোটরে করে ১ শত কিলোমিটার দূরবর্তী কুরিণ (Kurya or Kubrinisky state Farm) সরকারী দানাশস্যের খামারে নিয়ে যাওয়া হয়। মাত্র এক বছরের চেষ্টায় দক্ষিণ রাশিয়ার সাইবেরিয়া প্রান্তে সীমাহীন পতিত জমিকে করা হয়েছে গমের দিগন্ত বিস্তারী মনোলোভা হরিৎ ক্ষেতে রূপান্তরিত। চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কেন্দ্রীয় সরকার আহ্বান জানালেন রুশ নওজোয়ানদের—দেশের ফলন বাড়াতে হবে, স্তেপ তৃণ অঞ্চলের পতিত জমিতে সোনা ফলাতে হবে। তাতে সাড়া দিলো কেমেরোভো, মস্কো, তাম্বভ, লেনিনগ্রাদ ও অন্যান্য

এলাকার শ্রমদানীরা। এটা মাত্র '৫৪ সালের মার্চ মাসের কাহিনী। তারা প্রথম বসন্তেই ২০ হাজার একর পরিমিত অনাবাদী জমিতে কলের লাঙ্গল দিয়ে প্রথম চাষ করে, ৩ হাজার একর জমিতে গমের বীজ ছড়ায়। হেমন্তে পাওয়া গেলো অপর্যাপ্ত ফসল ; নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে সরকারী খামারে জমা দেয়া হলো ১ লক্ষ ২০ হাজার পুড্স (এক Pood=৩৬ পাউণ্ড) গম। আবার বীজ বোনা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যুগপৎ বাড়ী তৈয়ারী ও আসন্ন খন্দের জন্যে তারা তৈয়ার হয়। এ ভাবেই মাত্র '৫৫ সালের জুন মাসে নতুন গাঁয়ের প্রথম বাড়ীর ভিত স্থাপিত হয়। এখন সেটা পরিণত হয়েছে এক ছোটখাট শহরে। এখানে আছে এক হাসপাতাল, একটি পাঠাগার, একটি বিত্যালয়, আছে বৈদ্যুতিক আলো, রেডিও সেট ও সিনেমা।

এখানকার পত্তনী খামারগুলোর জন্য যে ব্যয়-বরাদ্দ হয় ও লাভ লোকসানের যে আনুমানিক হিসাব পাওয়া যায়, তা' বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। মোট তু' বছরে ('৫৪—'৫৫) খরচের জন্যে ১ কোটি ৬০ লক্ষ 'রুবল' মঞ্জুর হয়। কিন্তু সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রথম বছরেই ('৫৪) লাভ দাঁড়ায় ৪০ লক্ষ রুবল। দ্বিতীয় বছরে লাভ হবার কথা ১ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল। অর্থাৎ তু' বছরে যাবতীয় খাই-খরচা বাদেও সাকুল্য লাভের পরিমাণ ৭০ লক্ষ রুবল। এখানে চাষাবাদে ও খন্দে মোট ৯০টি ট্রাক্টর ও ৯০টি ফসল তোলার যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ কৃষি কাজেও চল্‌ছে পুরো যান্ত্রিক পদ্ধতির সফল প্রয়োগ।

এ-সরকারী খামার পরিদর্শনের সঙ্গে শ্রীনেহরুর রাশিয়া ভ্রমণের দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হয়। তারপর ১৭ই জুন সাইবেরিয়ার দক্ষিণ প্রান্তস্থিত উরাল পর্বতের আড়ালে নতুন গড়ে তোলা শিল্পনগর ম্যাগ্নিটোগোরস্ক-এ আগমনের সঙ্গে তাঁ'র ভ্রমণের তৃতীয় পর্ব শুরু। এশিয়া ও য়ুরোপের মাঝপথে দাঁড়িয়ে উরাল পর্বত ও উরাল নদী। এখানটা ছিল এককালে অনাদৃত, শ্বাপদ-সংকুল অরণ্যানী ও পশু

শিকারের আদর্শ ক্ষেত্র। কিন্তু রাষ্ট্রিক নিরাপত্তা, ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনা ও শিল্প বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বিবেচনা করে পরিকল্পনার প্রথম থেকেই এ-এলাকাকে রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম শিল্পাঞ্চলরূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থা হয়। এরই পরিণতি উরাল-কুজনেটস্ক শিল্পকেন্দ্র। পরিকল্পনা প্রণয়নে রুশ-নেতারা যে দূরদর্শিতা দেখান, দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় তা'র যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। তখন 'হ্বেরম্যাটে'র অশ্রান্ত বোমাবর্ষণে খোদ রাশিয়ার শিল্পাঞ্চল প্রায় ধ্বংসোন্মুখ, উৎপাদন বিঘ্নিত ও সঙ্কুচিত। সে-অস্তিত্ব সংকট মোচনে রাশিয়ার প্রধান বল-ভরসা ছিল সম্মুখ রণাঙ্গণের বহু পশ্চাতে অবস্থিত উরাল-কুজনেটস্ক-এর বৃহদায়তন শিল্পমণ্ডল। আবার যখন বিধ্বস্ত শিল্প ও নগর পুনর্গঠন, আর বৈষয়িক* পুনর্বিন্যাসের জরুরী প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখনো এ-এলাকার শ্রমশিল্প ও রুশ জনসাধারণের অপবাজেয় মনোবলই হয় উদ্ধারকর্তা। কিন্তু উরাল-কুজনেটস্ক শিল্পমণ্ডলীতে বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ। যেহেতু এদেব বিরাটত্ব ও উৎপাদন-ক্ষমতা গোপন ও নাশকতামুক্ত রাখাই এ-ব্যবস্থাব আসল উদ্দেশ্য। যুদ্ধের এতোদিন পরও এর রহস্য উন্মোচন করা হয়নি। এ-নিয়ে পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রী জোটের সত্য-মিথ্যা অভিযোগের অন্ত ছিলো না। কিন্তু শ্রীনেহরুর বেলায় বিদেশী সম্পর্কে প্রযুক্ত এ-বিধিনিষেধ সর্বপ্রথম প্রত্যাহৃত হয়। এহেন সম্মান অপ্রত্যাশিত না হলেও অভূতপূর্ব।

ম্যাগ্নিটোগোরস্কে বছরে ৪৫ লক্ষ টন ইস্পাত ও ৫০ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ-জাতীয় বিরাট কারখানা য়ুরোপের কুত্রাপি নেই। '২৮ সালে যখন এ-কারখানার পত্তন হয়, তখন এখানে

---

* **পাদটীকা**:—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারী আক্রমণে মোট ১'১০০টি শহর ও ৭০ হাজারের বেশি গ্রাম, ৩১৮৫০টি শিল্পসংস্থা আর ৬৫ হাজার কিলোমিটার পরিমিত রেললাইন ভস্মীভূত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। তা'ছাড়া, ৯৮ হাজার যৌথ খামার, ১৮৭৬টি সরকারী খামার এবং ২৮৯০টি যন্ত্র ও ট্রাক্টর কেন্দ্র লুঠ করা হয়। আর যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৭০ লক্ষ।

ছিলো মাত্র শ' তিন চালাঘর ও দু' একটা গীর্জার অস্তিত্ব। এখন এর জনসংখ্যা লাখ তিন। শ্রীনেহরু কারখানার প্রতি বিভাগের কাজকর্ম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন ও উৎপাদন-ক্ষমতা থেকে কর্মীদের বাসসমস্যা পর্যন্ত নানা প্রশ্নের অবতারণা করেন। এখানকার ম্যাগ্নিটায়া লৌহ খনির ধাতু নিষ্কাশন ব্যবস্থা দেখায়ও তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। এর অনুত্তোলিত ধাতুপিণ্ডের পরিমাণ ৮০ কোটি টনের মতো। গত ২০ বছরে মাত্র এর এক-তৃতীয়াংশ উত্তোলিত হয়েছে। এদুটো ছাড়া, এ-শিল্পনগরে বহু যন্ত্র ও মেশিনটুলের কারখানা আছে।

ম্যাগ্নিটোগোরস্ক ও স্ভের্দলোভস্ক সোবিয়েৎ যন্ত্রবিজ্ঞান ও শ্রম-শিল্পের চরমোৎকর্ষ ও মহান কীর্তি বলে স্বীকৃত। শেষোক্ত স্থানে স্থাপিত উরাল গুরুভার মূল যন্ত্রপাতি নির্মাণ কারখানা; সংক্ষেপে বলা হয়, উরালমাশ (Uralmash). এখানে ভারতের ভিলাই ইস্পাত কারখানার যাবতীয় যন্ত্রপাতি নির্মাণের ফরমায়েস দেয়া হয়েছে। চীনের আনশান লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান আর পোল্যাণ্ডের জগদ্বিখ্যাত নোভাহুতা ইস্পাত কারখানার সরঞ্জাম এখানে নির্মিত। কাজেই রাশিয়ায় যে বিরাট সৃজনাত্মক কর্মকাণ্ড চলছে, এ-কারখানা তা'র অন্যতম অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিরিশ বছর আগেও এ-অঞ্চলে ছিল ঘোর জঙ্গল,—হিংস্র পশুর অবাধ বিচরণ-ক্ষেত্র; শিকারীর পক্ষে স্বর্গতুল্য। কিন্তু আজ তা-ই রাশিয়ার বিশিষ্ট শিল্পাঞ্চলে পরিণত। এখানকার কারখানায় নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা ৩৬ হাজার; তাদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। এর বার্ষিক যন্ত্রপাতি উৎপাদনের পরিমাণ ১ লক্ষ ৪৮ হাজার টন। '২৮ সালে কারখানার ভিত পত্তন হলেও আসলে '৩৩ সাল থেকেই সরঞ্জাম নির্মাণ শুরু হয়। সারা রাশিয়ায় এ-জাতীয় এতোবড় কারখানা আর দু'টি নেই।

এখানে বলা দরকার, '২৭ সাল থেকে '৪১ সাল পর্যন্ত রাশিয়ায় শিল্পায়নের যে আয়োজন করা হয়, তা' সংখ্যা ও পরিমাণের দিক হ'তে অসাধারণ। এরি ওপর নির্ভর করে যুদ্ধের প্রথম ধাক্কা সামলে

নিয়ে তাকে পাল্টা আঘাত হান্‌তে হয়। আবার পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন প্রচেষ্টায়ও এর সাহায্য হয় সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এ-সময় যেসব বিপুলায়তন কারখানা গড়ে তোলা হয়, তা'দের ভেতর নিম্নোক্তগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য যথা :—ম্যাগ্নিটোগোরস্ক, স্ভের্দলোভস্ক, ইগারকে, আমুর তীরবর্তী কমসোমলস্ক, কোপিস্ক, জাপোরেঝায়ে, স্তালিনিগোরস্ক, বেরেজকী, মোচেগোরস্ক, ক্রাস্কোকামেস্ক, চিরচিক, কারাগণ্ডা, ভারাচেলী ও বালখাস। এসব রুশ সংগঠন প্রতিভার আশ্চর্য নিদর্শন।

রাশিয়ায় জার-আমলে গুরুভার শিল্প ছিল না এমন নয়। ছিল, তবে অল্পমাত্র। প্রধানত মস্কো ও লেনিনগ্রাদকে ঘিরে ছিল এর অস্তিত্ব। কিন্তু তখনকার রাশিয়া ছিল কৃষিপ্রধান। শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের দিক থেকে পৃথিবীতে তার স্থান পঞ্চম ও য়ুরোপে চতুর্থ। তবে '১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর য়ুক্রেনের খারকভ ও কিয়েভ এলাকায় নূতন শিল্প গড়ে তোলা হয়। এর পর '২৮-২৯ সালে রাশিয়ায় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সূচনা। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের বুনিয়াদস্বরূপ ব্যাপক শিল্পায়নের উদ্যোগ। এভাবে সুপরিকল্পিত উপায়ে রাষ্ট্রের পরিচালনায় ধনোৎপাদনের প্রথম আয়োজনে সারা বিশ্বের সোৎসুক দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় পৃথিবীর সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতি। কাজেই অতি সন্তর্পণে কাজে হাত দিতে হয়। শত্রু তা'র চারদিকে—ঘরে ও বাইরে। ভাবী যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কেও নিঃশঙ্ক হওয়া চলে না। এদিক বিবেচনায় সম্ভাব্য রণাঙ্গনের যত পেছনে হয়, দেশের যত দুরধিগম্য প্রদেশে নূতন শ্রমশিল্পের পত্তন করা যায়, ততই মঙ্গল। সুতরাং নবাবিষ্কৃত কয়লা, তৈল ও আকরিক লৌহের খনি যেখানে, সেই উরাল পর্বত অঞ্চলে ও তারও পূবে গড়ে তোলা হয় নয়া শিল্প এলাকা। যা' শত্রুর পক্ষে দুরধিগম্য ও দুর্ভেদ্য, যা' বিশ্ববাসীর দৃষ্টির আড়ালে রহস্যময়। এটা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সুফল। এর পর

১৯৫৫ সাল পর্যন্ত পাঁচ পাঁচটি পাঁচসালা পরিকল্পনা হয়েছে সার্থক। এ-সময়ে একদিকে করা হয় শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, অন্যদিকে করা হয় স্থানীয় এলাকার উপযোগী নানা ছোট বড় শিল্প সংগঠন, সেচের খাল খনন আর নদী ও সাগরকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন। আবার খাদ্যের ঘাট্‌তি পূরণের সুপরিকল্পিত চেষ্টার বিরাম নেই। এরই ফলে আজ এশীয় রাশিয়ার জনবিরল ও জনশূন্য এলাকাগুলো শস্য-সম্পদে পূর্ণ ও কর্মমুখর। কাজেই যুদ্ধের পাঁচ বছর বাদ দিয়ে মাত্র কুড়ি বছরে রাশিয়া অসাধ্য সাধন করেছে বলা যায়।

পৃথিবীর প্রাচীনতম পুঁজিবাদী দেশ বৃটেন। শিল্প বিপ্লবের পর শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হ'তে তা'র প্রায় দু'শ বছর লেগে যায়; আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লাগে প্রায় একশতাব্দী। অথচ প্রথম বিশ্বসমরের আগেও যে-রাশিয়া ছিলো য়ুরোপের অন্যতম অনুন্নত দেশ, আজ তা'র চেহারা চেনা যায় না। সে আজ পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী ও শিল্পোন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগী; পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষের দিক থেকে পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী।

গত ২৫ বছরে সোবিয়েতে নতুন শিল্পসংগঠনের বার্ষিক হার গড়ে শতকরা ১৮·২ ভাগ। পক্ষান্তরে মার্কিন যুক্তরা : বৃটেন ও ফ্রান্সে যথাক্রমে ২·৪, ৩·৬ ও ২·১ ভাগ মাত্র। শিল্পোন্নত দেশে পরিণত হবার অকৃত্রিম আগ্রহ ও আপ্রাণ প্রয়াসই এর মূল কারণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী পাঁচসালা পরিকল্পনাগুলোতে ('২৯—'৪১) রাশিয়ায় প্রধানত বৃহদায়তন মূল শ্রমশিল্প প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশি; আর এ ব্যাপারে মূলধন খাতে ব্যয়িত হয় ১৯ হাজার ৯৫০ কোটি রুবল (১ রুবল=১ টাকা ২ আনা)। আবার এর ভেতর ১৬ হাজার ৯৫০ কোটি রুবলই বড়ো বড়ো ভিত্তিস্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করা হয়। এসবের মধ্যে ম্যাগ্নিটোগোরস্ক ও কুজনেটস্ক লৌহ-ইস্পাত কারখানা,

উরাল ও ক্রামাতোরস্ক গুরুভার সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানা, বেরেজনিকি রাসায়নিক কারখানা, মস্কো ও গর্কি অটো ও-অর্কস, স্তালিনগ্রাদ, খারকভ ও চেলিয়াবিনস্ক-এর ট্রাক্টর কারখানা জগদ্বিখ্যাত।

১৯২৯ সালের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনাটি রচনার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিবিধ, যথা (১) শিল্পায়ন ও কৃষি-উন্নয়ন এবং (২) মধ্যযুগীয় মনোভাব ও কুসংস্কার বর্জনকল্পে কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি। কাজেই সারা দেশময় রেল লাইন স্থাপন, দুর্গম সুমেরু অঞ্চলে জাহাজ চলাচল ব্যবস্থা, খাল খনন ও হ্রদ প্রতিষ্ঠা করা হয়; আর পার্বত্য অঞ্চল ও সমতল ভূমি, নদীতট ও সমুদ্র সৈকতে গড়ে তোলা হয় কলকাবখানা। দৃষ্টান্ত হিসাবে কুমেরু অঞ্চল ছাড়িয়ে কোলা অন্তবীপে কিরোভস্ক সহরের কথা উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালে এখানে বাস কবতো মাত্র দশটি পরিবার; তাদেব পেশা ছিল শীল মাছ শিকার ও বল্গা হবিণ পালন। কয়েক বছরের ভেতর এখানে পত্তন হয় এক শিল্পনগরেব; এখানকার সার তো জগৎ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের তৃণভূমিতে জেজকাজান সহবের কথাও এখানে বলা যেতে পারে।

১৯৪৬ সাল নাগাদ রাশিয়ার জাতীয় বৈষয়িক ব্যবস্থাব পুনর্গঠন সম্পূর্ণ হয়। এর পব হয় শান্তিকালীন বৈষয়িক পুনর্বিন্যাসের কাজ শুরু। এ কাজ জাতীয় অর্থনীতি, উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের চতুর্থ পাঁচসালা (১৯৪৬—৫০) পরিকল্পনার (প্রথম যুদ্ধোত্তব) অন্তর্গত। খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শুধু যে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছে তাই নয়, লক্ষ্যের চেয়েও বেশী কাজ এ সময় হয়েছে। যেমন ৬ হাজার শিল্প-সংস্থা পুনর্গঠন অথবা নির্মাণই নয়, এ সবে কাজও চালু করা হয়। দক্ষিণাঞ্চলের ধাতব শিল্প একবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাও নতুন ভিত্তিতে গড়ে তোলা হয়েছে। কয়লা খনিগুলোর শুধু পুনর্গঠনই হয় নি, যুদ্ধের পূর্বে যত কয়লা তোলা হতো, তার চেয়েও শতকরা ৫০ ভাগ বেশি কয়লা '৫০ সালে

উত্তোলিত হয়; আর হয় মাইকপ ও গ্রোজনির তৈল ক্ষেত্রগুলোতে যুদ্ধ-পূর্ব সময়ের চেয়েও বেশি তৈল এবং '৫০ সালে দ্বিগুণ বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন। এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পেও দেড় গুণ যন্ত্রপাতি নির্মিত হতে থাকে, আর হয় '৪৬—৫০ সালের মধ্যে ২৫০ রকমের ধাতু কাটবার 'লেদ' ও সহস্রাধিক রকমের বিশেষ ধরণের নতুন মেশিনটুল তৈরী। '৫০ সালে ট্রাক্টর ও 'কমবাইন' নির্মাণের পরিমাণ তিন গুণ বাড়ে, কৃষি কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতির পরিমাণ বাড়ে দেড় গুণ। এদিকে '৪৬—৫০ সালে রুশ কারখানায় তৈরী হয় ৫ লক্ষাধিক ট্রাক্টর, ১ লক্ষ 'কমবাইন' এবং ১০ লক্ষ ট্রাক্টর চালিত লাঙ্গল প্রভৃতি।

বর্তমান জগতে শিল্পোন্নত দেশ হিসাবে আমেরিকার পরই রাশিয়ার স্থান। ১৯১৩ সালে নিজ দেশের তুলনায় ১৯৫৪ সালে রাশিয়ার ভিত্তিস্থানীয় শিল্পের সাকুল্য উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে ৩৫ গুণ, বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৭৫ গুণ ও এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পরিমাণ ১৬০ গুণেরও বেশী। তা'র পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনায় (৫১—৫৫) নির্দিষ্ট শিল্পোৎপাদন চার বছর চার মাসের ভেতরই সম্ভব হয়। শুধু তা-ই নয়। '৫০ সালের তুলনায় '৫৪ সালে পণ্যোৎপাদনের পরিমাণ বাড়ে শতকরা ৭২ ভা গ। অথচ পরিকল্পনায় বাড়ার কথা ছিলো ৬৫ ভাগ। এদিকে বিদ্যুৎশক্তি শতকরা ৮০ ভাগ, তৈল উত্তোলন শতকরা ৮০ ভাগ, কয়লা ৪৩ ভাগ, আর এঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতু কারখানার উৎপাদন বাড়ে দ্বিগুণ। আবার ভিত্তিস্থানীয় মূল শিল্প প্রসারের ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণও বাড়ে। যেহেতু কলের লাঙ্গল, ফসল সংগ্রহের যন্ত্র ও নানা কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণের সংখ্যা বাড়ায় '৫৪ সালে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ 'হেক্টর' (৩ কোটি ০ লক্ষ একর) পরিমিত বন্ধ্যা ও পতিত জমিতে চাষাবাদ করা সহজ হয়। কিছুকাল হলো সোবিয়েৎ সরকার স্থির করেছেন—১৯৬০ সালের মধ্যে

১৯৫৪ সালের তুলনায় মাংসের উৎপাদন তাঁরা একশত ভাগ, ডিম দুশো কুড়ি ভাগ এবং পশম একশো আশি ভাগ বাড়িয়ে ফেলবেন। আর শস্যের ক্ষেত্রে এই পরিমাণ হবে এক হাজার কোটি 'পুড' (এক 'পুডে' ৩৬ পাউণ্ড)।

'৫৪ সালে মোট ১ লক্ষ ৮৪ হাজার কলের লাঙ্গল, ৫২ হাজার হারভেস্টার কম্বাইন (ফসল সংগ্রহ যন্ত্র), ১ লক্ষ ১৬ হাজার লরী ও অসংখ্য প্রকার জটিল কৃষি সরঞ্জাম তৈয়ার হয়। এখন সারা রাশিয়ায় মোট ৯৪০০০ যৌথ ও ৪৮০০ সরকারী খামারে ও পতিত জমি উদ্ধারের কাজে ১০ লক্ষাধিক কলের লাঙ্গল ও ৩ লক্ষ ফসল সংগ্রহ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলত রাশিয়ার সমগ্র পণ্যোৎপাদনেই যান্ত্রিকীকরণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণপ্রায়। আর উৎপাদনের গতিও ক্ষিপ্র। কিন্তু সব বিষয়ে চাহিদা পূরণ করা এখনও সম্ভব নয় বলে পণ্যের দাম বেশ চড়া। ভারতীয় টাকার দামের তুলনায় ক্ষেত্র বিশেষে দশ গুণ বেশি। তবে আসল হেতু এই, ভারতবাসীর তুলনায় রুশদের গড়পড়তা আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বেশি; কিন্তু সে তুলনায় সরবরাহ কম, বিশেষ করে বিদেশী পণ্যের আমদানী নাই বললেই চলে। আবার প্রচুর বেতন, বিনামূল্যে বাল্যশিক্ষা ও চিকিৎসা-ব্যবস্থা ও বার্ধক্যে পেন্সন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ায় রুশদের পক্ষে একজোড়া জুতো আড়াইশ, বা একটি সার্ট ১শ' রুবলে কিনতেও বাধে না। তবে বিলাসিতার প্রশ্ন তাদের পক্ষে কল্পনাতীত। এমনকি মেয়েরা পর্যন্ত ফ্যাশন-দুরস্ত নয়। কৃচ্ছ্রতার ছাপ সর্বত্র।

রাশিয়ায় শিল্পোৎপাদনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে চলেছে শৈল্পিক ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা। অধুনা বিভিন্ন বীক্ষণাগার ও শিক্ষায়তনে আনুমানিক দু'হাজার উৎকৃষ্ট গবেষক প্রথম শ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অধীনে গবেষণা নিরত ও ১০লক্ষ ৯০ হাজার বিজ্ঞান-কর্মী কার্যরত। এর ফলে শিল্প ও বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতা ও অধিগম্যতা প্রত্যক্ষ।

রাশিয়ায় কী করে আণবিক শক্তি উৎপাদন, আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করা সম্ভব হলো? তার একমাত্র উত্তর এই: তা'র বৈষয়িক সংগঠন ও রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা'তে করে উৎপাদনের যাবতীয় মাধ্যম কেন্দ্রীয় সরকারের করায়ত্ত। যখনই স্থির হয় যে, আণবিক শক্তি অধিগত করা হবে, তখনই রাশিয়ার সমগ্র শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা যথাশীঘ্র এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে কেন্দ্রীভূত করা হয়। তারই ফলস্বরূপ কাজ আরম্ভের মাত্র তিন বছরের ভেতর ১৯৪৯ সালের গ্রীষ্মে রাশিয়ায় প্রথম আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। আবার ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো এক তাজ্জব ব্যাপার বলে পাশ্চাত্ত্য জগৎ মনে করে। কারণ এরও আট মাস পর ১৯৫৪ সালের মে মাসে বিকিনী দ্বীপে প্রথম মার্কিন হাইড্রোজেন বোমা ফাটানো হয়। কাজেই রাশিয়া এ-ব্যাপারে বৃটেন ও ফ্রান্সের চেয়ে বহু অগ্রগামী, বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমপর্যায়ভুক্ত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিও তার অসঙ্গত নয়, বিশেষ করে মানব-কল্যাণে আণবিক শক্তি প্রয়োগ চেষ্টায়। এর প্রমাণ, মস্কো থেকে ১৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী মস্কো-ভল্গা খালের প্রবেশ মুখে অবস্থিত আণবিক শক্তি সংস্থায় ২৪০″ সাইক্লোট্রন যন্ত্রনির্মাণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এজাতীয় বৃহত্তম যন্ত্রের আয়তন ১৮০″ মাত্র। তা' ছাড়া, মস্কোর ১১০ কিলোমিটার দক্ষিণ দিকবর্তী আণবিক শক্তি কেন্দ্রে ৫ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হচ্ছে একটি ৩০ হাজার কিলোওয়াটের আণবিক চুল্লীতে। * এখানেই রাশিয়া ক্ষান্তি

---

* **পাদটীকা:**—২২শে জুন ('৫৫) শ্রীনেহরু এ আণবিক শক্তি কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন। এতে অন্যের প্রবেশাধিকার ছিল না। পরে অবশ্য বিশ্রুত-কীর্তি বিজ্ঞানী পরলোকগত ডক্টর মেঘনাদ সাহা প্রমুখ রুশ সরকারের আমন্ত্রণে (১লা-৮ই জুলাই, '৫৫) ঐ কেন্দ্র ও অন্যান্য আণবিক সংস্থার কাজকর্ম প্রত্যক্ষ করেন।

দেয়নি। ৫০০০০ থেকে ১ লক্ষ কিলোওয়াটের নতুন নতুন আণবিক শক্তি-কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা একদিকে করা হচ্ছে, অন্যদিকে করা হচ্ছে মানব-কল্যাণে আণবিক শক্তি প্রয়োগের ব্যাপারে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক সাহায্যদান। কাজেই ৩৮ বছরেরও কম সময়ে প্রধানত কৃষিভিত্তিক একটি বিরাট দেশের এমন মৌলিক রূপান্তরের অলৌকিক ইতিহাস তা'র রাষ্ট্রীয় সাধনায় নিহিত।

উরালের স্ভের্দলোভস্ক থেকে রাশিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে বিখ্যাত লেনিনগ্রাদ সহর। ফিনল্যাণ্ডের লাগোয়া। সোজা বিমান পথের দূরত্বও হাজার মাইল। কিন্তু অন্তরীক্ষে চলাচলের বিপদ ও দুরূহতা কম নয়। ঝড়-বৃষ্টিতে একেবারে নাস্তানাবুদ। অবশ্য সমূহ বিপদ কিছু ঘটেনি। এ-ঘটনা ১৯শে জুনের। গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি ও কন্‌কনে অসহ্য ঠাণ্ডা হাওয়া। অথচ এ-সত্ত্বেও সে-কী বিপুল অভ্যর্থনা! রাস্তার দুধারে ৫ লাখ লোকের ভিড়। আড়াইশ' বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যপুষ্ট নগরের উপযুক্ত নিঃসন্দেহ। হলেও, বিগত দিনকয়েক যেরূপ অপ্রত্যাশিত সম্বর্ধনা মিলছিল, এ তাদেরই বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র। তবে সহরটি কিন্তু শ্রমশিল্প, সংস্কৃতি ও বীরত্বের সমন্বয়ে অপূর্ব। দেড়শ' এতে গবেষণাগার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ৯শ' দিন সমানে জার্মান-আক্রমণ রুখ্‌বার গৌরবভোগী। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ লেখাজোখা ছিল না। অথচ '৪৬ সালের ভেতরই এখানকার বিধ্বস্ত ও ধ্বংসোন্মুখ কলকারখনা চালু করা হয়; আর বহুকাল আগে পুনর্গঠন হয় সম্পূর্ণ। নয়নাভিরাম দৃশ্যই নয়, বিখ্যাত স্তালিন ধাতু কারখানাসহ অসংখ্য ছোট-বড়-মাঝারী শ্রমশিল্প, সরকারী থিয়েটার, সংগ্রহশালা ও প্রাচীন শিল্পকলা দেখেই শ্রীনেহরুর দু' দিন কেটে যায়। আর এর সঙ্গে তাঁর রাশিয়া-ভ্রমণও কার্যত শেষ হয়।

২১শে জুন। পূর্ব ব্যবস্থা অনুযায়ী সদলে তিনি মস্কো পৌঁছেন। ঐদিন ভারত-রাশিয়া মৈত্রী পরিষদের উদ্যোগে ডায়নামো স্টেডিয়ামে

৮০ হাজার লোকের এক জনসমাবেশে তিনি বক্তৃতা করেন। এতে মান্যগণ্য সব রুশ নেতাই ছিলেন উপস্থিত। এর আগে রুশ জনসাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করার সুযোগ বিদেশাগত কোন রাষ্ট্র-নায়ককে দেওয়া হয়নি। কিন্তু শ্রীনেহরু সে-দুর্লভ সম্মানেরও অধিকারী হন। হিন্দীতে তিনি বলেন, "সোবিয়েৎ যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল সাফল্য ও জনগণের সহৃদয়তায় আমি মুগ্ধ। আপনাদের দূরবিস্তৃত দেশের রূপান্তর প্রত্যক্ষ করলাম। দেশের লোকের মেহনতেই তা' সম্ভব হয়েছে। যেখানে আমি গিয়েছি, সেখানে প্রবল শান্তি-কামনা লক্ষ্য করেছি। * * * বহু বিখ্যাত সহর ও পরম আশ্চর্য বহু বস্তু দেখেছি। কিন্তু যে-সাদর আতিথেয়তা লাভ করেছি ও আমাদের প্রতি যে-অকুণ্ঠ আন্তরিকতা দেখান হয়েছে, তা-ই সবচেয়ে বিস্ময়কর। এজন্যে আমাদের ঋণ অপরিমেয়। সোবিয়েৎ জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার নেই।"

বলা দরকার, সযত্নে নেহরু রাশিয়া দর্শন করেন। অতি সূক্ষ্ম ও অনাদৃত বিষয়ও তাঁর নজর এড়ায়নি। যেসব বিষয়ে বাইরের জগতের সংশয় বিন্দুমাত্র তা-তো বটেই, যেসব বস্তু অতি-সাধারণ ও ঘরোয়া, তা-ও তিনি অনুধাবন ও মর্ম গ্রহণের চেষ্টা করেছেন। সোবিয়েৎ জীবনের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয় জানার সে ক' অপার কৌতূহল। শিল্প প্রগতি, শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ও উৎকর্ষ, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা প্রণালী, সামাজিক বীমা প্রভৃতি খুঁটিনাটি প্রশ্ন তাঁ'র মনকে যেমন আলোড়িত করেছে, তেমনি রুশ নগরের স্থাপত্য রীতি, সাধারণের কাজকর্ম ও বসবাস সংস্থান, চিকিৎসা ও অবকাশভোগের সুযোগ, শিশুদের যত্ন ও লালনপালন, আর আমোদ প্রমোদের সুবিধা ইত্যাদি প্রশ্ন করে তিনি রুশ সঙ্গীদের বিস্মিত করেন। তা'ছাড়া কলকারখানা, সরকারী ও যৌথ খামার, পুরাকীর্তি ও স্মৃতিসৌধ, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, শিক্ষালয় ও যুবশিবির, পড়ো জমিতে চাষাবাদ পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার

অগ্রগতি ও পূর্তবিদ্যায় নিপুণতা দেখে তিনি অবাক হন। ২৮ বছর আগের ও পরের রাশিয়ার মধ্যে যেন আকাশপাতাল তফাৎ। এসবই বাইরের জগতের কাছে অপ্রকাশ্য ও অজ্ঞাত; কাজেই রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ। কিন্তু তাঁ'র রাশিয়া পরিক্রমায় সেই রহস্য ভেদের প্রারম্ভিক প্রক্রিয়া শুরু।

শুধু আন্তর্জাতিক উত্তেজনা প্রশমন ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনেই এ-ভ্রমণ সহায়ক হয়নি। ভারতের নিজস্ব স্বার্থও যে কিছুটা উদ্ধার হয়েছে, তা-ও সত্যি। যেমন, ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের (ভিলাই) জন্যে এসময় সোবিয়েৎ কারিগরী ও সাজসরঞ্জাম লাভের প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। আবার বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থাও হয়। বলা বাহুল্য, এসব সর্তযুক্ত আর্থিক বা অন্য রকমের সাহায্য নয়—বৈষয়িক উন্নয়নে সর্তহীন সহযোগিতা। পাশ্চাত্ত্য ও এ-সাহায্যের ভেতর তারতম্য একেবারে মৌলিক।

লক্ষ্য করার বিষয়, নেহরুর রাশিয়া পরিদর্শনের প্রথম তিনদিন ও শেষ দু'দিন নেতৃ-পর্যায়ের বৈঠকে আরম্ভ ও শেষ। তা'রই চূড়ান্ত পরিণতি ২২শে জুনের নেহরু-বুলগানিন যৌথ বিবৃতি। যা'তে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার সূত্ররূপে 'পঞ্চশীল' ও সহাবস্থানের তত্ত্ব স্বীকৃত। রাশিয়ার এ-স্বীকৃতি পরোক্ষে ভারতীয় নীতির জয় সূচিত হলেও সোবিয়েতের শান্তি রক্ষার আগ্রহও সমভাবে প্রকট। যেহেতু নতুন বিসম্বাদের অর্থ,—তা'র কর্মযজ্ঞের সমূহ ক্ষতি ও এমনকি ক্ষেত্রান্তরে বিনাশ অনিবার্য। তা-ই তা'র পক্ষে সহাবস্থান ও দীর্ঘস্থায়ী অখণ্ড শান্তির দরকার এতো বেশি। রুশ নেতারা এবিষয়ে বরাবর সচেতন। শুধু পৃথিবীর প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতায় এ-তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ এতোদিন সম্ভব হয়নি। তবে নানা ঘটনা সংঘাতে যখন শান্তির অনুকূল পরিবেশ গড়ে ওঠে, আর ভারত সরকারের একাগ্র প্রয়াসে তা' একটী নির্দিষ্ট খাতে বইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়,

তখন রাশিয়া তা'কে অভিনন্দিত করে। কিন্তু এমন একসময় গিয়েছে যখন ভারতের আন্তরিক চেষ্টাও তা'র কাছে সমাদর পায়নি, স্বীকৃতি তো দূরের কথা।

কাজেই ভ্রমণশেষে বিদায়ের পালা যখন আসে, তখন নেহরুর কণ্ঠস্বরেও তা'র বেদনার অনুরণন জাগে। তবে বিদায়-সম্ভাষণে তিনি রাশিয়ার নব রূপান্তরের বিষয় উল্লেখ করতে ভোলেন নি। ভোলেনি তা'র রাষ্ট্রিক সংগঠনের সফলতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে। কিন্তু কী তা'র সংগঠন? কী রূপ? কী-ই বা রূপান্তর?

য়ুরোপের অর্ধেক আর এশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে সোবিয়েৎ রাশিয়ার বিস্তার। দেশ নয় যেন মহাদেশ; বরং বলা ভালো ছুটো সংদেশ। পৃথিবীর মোট বাসযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠাংশ এর বর্গফল। ৮৫ লক্ষ ৯৭ হাজার বর্গমাইলেরও বেশি। পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ ৬ হাজার ও উত্তর-দক্ষিণে প্রস্থ ২৭০০ মাইল; চার সীমান্তের দৈর্ঘ ৩৬ হাজার মাইলেরও বেশি। এদেশে সূর্যের উদয়াস্তের মধ্যে তফাৎ প্রায় ১১ ঘণ্টা। ১২টী দেশের সীমা এর গা' ছুঁয়েছে, আর ১২টী সাগরের ঢেউ এর উপকূলে আছাড় খেয়ে মরছে। বহু জাতির বাসভূমি সোবিয়েৎ রাশিয়া। লোকসংখ্যা ২০ কোটি ২০ লক্ষ। ১৬টি প্রজাতন্ত্রে (এখন ১৫টি) ১৭০টি জাতিত্বের সংজ্ঞাবাচক নরগোষ্ঠির বাস; এদের কথ্য ভাষা ১২৫টিরও বেশি; আর এখানে ধর্মমত ৪০টি।

পৃথিবীতে যতরকম জলবায়ু, প্রাকৃতিক ও ধাতব সম্পদ পাওয়া যায়, রাশিয়ায় তা'দের সবই আছে। ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক যাবতীয় বৈশিষ্ট্য, মানুষের দরকারী সব কিছু পার্থিব বস্তু এখানে অপর্যাপ্ত। তৈল বা পেট্রলিয়াম, (পরিমাণে পৃথিবীর মোট উৎপাদনের অর্ধেক) বোদ মাটি বা সার (peat), লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, 'অ্যান্থ্রাসাইট' ও প্ল্যাটিনাম সম্পদে এদেশ প্রথম স্থানীয় ও কয়লায় দ্বিতীয় স্থান অধিকারী। আবার লৌহেতর

ও বিরল ধাতুর পরিমাণও কম নয়। তা'ছাড়া, সারা দেশের এক-তৃতীয়াংশ স্থানে বনজ সম্পদ সংরক্ষিত। বিভিন্ন শ্রেণীর গাছগাছড়ার সংখ্যা হাজার সতের। অধিকন্তু, বড় বড় নদী ও সাগরের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ কোটি কিলোওয়াটের মতো। সোবিয়েৎ শাসনে এসবের জনকল্যাণে নিয়োগের সর্বোত্তম ব্যবস্থা হয়েছে।

রাশিয়ার সবক'টি প্রজাতন্ত্রের ভেতর রুশীয় প্রজাতন্ত্র আয়তন ও লোকসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম। এর প্রভাব প্রতিপত্তিও সবচেয়ে বেশি। এর লোকসংখ্যা মোট জনসমষ্টির শতকরা ৫৩'৯৬ ভাগ (১০ কোটি ৯০ লক্ষ)। এর ভাষা ও সাহিত্য পুষ্ট। য়ুরোপের ৪।৫টি শ্রেষ্ঠ ভাষার অন্যতম বলে স্বীকৃত।

সোবিয়েৎ ভূমিতে শতাধিক ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হয়। ৭০টি ভাষায় মোট ৭৮০০ দৈনিক ও ১৫০০টি সাময়িকপত্র সারাদেশে প্রকাশ হয়। বছরে ৫৮টি ভাষায় মোট ১০০ কোটি বই মুদ্রিত ও প্রচার করা হয়ে থাকে। মোট ৩ লক্ষ ৮০ হাজার সাধারণ পাঠাগারের মারফৎ জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক বড় শহরে সিনেমা আছে; এদের সংখ্যা ৫ শ'। এসব ছাড়া, চলচ্চিত্র, চিত্রশালা, সংগ্রহশালা, ছোটদের থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতির মারফৎ সাংস্কৃতিক চর্চার প্রসার হয়ে থাকে। এখন এদেশে নিরক্ষর কেউ নেই। বছরে ৫ কোটি ৭০ লক্ষ ছাত্রছাত্রী (প্রাপ্ত বয়স্ক সহ) লেখাপড়া করে। ৭ বছর মেয়াদী সর্বজনীন অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত। '৫৫ সাল থেকে বড় বড় শহর ও নগরে এর বদলে চালু হয়েছে ১০ বছর মেয়াদী শিক্ষাব্যবস্থা। পরে সারাদেশে এর প্রচলন হবার কথা। সাধারণ, কারিগরী ও অন্যান্য বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষালয়ের সংখ্যা ২ লক্ষ ২০ হাজার ও সেসবে বিদ্যার্থীর সংখ্যা ৩ কোটি ৭০ লক্ষ। ৮৯০টি উচ্চ শিক্ষালয়ে ১৫ লক্ষ ছাত্র বছরে ভর্তি হয়। শিক্ষণকাজে নিযুক্ত মেয়েদের সংখ্যা ১০ লক্ষাধিক; এক্ষণে

প্রায় ৪ লক্ষ নারী এঞ্জিনিয়ার ও যন্ত্রবিদ (প্রাক্‌বিপ্লব সময়ে ৬ হাজার) কর্মরত। তা'ছাড়া রয়েছে অসংখ্য নারী চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, লেখিকা ও আইনজীবী। প্রাক্‌বিপ্লব যুগে যেদেশের অধিকাংশ লোক ছিল নিরক্ষর, আজ সেখানে নিরক্ষরতার নির্বাসন ঘটেছে। রাশিয়ার এ-কৃতিত্ব সর্বত্র স্বীকৃত।

রাশিয়ায় রাষ্ট্রভাষা বা সরকারী কাজে আদানপ্রদানের ভাষা কি? এর একটিমাত্র জবাব হলো : এদেশে যে-ক'টি প্রজাতন্ত্র আছে, তা'তে প্রচলিত মুখ্য ভাষাগুলোই রাষ্ট্রভাষা। তবে সচরাচর রুশ ভাষাই সরকারী কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেহেতু এ-ভাষা সুপরিণত ও পুষ্ট, য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা; উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহন! জার আমল থেকেই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান শ্রেণীর ভেতর বহুল প্রচলিত। তা'ছাড়া, সরকারী চাকরির জন্যও এর সমাদর বেশি। বর্তমানে অন্যান্য ভাষার বিকাশ ঘটানোয় ও পুষ্টি সাধনে উৎসাহ দেয়া হয় নিঃসন্দেহ এবং তা'তে সরকারী আদান প্রদান অথবা ভাববিনিময়ের অসুবিধাও নেই। তবু উচ্চতর জ্ঞান বিজ্ঞানের মাধ্যমরূপে সাহিত্য গড়ে ওঠা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এসত্ত্বে প্রাদেশিক ভাষাগুলোর ক্রমবিকাশ ও পুষ্টির জন্যে রাশিয়ায় যে-ব্যবস্থা হয়েছে, তা' সর্বাংশে প্রশংসনীয়। যেহেতু জা. আমলে প্রাদেশিক ভাষা, সংস্কৃতি ও শিক্ষাও বিমাতৃসুলভ আচরণ পেতো, সেহেতু সেগুলোর অনেকটিই ক্ষয়িষ্ণু ও শেষদশায় উপনীত হয়; কোন কোনটির বর্ণমালা ও সাহিত্য লোপ পায়—যা' থাকে তা' শুধু লোক সঙ্গীত বা গাথা বা লোক সংস্কৃতি। সোবিয়েৎ শাসনে এগুলোকে শুধু পুনরুজ্জীবিত করাই হয়নি, এ-সবার বিকাশ ও ব্যাপ্তির সুব্যবস্থা-ও করা হয়। আবার ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিটি প্রজাতন্ত্রের ভেতর স্বয়ংশাসিত অঞ্চল ও জাতীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন উপঅঞ্চল গঠনের অধিকার রুশ সংবিধানে আছে। এর ফলে একদিকে সংখ্যালঘুদের বহুকালের ভয় ও অবিশ্বাস দূর হয়েছে, অন্যদিকে তাদের আনুগত্য

লাভ হওয়ায় রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি ঘটেছে। এভাবেই হয়েছে রাশিয়ায় চিরতরে সংখ্যালঘু সমস্যার মীমাংসা।

আগে শোনা যেত, রাশিয়া নিরশ্বীরবাদী ; ধর্ম সেখানে অচল ও মূলোচ্ছিন্ন। এসবের মূলে সামান্য সত্য ছিল ; থাকলেও অতি-প্রচার বই কিছু নয়। যেহেতু সেখানে ধর্মনাশ হয়নি, বা ধর্মমতের অস্তিত্বও লোপ পায়নি। ৪০টি ধর্মমত সগর্বে মাথা উঁচিয়ে আছে। রুশ সংবিধানেও সকলের বিবেকের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কা'রো ধর্মীয় বিশ্বাসে আঘাত করা আইনত নিষিদ্ধ। এসব অবশ্য আইনের রক্ষা-কবচ। তবু ধর্মীয় নির্যাতন হয়নি বা ছিলো না, এমন নয়। ছিলো যথেষ্টই। একসময় তো ধর্মকে মানুষের প্রগতির পক্ষে বিষবৎ মনে করা হতো। কিন্তু স্তালিনোত্তরকালে সব কিছুর মতো এ-বিষয়েও হয়েছে হাওয়া বদল। অবশ্য যুদ্ধের সময় থেকেই এর প্রকৃত সূচনা। এখন সোবিয়েৎ ইউনিয়নে ধর্মবিশ্বাসীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়তির দিকে। শুধু এশীয় সোবিয়েতেই নয়, য়ুরোপীয় সোবিয়েতেও। সারা দেশে মোট গীর্জার সংখ্যা ২০ হাজারের ওপর, আর মঠের সংখ্যা একশো। তবে রাষ্ট্র এদের কোন আর্থিক সাহায্য দেয় না ; বিশ্বাসীদের আর্থিক সাহায্যেই এগুলো চলে। আজকাল আবার ধর্মগুরুদের সমাদর বেশ ; সরকারী ভোজ ও অভ্যর্থনায় তাঁ'দের ডাক হামেশা। রাষ্ট্রিক সম্মান লাভেও কোন বাধা নেই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি ও 'কমসোমল' বা ইয়ং কম্যুনিষ্ট লীগের সদস্যদের পক্ষে ধর্মাচরণ নিষিদ্ধ। প্রথমোক্তের সংখ্যা ৭০ লক্ষের মতো, আর দ্বিতীয়োক্তের ১ কোটি ৬০ লক্ষ। এই মোট ২ কোটি ৩০ লক্ষ বাদে জনসংখ্যার অবশিষ্ট ১৮ কোটিই কোন-না-কোন ধর্মবিশ্বাসী।

সুপ্রীম সোবিয়েৎ রাশিয়ার সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। একমাত্র এরই আছে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা। দুটো আইন সভা নিয়ে সুপ্রীম সোবিয়েৎ গঠিত ; এদের দুই-এর ক্ষমতা সমান। প্রথমটি ইউনিয়ন সোবিয়েৎ ও দ্বিতীয়টি জাতীয় বা বিভিন্ন জাতির

সোবিয়েৎ (Soviet of the Nationalities)। প্রথমটি দেশের জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল সাধারণ স্বার্থের প্রতিনিধি। প্রত্যেক ৩ লক্ষ লোক প্রথমটিতে একজন করে ডেপুটি বা প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। পক্ষান্তরে সাধারণের যে-সব অংশ বিশেষভাবে জাতিত্বের সংজ্ঞাভুক্ত তারা দ্বিতীয়টির প্রতিনিধি। প্রত্যেক ইউনিয়ন রিপাবলিক হতে ২৫ জন ডেপুটির, প্রত্যেক আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারপ্রাপ্ত রিপাবলিক হতে ১১ জনের, প্রত্যেক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল হতে ৫ জনের এবং জাতীয় এলাকা হতে একজনের ভিত্তিতে দ্বিতীয়টিতে নির্বাচন হয়ে থাকে। আবার প্রতি ৪ বছর অন্তে সুপ্রীম সোবিয়েতের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন যখন বন্ধ থাকে তখন সাময়িক কর্তৃত্ব সুপ্রীম সোবিয়েৎ সভাপতিমণ্ডলী পরিচালনা করেন। এঁরা দুটো আইন সভার যুগ্ম অধিবেশনে নির্বাচিত হন। আবার গ্রামীন সোবিয়েৎ হতে সর্বোচ্চ সোবিয়েৎ পর্যন্ত সমস্ত সোবিয়েতেই জনসাধারণের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে নির্বাচন হয়। রাশিয়ায় ভোটাধিকার সর্বজনীন; স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে আঠারো বছরের সকলেই ভোট দিতে পারে; আর ২৩ বছর হলে প্রত্যেকে সর্বোচ্চ সোবিয়েতে নির্বাচনযোগ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে। রাষ্ট্রের পরিচালনা ক্ষমতা সোবিয়েৎ মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত। তঁারা সুপ্রীম সোবিয়েতের কাছে দায়ী।

সোবিয়েৎ রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রভিত্তিক; সমস্ত ক্ষমতা কৃষক ও শ্রমিকের করায়ত্ত। তবে তাই বলে কি এরাই রাষ্ট্র চালায়? না, কারখানা, শিল্প ও বিজ্ঞান গবেষণার পরিচালক এরা? এর উত্তর হাঁ-ও, না-ও। অর্থাৎ কৃষক মজদুর শ্রেণী বা আমাদের দৃষ্টিতে অন্ত্যজ শ্রেণী হতে উদ্ভূত মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিজীবী বলে খ্যাত ব্যক্তিরা স্বভাবতই কর্ম ও জ্ঞান বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে পুরোধা বলে স্বীকৃত। তাঁ'রাই ওদেশেরও রাষ্ট্রনায়ক। মঁ স্ট্যালিনের কথা ধরা যাক; ধরা যাক মঁ বুলগানিন ও খুশ্চেভের কথা। যে-শ্রেণী হ'তে তাঁদের উদ্ভব, আর যে-ধাঁচে

তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মকাণ্ডের গড়ন, তা'তে তাঁদের মানসিক প্রকৃতি তথাকথিত বুর্জোয়া শ্রেণী হতে স্বতন্ত্র, একেবারে ভিন্ন গোত্রের।

এদেশের বৈষয়িক সংগঠনের উৎসও সমাজতান্ত্রিক; আর রাষ্ট্রের যাবতীয় উৎপাদন যন্ত্র ও মাধ্যমের মালিকানা রাষ্ট্রের। কাজেই ব্যক্তিবিশেষ এর ফলভোগী নয়, সমগ্র জাতিই এর সমান অংশীদার। ভূমি, খনিজ সম্পদ, জল, বন, কারখানা, খনি, পরিবহন, ব্যাঙ্ক, সংযোগ-রক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় খামার, যন্ত্র ও ট্রাক্টর কেন্দ্র আর সহরের অধিকাংশ ঘরবাড়ীর মালিক রাষ্ট্র। তবে যৌথ খামার ও সমবায়-মূলক সংস্থা, তাদের পশুপাখী ও যন্ত্রপাতি ও যাবতীয় উৎপন্ন বস্তুর ভোগদখলদার এরাই। অবশ্য বলাবাহুল্য, এদের জমিজমা বিনা খাজনা ও মূল্যে রাষ্ট্রই দিয়ে থাকে। এখানে একটা বিষয় জানানো দরকারঃ প্রত্যেক যৌথ খামারের অধিবাসী প্রতিটি পরিবারকে নিজ ব্যবহারোপযোগী বাসের এক খণ্ড করে জমি দেয়া হয়; তার সঙ্গে থাকে ¼ থেকে ১ হেক্টর পরিমিত ফল বা শব্জী বাগান, গৃহস্থালীর সাজ-সরঞ্জাম, দু'দশটা হাঁসমুর্গী ও গৃহপালিত গবাদি পশু (স্থানভেদে ১ থেকে ১০টি গরু, ১০ থেকে ১৫০টি ছাগলভেড়া অথবা ২ থেকে ১০টী ঘোড়া, খচ্চর বা উট)। অর্থাৎ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক কৃষক ও কারিগর নিজ শ্রমার্জিত বস্তু ভোগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারী। এ থেকেই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি আর বিভিন্ন শ্রেণীর কাজে অর্জিত আয়ের অঙ্কের তারতম্য লোপ করা হয়নি। সত্য বটে, উৎপাদনের মাধ্যম এখন সরকারী করায়ত্ত; কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তিও আইনেই বিহিত। এসব উত্তরাধিকারী সূত্রে অথবা উইল অনুযায়ী হস্তান্তরের ব্যবস্থা আছে। শ্রমিকদের অর্জিত আয়লব্ধ সম্পত্তি অথবা স্টেট সেভিংস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত তা'দের অর্থের (যেকোন পরিমাণ) ব্যাপারেও ব্যবস্থা একই রকম।

রাশিয়ায় মোট কর্ষণযোগ্য জমির শতকরা ৭০ ভাগ সমবায় কৃষি প্রতিষ্ঠান ও বাকি তিরিশ ভাগ রাষ্ট্রীয় খামারের অধীন।

কৃষকরা প্রথমটায় কাজ করে নিজেদের স্বার্থের তাগিদে, আর দ্বিতীয়টায় কাজ করে বেতনভুক শ্রমিকরূপে। প্রথমটার উৎপাদন ও লাভালাভের তারতম্যের সঙ্গে তাদের আয়ের অঙ্কও কমবেশি হয়ে থাকে ; তবে সংস্থা চালনায় তাদের মতামত গ্রাহ্য। দ্বিতীয়টায় সরকার-নির্দিষ্ট কানুন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের অধিকার তাদের আছে। আবার কারখানার শ্রমিকরা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজ তুললেও ৭শ' রুবলের চেয়ে বেশি বেতন পাবে না। বেশি যা' পাবে, সে বোনাস। তাদের তুলনায় কারখানায় মুখ্য এঞ্জিনিয়ারের বেতন ৭ গুণ বেশি বা হাজার পাঁচেক রুবল। সামগ্রিক উৎপাদন বাড়লে তিনিও বোনাস পান। বোলশোই থিয়েটারের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও এককম বেতন পান ; আবার নিজ নিজ কলানৈপুণ্য দেখিয়ে অন্যখান থেকেও আর হাজার পাঁচেক রুবল তাঁ'রা রোজগার করতে পারেন। কাজেই রোজগারের বৈষম্য যেমন আছে, তেম্‌নি আছে জীবনযাত্রার মানের মধ্যেও। সাজ-পোশাক ও চাল-চলনেরও। তবে বড়ো কথা এই, সকলেরই কাজের সমান সুযোগ আছে। কাউকে বেকার বসে থাক্‌তে হয় না। গণতন্ত্রী দেশে এ অবস্থা কল্পনাতীত।

এ-দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা অতুলনীয়। তা-ই সাধারণের ভেতর সম্পত্তি ও ধনার্জনের দুষ্প্রবৃত্তি তেমন নেই। ভাবী দুর্দিনের ভাবনাও কম। সাধারণত বাল্যশিক্ষা ও চিকিৎসার ব্যয় রাষ্ট্রের ; উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি নির্দিষ্ট। সকলের কর্মসংস্থান একরূপ সুনিশ্চিত ; বার্ধক্য ও পঙ্গুতার জন্য পেন্সনও বরাদ্দ। '৫০ সালে এ-খাতে ১২ হাজার কোটি ও '৫৪ সালে ১৪ হাজার ৬শ' কোটি রুবল মঞ্জুর করা হয়। অথচ '৪০ সালে এর পরিমাণ ছিলো ৪ হাজার ৮০ কোটি রুবল

কারখানা ও অফিসের যেসব কর্মী ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য, তাঁ'রা সরকারী খরচে অতিরিক্ত বহু সুবিধা ভোগের অধিকারী। যেমন,

সামাজিক বীমা তহবিল থেকে হাত খরচ, সামাজিক সংরক্ষণ ভাণ্ডার থেকে পেন্সন, বিনা বা অল্প খরচে স্বাস্থ্যনিবাস, বিশ্রামাগার ও যুবশিবিরে থাকা, শিশু নিকেতনে শিশু ও কিশোরদের রাখা ও অবৈতনিক বৃত্তিগত শিক্ষা লাভ। এসব ছাড়া, সাংস্কৃতিক ও খেলাধুলার বহু সুযোগ লাভ সহজসাধ্য। এহেন অবস্থায় মোট। ৪ কোটি ৭০ লক্ষ কর্মীর মধ্যে ৪ কোটিই ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য। তবে রাষ্ট্রিক স্বার্থে ও কম্যুনিষ্ট পার্টির নির্দেশে কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলতে সবাই বাধ্য। নিয়ম ভঙ্গের শাস্তি ভয়ঙ্কর—ট্রেড ইউনিয়ন থেকে বিতাড়ন ও যাবতীয় সুবিধা প্রত্যাহার।

এসব সত্ত্বেও এদেশে কর্মীদের যে ন্যূনতম বেতন দেয়া হয়, তা'র রেওয়াজ অন্যত্র নেই। আবার বেতন বৃদ্ধি ও পণ্য মূল্য হ্রাসের সঙ্গে জীবন যাত্রার মানও ক্রমশ বাড়ছে। সরকারী হিসাব অনুসারে '৪৭ ও '৫৪ সালের মধ্যে ৭ বার খাদ্য ও পণ্যের দাম কমান হয়েছে। এর ফলে '৫৪ সালে আগের তুলনায় জিনিসপত্রের খুচরা দর ২-৩ গুণ কমেছে, আর মাংস ও মাখনের দাম কমেছে ৩ গুণ। আগে হাজার রুবলে যে-জিনিস কেনা যেতো, এখন যায় ৪৩৩ রুবলে। কাজেই উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে বেশি জিনিসপত্র কেনাকাটা সম্ভব। তা' ছাড়া, '৫৪ সালে আর্থিক সঙ্গতি বাড়ায় ও পণ্যের দর কমায় '৪০ ও '৫০ সালের তুলনায় যথার্থ মজুরী বেড়েছে আনুমানিক যথাক্রমে ৭৪ ও ৩৭ শতাংশ। কাজেই খাওয়া-থাকার ব্যয়াধিক্য বাদ দিলেও সাধারণ রুশ কর্মীর জীবন যাত্রার মান নিঃসন্দেহে উর্ধ্বগামী। তবে বর্তমান অবস্থা কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের স্তরে পৌঁছুলেও সৌখিনতা বা বিলাসিতা প্রশ্রয় দেয়ার মতো কিছু নয়। এমনকি নারী সমাজের মধ্যেও এখনো মামুলি বিলাসিতার সংক্রমণ ঘটেনি। এর মুখ্য হেতু, নারীও জীবনের সকল ক্ষেত্রে পুরুষের কর্মসঙ্গী ও অংশভাগী। কাজেই নারী-পুরুষের বেশভূষার পার্থক্য তেমন কিছু নেই। তবে এটা সাময়িক বলে মনে হয়।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য। সুপ্রীম সোবিয়েতের মোট ১৩৪৭ জন প্রতিনিধির মধ্যে ৩৪৮ জন অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন নারী; পক্ষান্তরে কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধির সংখ্যা যথাক্রমে ২২০ ও ৩১৮ জন।

রাশিয়ায় বিবাহ-বিচ্ছেদ কিছুকাল আগেও অতি সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু আইন সংশোধন করে এর বাড়াবাড়ি বন্ধ করা হয়েছে। আগে যেকোন পক্ষ বিবাহ-বিচ্ছেদ চাইলেই তা' মঞ্জুর হতো। কিন্তু সংশোধিত ব্যবস্থায় আদালতই বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করার কর্তা। কাজেই আদালত দাম্পত্য কলহ আগে আপোষে মিটাবার সব রকম চেষ্টা করে থাকে।

রুশ নারীর বৈষয়িক ও সামাজিক সর্বাঙ্গীন মুক্তি ঘটেছে; তাই রাশিয়ায় পতিতাবৃত্তির সত্যিকার উচ্ছেদ হয়েছে। সৎপথে জীবিকা অর্জনের সুযোগ আছে বলে নারীদের আর পেটের দায়ে দেহের বেসাতি করতে হয় না।

এদেশে জন্মনিয়ন্ত্রণ বৈধ। কিন্তু পরিবার বাড়াবার দিকেই ঝোঁক রুশ সরকারের। এহেতু কৌমার্য করের দুর্বিষহ বোঝা চাপান হয়েছে। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে এ-কর হার কমে আসে ও তিনটি সন্তান হওয়ার পর একেবারে লোপ পায়। এদিকে পাঁচ সন্তানের মা সরকারী বোনাস পায় ও সন্তান বৃদ্ধির সঙ্গে বোনাসের পরিমাণ বাড়ে। শেষ পর্যন্ত দশ সন্তানের জননী 'বীরমাতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে থাকে। এভাবে পরিবার বৃদ্ধির ফলে রাশিয়ায় বছরে তিরিশ লাখ করে লোক বাড়লেও কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা নেই। যেহেতু রাশিয়ায় বর্তমান আয়তন ও কর্মক্ষেত্রের পরিধিতেও আরও ২০।২৫ কোটি লোকের বসবাস ও অন্নবস্ত্রের সংস্থান অনায়াসে হ'তে পারে। তা' ছাড়া, বর্ধিত জন-সংখ্যার সঙ্গে রাষ্ট্রিক শক্তি বৃদ্ধিরও যোগ ঘনিষ্ঠ বলে সরকার মনে করে থাকেন।

স্বীকার করতেই হবে, মাত্র ৩৮ বছরে রুশ-জনজীবনের সকল

স্তরে এমন রূপান্তর বিস্ময়কর। যেন ময়দানবের কারুকৃতি। কোনো কালে কোনো দেশে এত অল্প সময়ে এহেন আমূল পরিবর্তন আগে ঘটেচে বলে ইতিহাসে কোন্ নজীর নেই। কিন্তু এ-রূপান্তর কালান্তরের সমান। এ হলো মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে বিরামহীন নির্মম সংগ্রামের জয়যাত্রা ; রুশ জাতির কঠোর পণ ও ব্রতনিষ্ঠার ফলশ্রুতি। তবে তা'দের যাত্রাপথ বহু-বিস্তৃত, লক্ষ্যও বহুদূর। তা-ই হাসিমুখে আরো কৃচ্ছ্র ব্রত পালনে প্রস্তুত। যেহেতু রাশিয়ায় সাম্যবাদী সমাজ-সংগঠন এখনো ঢের দেরি। শুধু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠায় তা'র পথ এখন সুগম। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পায়নের চরমোৎকর্ষে হবে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন। কাজেই জনজীবনের প্রতি স্তরে যান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োগের এমন একনিষ্ঠ সাধনা। পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে এটা তা'দের বাঁচবার কৌশলও বটে। কিন্তু অমিত্রতায় নয়, নিরুপদ্রব সহাবস্থানই তা'ব উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ক বেশি। নেহরুর রাশিয়া-পরিক্রমায় সে সম্ভাবনার দুয়ার অবারিত।—

রাশিয়ার পর পোল্যাণ্ড। ২৩শে থেকে ২৫শে জুন্। তিনদিন পোল্যাণ্ডে থাকার সময় এখানকার বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র ও দর্শনীয় স্থান তিনি দেখেন ; আর পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী যোসেফ সিরাঙ্কিয়েভিংস-এর সঙ্গে যৌথ ঘোষণপত্রে স্বাক্ষর করেন। এতে 'পঞ্চশীল' নীতি হিসাবে স্বীকৃত ও অনুমোদিত হয় ; আর ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের আবশ্যকতা বর্ণিত হয়। এর পরের দু'দিন (২৫শে ও ২৬শে জুন) মহাযুদ্ধের নাগপাশ থেকে সদ্যোমুক্ত অস্ট্রিয়ার নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। পরের ২।৩ দিন তিনি ছিলেন সালজবার্গের নিকটস্থ ফুশল সহরে। এখানে য়ুরোপের ভারতীয় কূটনীতিবিদ্দের বৈঠক হয়। তা'তে তিনি য়ুরোপের কূটনীতিক হালচাল সম্পর্কে ওয়াকেফহাল্ হন।

৩০শে জুন থেকে ৬ই জুলাই নেহরুর শান্তি পরিক্রমায় এক বিশিষ্ট অধ্যায়। এ সময়টা তাঁ'র যুগোশ্লাভিয়ায় প্রেসিডেন্ট টিটোর সঙ্গে মন্ত্রণা ও পরামর্শের কাল। যা'র প্রভাব য়ুরোপীয় তথা আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দূরপ্রসারী। একদিকে তিনি নানা শিল্পাঞ্চল দেখে কাটান, অন্যদিকে অগুণ্‌তি ভোজসভা ও সভাসমিতিতে শান্তি রক্ষার সমস্যা সম্পর্কে চিন্তোদ্দীপক উক্তি করেন। ২রা জুলাই বেলগ্রেডে যুগোশ্লাভ পার্লামেন্টে আবেগ-কম্পিত স্বরে বলেন "এই পর্যটনে বেরিয়ে যেখানে গেলাম, সেখানেই আশা-আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল জয়যাত্রার পথে নতুন অভিযাত্রী শিশুদলের আনন্দোজ্জ্বল মুখকান্তি দেখে মুগ্ধ হলাম। কিন্তু তা'দের জন্যে ভবিষ্যতে আমরা কী রেখে যাচ্ছি? সে কি রণক্ষেত্রের অপমৃত্যু? না সুখ, শান্তি ও সৃজনাত্মক প্রয়াস দ্বারা ভাবীকালের মানব-সমাজের বৃহত্তর জয়যাত্রাকে পূর্ণ পরিণতির দিকে নিয়ে যাবার সুযোগ তা'দের জন্যে রেখে যাবো?" সহাবস্থান ও নিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, "এ দুটো এক বস্তু নয়। সহাবস্থান নীতি এক বেগবান ও প্রাণবন্ত আদর্শের ওপর স্থাপিত। নিরলস চেষ্টায় একে সার্থক করে তুলতে হবে।" আবার 'লৌহ-যবনিকা'র কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এ কথার ভেতর একটা সত্য প্রচ্ছন্ন। কিন্তু আজ আমাদের মনের চারদিকে বহু প্রাচীর তোলা হয়েছে। তা-ই হলো সবচেয়ে মোক্ষম লৌহ-যবনিকা। এর ফলেই পৃথিবীর বাস্তবরূপ আমাদের চোখে পড়ে না।"

নেহরু-টিটো আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে রাশিয়ার পরিবর্তিত মনোভাব, উত্তেজনা প্রশমন, শান্তিরক্ষা সমস্যা, আণবিক যুগের অভ্যুদয়, যুদ্ধের সম্ভাবনা, রাষ্ট্রপুঞ্জের ভূমিকা, ভারত-যুগোশ্লাভ সহযোগিতা ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বুঝাপড়ার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এরই চূড়ান্ত অধ্যায়রূপে ৭ই জুলাই নেহরু-টিটো যৌথ বিবৃতি প্রচারিত হয়। এতে শুধু রাজনৈতিক নয়, বৈষয়িক, কারিগরী ও বৈজ্ঞানিক সহযোগিতার ওপর জোর দেয়া হয়।

৭ই ও ৮ই জুলাই। রোম ও ভ্যাটিকান সহরে শ্রীনেহরু। একদিকে ইতালীর প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁ'র সাক্ষাৎ মুখ্যত সৌজন্যমূলক হলেও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বিষয়েও আলোচনা হয়, অন্যদিকে খৃষ্টান জগতের ধর্মগুরু পোপের সঙ্গে আলাপে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা তথা গোয়া সমস্যার সুমীমাংসার আবশ্যকতা হয় ব্যক্ত। আবার ৮ই (রাত্রি) ও ৯ই জুলাই লণ্ডনস্থ চেকার্স-এ নেহরু-ইডেন বৈঠকের আলোচনা জেনেভা সম্মেলনে (১৮-২৩শে জুলাই) চার-রাষ্ট্রনায়ক আলোচনার সাফল্যের ওপর কর্ম প্রভাব বিস্তার করে না। যেহেতু রুশনায়কদের ভাবগতি, রাশিয়া ও পূর্ব-য়ুরোপের কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলোর ঘরোয়া অবস্থা ও পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইডেনের মনে একটা সুস্পষ্ট চিত্র নেহরু এঁকে দেন।

নেহরুর বিদেশ-ভ্রমণের শেষপাদ মিশর। ১০ই ও ১১ই জুলাই তিনি কায়রোয়। সেখানে মিশরের প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানে প্রেসিডেন্ট) কর্ণেল নাসেরের সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ায় সামরিক চুক্তি ও শক্তিজোট গঠনের কুফল, শান্তিরক্ষার সমস্যা, সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক সঙ্কট, অনুন্নত দেশের বৈষয়িক ও সামাজিক উন্নয়ন আর পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বহু বিষয়ে তাঁ'র মত-বিনিময় হয়। পরদিন অর্থাৎ ১২ই জুলাই আলোচনার ফলাফল সম্বলিত এক যৌথ বিবৃতি প্রচারিত হয়। তা'তে মুখ্যত বান্দুং ঘোষণার ভিত্তিতে পারস্পরিক সহাবস্থিতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ের ঔচিত্য বর্ণিত হয়। বস্তুত য়ুরোপের যেসব দেশ নেহরু-পরিক্রমার মণ্ডল-ভুক্ত ছিলো, সেসব দেশে শান্তির আবহাওয়া জমাটই শুধু বাঁধে না, একটা বিশেষ শক্তিও সঞ্চয় করে। নিঃসন্দেহে এ নেহরু সফরের সামগ্রিক পরিণতি।

১৯৫৫ সালের ১২ই জুলাই। ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে চিহ্নিত হয়ে থাকবার মতো। এদিন প্রধান মন্ত্রী নেহেরু ৩৭ দিনব্যাপী শান্তি-পরিক্রমার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী

তাঁকে যেভাবে অভ্যর্থনা করে, তা দেবতাদেরও দর্শনীয়। প্রাচীন কালের বিক্রমশালী সেনাপতিদের পরদেশ জয়ের পর সগৌরবে নিজ রাজ্য প্রত্যাবর্তনে যেরূপ দৃশ্যের অবতারণা হতো, কতকটা তেমনি যেন। কিন্তু নেহরুর জয় ভৌতিক বা দৈবিক নয়, ভূমিগত বা ভৌগোলিকও নয়। এজয় পুরোপুরি নৈতিক। তাঁ'র বিজয় রথের চাকা কোন দেশের বুকের পাঁজর গুড়িয়ে দেয়নি, কোনো সুখের নীড় ভাঙ্গেনি, কারো বুকফাটা আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাস বাতাস বিষণ্ণ ও ভারী করে তোলেনি; বরং অসংখ্যের শুভেচ্ছার মালা তিনি বয়ে আনেন, কোটিকোটির হৃদয় হরণ করেন। তাই তিনি জনহৃদয়ের অধিরাজ। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য বিভবে অতুল, আয়তনে অতুলনীয়; জরীপের হিসাবে সারা পৃথিবীর পরিধির প্রায় সমান। কিন্তু মানচিত্রে অনুল্লেখ্য ও অচিহ্নিত; অথচ ভাবী ইতিহাসে চিরদিন স্বীকৃতি পাবে। আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিশ্বনাশী ক্ষমতার চেয়েও শত সহস্রগুণ শক্তিধর। আর এর প্রভাব কালোত্তীর্ণ, সংকীর্ণ দেশ ও সীমার উর্ধে। যেহেতু এর আবেদন চিরন্তন মানুষের মনের দুয়ারে, শুভবুদ্ধি ও নীতিবোধের কাছে। তাই নেহরু-যাত্রা ভারতেরই চিরাচরিত মিত্রতার জয়যাত্রা; মৈত্রী, প্রেম ও সখ্যতার বিজয়বার্তা ঘোষণা।

তাই নেহরু ভ্রমণের এতো গুরুত্ব। বোম্বাই-এ সম্বর্ধনা সভায় তিনি নিজেও একথাই বলেন, "ভারতের প্রতি এসব দেশ শ্রদ্ধাশীল। আমি গিয়েছিলাম ভারতের প্রতিনিধি ও ভারত আত্মার প্রতীকরূপে। এতে ব্যক্তিগত কোন কিছু ছিলনা।" তা 'ছাড়া, "সব দেশই শান্তি-কামী; কেউ যুদ্ধ চায় না। বিশ্বে উত্তেজনা প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করে। এতে কারো মতভেদ নেই।" ১৩ই জুলাই তিনি দিল্লী পৌছেন ও ১৬ই জুলাই রামলীলা ময়দানে অনুষ্ঠিত সভায় বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে তিনি বলেন, "সর্বমানবের সঙ্গে মৈত্রীস্থাপনই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির মূলতত্ত্ব। ভারত কোন শক্তি গোষ্ঠিভুক্ত না হয়ে সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হতে ইচ্ছুক।

এ-ই ভারতের পররাষ্ট্রনীতি। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি শান্তির নীতি। এশান্তির জন্যই বিশ্ববাসী বুভুক্ষু।”

আগের দিন (১৫ই জুলাই) রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রধান মন্ত্রীর সম্মানার্থ এক ভোজসভার আয়োজন করেন; আর জনসেবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার “ভারতরত্ন” উপাধি শ্রীনেহরুকে দান করেন। এটা তার জীবনব্যাপী নিঃস্বার্থ দেশসেবা ও শান্তি স্থাপন প্রয়াসের প্রতি ভারতীয় জনগণের অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। আবার ১৮ই জুলাই দিল্লীতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীনেহরু বলেন, “সকল দেশের কাছ থেকে শিখবার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে যে ভারতের জাতীয় প্রতিভা ও ঐতিহ্যের মাধ্যমে ভারতের উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ওপরই আমাদের চরম মুক্তি নির্ভরশীল। সব চেয়ে বড়ো কথা, পরানুকরণপ্রিয়তা কদাচ কল্যাণকর নয়।”

৩০শে নবেম্বর রুশ নায়ক মঁ খ্রুশ্চেভ ও প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিনের সম্বর্ধনার জন্য আহূত কলকাতায় ব্রিগেড পারেড-গ্রাউণ্ডের জনসভায় শ্রীনেহরু যে-বক্তৃতা দেন, তা'তে বিষয়টি স্পষ্টতর হয়। তিনি বলেন, “নিরুপদ্রব সহাবস্থান ভারতে নতুন কথা নয়। ২২শ' বছর আগে মহানায়ক অশোক শিলালিপিতে পঞ্চশীল ও নির্বিরোধ সহাবস্থিতির কথা উৎকীর্ণ করে গিয়েছেন। আজও পাথরে খোদিত সে-মহাবাণী অমর। অশোক শিখিয়েছিলেন যে অপরের ধর্মমতকে শ্রদ্ধা করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, যে-ব্যক্তি নিজের ধর্মকে আদর করে, কিন্তু অন্যধর্মকে করে অনাদর ও অশ্রদ্ধা, সে নিজধর্মকেই প্রকারান্তরে অবনমিত করে। এ-ই ভারতের সহাবস্থান ও সহযোগিতার বাণী। যুগ যুগ ধরে ভারত এ-নীতিতে বিশ্বাসী। অতীতে আমরা ধর্ম ও দর্শনের কথা বলতাম; এখন বৈষয়িক ও সামাজিক সংগঠনের কথা বলি। কিন্তু মূল আদর্শে আমরা অবিচল।” সংক্ষেপে, এ-ই মহা-ভারতের চিরায়ত জীবনদর্শন ও প্রজ্ঞা। এ নব-ভারতেরও মর্মবাণী।

গ্রন্থপঞ্জী

পুস্তকরচনায় নিম্নোক্ত পুস্তক ও রচনার সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ—

বুদ্ধ কথা—ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন

Lectures on Comparative Religion—
Dr. Arther Anthony Macdonell

Panch Sila—Dr. Suniti Kumar Chatterjee.
(March of India, Nov. 1955)

Gotama, the Buddha—Dr. Ananda Coomarswami.

Indian Annual Register—(From 1923—40).

Keesings Contemporary Archives—(From 1934...56)

A History of the USSR—Andrew Rothenstein.

রাশিয়ার চিঠি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জাপানযাত্রী— „

Glimpses of World History—Jawharlal Nehru.

Auto-Biography— „

Discovery of India— „

Soviet Economic Development Since 1917—Maurice Dobb

Sixteen Soviet Republics—Nikolai Mikhailov.

Atomic Energy & The Modern World—Dr. Meghnad Saha.
(H. S. Sunday Supplement, 31st July '55)

Soviet Land—(June 15, '55)

New Times—(June 23, '55)

সোবিয়েৎ দেশ,—(১০ই ও ২৫শে জুলাই, '৫৫)

জ্ঞান ও বিজ্ঞান—(মাসিক পত্রিকা ; বৈশাখ— ত্র, ১৩৬২ সন)

Report on Russia—by
Ralph Parker—(Indian Exprss, June & July, '55)

Prem Bhatia—(Statesman, June & July, '55)

Sankar Ghosh—(Hindusthan Standard, July, '55)

On Peaceful Co-existence—Cluggman.

Constitution of the Union of Soviet Socialist Republics—
Foreign Language Publishing House, Moscow, 1954.

Asian-African Conference—Publication Divisions,
(18-24 April, 1955) Govt. of India.

The Mission with Mountbatten—Alan Campbell-Johnson.

নির্ঘণ্ট

মুদ্রাকর প্রমাদ

যেসব স্থানে গুরুতর ভ্রমপ্রমাদ আছে, শুধু সেসবের সংশোধন করার চেষ্টা হলো। সাধারণ বানান ভুল যেগুলো রইলো, সহৃদয় পাঠক সেগুলো অনিচ্ছাকৃত মুদ্রাকর প্রমাদ বলে মার্জনা করবেন।

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
১, ২য় প্যারা ৪র্থ পংক্তি	জনপথ	জনপদ
„ „ ৭ম „	কালভৈরবরূপ	কালভৈরবরূপী
১৬, „ „ ২য় „	এখন	এমন
১৯, ১ম „ ৪র্থ „	করবে	করার
„ „ „ ১৪শ „	১৯৪৭	১৯৪৮
২৩, ১ম „ ১০ম „	সদাসদ	সদসৎ
২৪, ১ম „ ২য় „	তরে	তর্কে
২৬, „ „ ৯ম „	সত্যাগ্রহী (১ম)	সত্যাগ্রহ
২৮, „ „ ১৫শ „	সত্যাগ্রহরূপে	সত্যাগ্রহরূপ
২৯, „ „ ২য় „	কিষাণরা	কিষা 'দের
৩১, „ „ ১০ম „	প্রশ্ন	সব
„ ২য় „ ৬ষ্ঠ „	Divide it impera	Divide et impera
৩৯, „ „ ১১শ „	তাঁর	তা'র
৬৯, ১ম „ ৮ম „	পর্বতমালার	মালভূমির
৭৫, „ „ ২য় „	ফলে	সঙ্গে
„ „ „ „ „	এরই সঙ্গে	আর এতেই
৯০, ১ম „ ১৭শ „	না বাড়ে	বাড়ে
১৪৩, „ „ ৩য় „	বিনষ্টের	বিনষ্টির
১৪৬, ৩য় „ ১ম „	হয়ান	হয়নি
১৫৪ ১ম „ ২০তম „	যে	সে

পৃষ্ঠা	আছে	হবে
১৬৮, ২য় প্যারা ১ম পংক্তি	"রিপুরী	হরিপুরা
২০৯, " " ৭ম "	খেয়েছে	খায়
" " " ১১শ "	নির্ব্বিষ	নির্বিষ
" " " ১৪শ "	অরুচ	অরুচি
২১০, " " ১৩শ ও ১৪শ	তা'ও বছর দুই আগের ঘটনা	তা'ও '৫৫ সালের ফেব্রুয়ারীর ঘটনা
২১২, " " ৮ম "	একনায়কের	একনায়কত্বের
২১৪, " " ১১শ "	বছর তিন আগে	'৫৩ সালের মার্চে
২৩৪, ৩য় " ২য় "	সাধারণত	(যুগোশ্লাভিয়া সহ) সাধারণত
২৩৫, ১ম " ৬ষ্ঠ "	তা'র	তাঁ'র
" " " ৯ম "	তাঁ'র	তা'র